বাংলা বানানের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত (১৯৩৬ – ২০২২)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি উপাধিপ্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা-অভিসন্দর্ভ

গবেষক

শ্যামাশ্যাম কৃষ্ণপূজারি চট্টোপাধ্যায়

পিএইচ.ডি নিবন্ধন সংখ্যা: AOOBE1100117

নিবন্ধন তারিখ: ২৭/ ১১/ ২০১৭

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপিকা গোপা দত্ত

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অভ আর্টস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২৩

Certified that the Thesis entitled

বাংলা বানানের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত (১৯৩৬-২০২২)

Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Professor (retd.) Gopa Datta, Department of Bengali, Jadavpur University.

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the
Supervisor:

Dated:

Candidate:

Dated:

নিবেদন

বাংলা শব্দের বানান কীভাবে নির্ধারিত হয়, সেই পদ্ধতিটি কিঞ্চিৎ অস্বস্তিকর!

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বিতর্কের বিষয়: 'নিম্ন' অর্থে 'নীচ' নাকি 'নিচ' বানান লেখা হবে? রবীন্দ্রনাথ 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের অন্তর্গত 'নিচ ও নীচ' নামক নিবন্ধে জানাচ্ছেন, সংস্কৃতে নিম্নার্থে 'নীচ' বানানের প্রয়োগ নেই। ফলে 'নিচ'-কে বাংলা শব্দ ধরে স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে। পক্ষান্তরে, মণীন্দ্রকুমার ঘোষ শ্রীচৈতন্যদেব-রচিত শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোক (তৃণাদপি সুনীচেন...) উদ্ধৃত করে জানাচ্ছেন, সংস্কৃতেও নিম্নার্থে 'নীচ' শব্দ প্রচলিত ছিল। সুতরাং, 'নিচ' বানান পরিত্যাজ্য।

উদাহরণটি একটু বিস্তারে ব্যাখ্যা করা হল। কিন্তু এর থেকে বাংলা বানান নির্ধারণের সমস্যা নির্ভুলভাবে চিনে নেওয়া যায়। একটি শব্দের বানান নির্ধারিত হচ্ছে একজন ব্যক্তির স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে! রবীন্দ্রনাথ নিম্নার্থে 'নীচ' বানানের প্রয়োগ সংস্কৃত সাহিত্যে স্মরণ করতে পারছেন না; তাই তিনি 'নিচ' লেখার পক্ষপাতী। অন্যদিকে, মণীন্দ্রকুমার ঘোষ সংস্কৃত সাহিত্যে নিম্নার্থে 'নীচ' প্রয়োগ খুঁজে পাচ্ছেন; তাই তিনি 'নিচ' বানান বর্জনের পক্ষপাতী। 'নীচ' বা 'নিচ' — যা-ই লেখা হোক না কেন, ব্যক্তিগত স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে বানান নির্ধারিত হওয়া উচিত নয়। তার জন্য প্রণীত হওয়া দরকার যুক্তিসম্মত সুষ্ঠু নিয়মাবলি।

এইবার 'যুক্তিসম্মত' শব্দটির দিকে ফিরে তাকানো যেতে পারে। কী কী যুক্তির ওপর ভিত্তি করে একটি বানান প্রমিত হয়ে ওঠে? কেবল ব্যাকরণগত যুক্তি দ্বারা বানান নিয়ন্ত্রিত হয় না। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্যতা, ধর্ম, রাজনীতি, বানান ব্যবহারকারীর সাক্ষরতা, ভাষিক ঐতিহ্য, প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা, মুদ্রণ-প্রযুক্তি ইত্যাদি বিবিধ উপাদান মিলে নিয়ন্ত্রণ করে বানানের অবয়ব। বর্তমান গবেষণাপত্রের বিবিধ অধ্যায়ে এই বানান-নিয়ন্ত্রক অ-ব্যাকরণগত উপাদানগুলি আমরা চিহ্নিত করতে চেয়েছি। তাতে কী লাভ? ভবিষ্যতে সর্বজনগ্রাহ্য প্রমিত বানানবিধি নির্মাণ করতে হলে, অবশ্যই এইসব অ-ব্যাকরণগত উপাদানগুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে। কেবল ব্যাকরণ-সম্পর্কিত কূটতর্ক কিছুতেই কোনো বানানবিধিকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলতে পারে না। যদি পারত, তাহলে সুনীতিকুমার-সমর্থিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি কিংবা সাম্প্রতিককালের পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি সামাজিক পরিসরে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হত না। এই ব্যর্থতার প্রমাণ যথাক্রমে প্রথম এবং সপ্তম অধ্যায়ে দেওয়া আছে।

বর্তমান গবেষণাকর্মের মূল উদ্দেশ্য: সর্বজনগ্রাহ্য প্রমিত বাংলা বানানবিধির তাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপন করা। ইতোপূর্বে প্রমিত বানানবিধি নির্মাণের একাধিক প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের মতে, 'বানান-নিয়ন্ত্রক সামাজিক উপাদানসমূহ'-কে উপেক্ষা করাই এই ব্যর্থতার কারণ। বানান-বিশৃঙ্খলার সমাধান ব্যাকরণের কূটতর্কে নিহিত নেই। বাংলা বানানকে একটি 'সামাজিক-ভাষিক ঘটনা' (sociolinguistic phenomenon) হিসাবে বিবেচনা করলে, বানান-বিষয়ক জটিলতার নিরসন হতে পারে।

এবার কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পালা। যে-কোনো গবেষণাকর্মই একাধিক ব্যক্তির সহায়তায় সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। সমগ্র গবেষণাকর্ম অধ্যাপিকা গোপা দত্তের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর উপদেশ-নির্দেশ আমার প্রেরণা। ভাষাবিজ্ঞানের মতো একটি বিষয়ে গবেষণার নিজস্ব পন্থা খুঁজে পেতে তিনি আমাকে সবসময় উৎসাহ দিয়েছেন।

তাঁকে আমার বিনম্র প্রণাম জানাই। বানান-বিষয়ক গবেষণায় এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছেন অধ্যাপক পবিত্র সরকার। এই গবেষণাকর্মের একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া দেখে তিনি কিছু সংশোধনী মন্তব্য ই-মেলে জানিয়েছিলেন। গবেষণা-অভিসন্দর্ভ রচনার নিয়মাবলি শিখিয়ে দিয়েছেন অধ্যাপিকা শম্পা চৌধুরী। অভিসন্দর্ভের শিরোনাম এবং গবেষণার কালসীমা সম্পর্কিত কিছু ভুলত্রুটি সংশোধন করে দিয়েছিলেন অধ্যাপক স্যমন্তক দাস। এছাড়াও গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁদের মূল্যবান পরামর্শে উপকৃত হয়েছি, তাঁরা হলেন— অধ্যাপক মহীদাস ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সমীর কর্মকার, অধ্যাপক বরেন্দু মণ্ডল, অধ্যাপক রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা, অধ্যাপক আব্দুল কাফি, অধ্যাপক জয়দীপ ঘোষ, অধ্যাপক শাশ্বত ভট্টাচার্য। তাঁরা প্রত্যেকেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সুবাদে আমার শিক্ষাগুরু। তাঁদের বিনম্র প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বাংলা বিভাগের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী আইভি আদক এবং শ্রীযুক্ত হরিশ মণ্ডল বহু দুর্লভ বই এবং নথিপত্রের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁদের আমার প্রণাম জানাই। যাদবপুর-বৃত্তের বাইরেও যাঁদের সঙ্গে বানান-সংক্রান্ত বিবিধ খুঁটিনাটি আলোচনায় উপকৃত হয়েছি— অধ্যাপক অমলেন্দু চক্রবর্তী, অধ্যাপক পান্নালাল গোস্বামী, শ্রীসুকুমার বাগচি, অধ্যাপক বরুণকুমার সাহা। তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বানান ও লিপি বিষয়ক কতিপয় গ্রন্থ এবং অণুপত্রিকা নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ করে আমাকে দিয়েছিলেন ঋকদেব ভট্টাচার্য। গবেষণা-সংক্রান্ত বিবিধ সমস্যার সমাধানে সবসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আমার সহপাঠী অরুন্ধতী দাস, হাসনুহেনা, রাহুল পণ্ডা, মামৃতা নন্দী। তাঁদের সঙ্গে প্রথাগত কৃতজ্ঞতা জানানোর সম্পর্ক নয়! বানান-বিষয়ক কিছু গ্রন্থ ও নথিপত্র শ্রীযুক্ত সুশান্ত সরকার সংগ্রহ করে দিয়েছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত কিছু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সন্ধান দিয়েছিলেন কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সন্দীপ দত্ত। অণুপত্রিকায় বিকল্প বানান সম্পর্কেও তাঁর পর্যবেক্ষণ আমার কাজে লেগেছে। 'সর্বভারতীয় লিপি'-র বিষয়ে প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার সিন্‌হা। চতুর্থ অধ্যায়ে তাঁর 'ভারতী লিপি' সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মুদ্রণ-প্রযুক্তির সঙ্গে বানানের সম্পর্ক নির্ণয়ে শ্রীতরুণ পাইনের সঙ্গে কথা বলে উপকৃত হয়েছি। মুদ্রণ-প্রযুক্তি সম্পর্কিত কিছু প্রবন্ধের প্রতিলিপিও তিনি আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত প্রায় অর্ধশতাধিক গ্রন্থ অভিযান পাবলিশার্সের শ্রীমারুফ হোসেনের সৌজন্যে পেয়েছি। বর্তমান গবেষককে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন অধ্যাপক পবিত্র সরকার এবং অধ্যাপক সুভাষ ভট্টাচার্য। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে ঋণ স্বীকার করি। এর বাইরেও অনবধানতার কারণে যদি কোনো নাম বাদ পড়ে থাকে, তার জন্য দুঃখপ্রকাশ করি।

এছাড়াও উল্লেখ্য, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিজ্ঞাসু ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বানান ও ব্যাকরণ সংক্রান্ত বিবিধ ধারণা আমাকে খুঁটিয়ে পুনর্বিবেচনা করতে হয়েছে। তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। এই গবেষণাকর্মের প্রথম সাত মাস বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের 'জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ' খাতে অর্থসাহায্য পেয়েছিলাম। যে-সব গ্রন্থাগার ও মহাফেজখানা থেকে সাহায্য পেয়েছি, তাদের নির্বাচিত তালিকা — জাতীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগার, নবদ্বীপ আদর্শ পাঠাগার, ডিজিটাল লাইব্রেরি অভ ইন্ডিয়া, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডিজিটাল মহাফেজখানা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রোজেক্ট বিচিত্রা' ইত্যাদি।

বর্তমান গবেষণা-অভিসন্দর্ভে সর্বত্র উদ্ধৃতির বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। মূল আলোচনার সময় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি (চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৩) অনুসরণ করা হয়েছে। মুদ্রণ-সৌকর্যের কারণে একটিমাত্র ক্ষেত্রে সচেতনভাবে আকাদেমির নিয়ম উল্লঙ্ঘন করা হয়েছে। সমাসবদ্ধ শব্দ পাঁচ অক্ষরের চেয়ে বেশি দীর্ঘ হলে হাইফেন ব্যবহার করা হয়েছে। তাই 'বানানবিধি' বা 'বানানচর্চা লেখা হয়েছে'; আবার 'বানান-সংস্কার', 'বানান-চিন্তক' ইত্যাদি বানানও পাওয়া যাবে। উদ্ধৃতির হরফ অবশ্য প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে সর্বত্র অপরিবর্তিত রাখা যায়নি। যে-সব ক্ষেত্রে হরফ (বা বিশেষ কোনো চিহ্ন) পালটানো হয়েছে, তা যথাস্থানে পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায়শেষের তথ্যসূত্র এবং গ্রন্থপঞ্জি রচনার ক্ষেত্রে 'দ্য মডার্ন ল্যাংগুয়েজ অ্যাসোসিয়েশন অভ আমেরিকা' প্রকাশিত *এমএলএ হ্যান্ডবুক* (নবম সংস্করণ) অনুসরণ করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণা কোনো নির্দিষ্ট সাহিত্যগ্রন্থকে অবলম্বন করে এগোয়নি, বরং ভাষাবিজ্ঞানের একটি নির্দিষ্ট তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা এই গবেষণার লক্ষ্য। তাই গ্রন্থপঞ্জিতে আকর এবং সহায়ক গ্রন্থের বিভাজন দেখানো হয়নি। তথ্যসূত্র এবং গ্রন্থপঞ্জিতে 'et al'-এর বাংলা পরিভাষা হিসাবে 'প্রমুখ' লেখা হয়েছে। তথ্যসূত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে জ়োটেরো (zotero) রেফারেন্স-ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। পাদটীকা ও তথ্যসূত্র বাদে সমগ্র গবেষণা-অভিসন্দর্ভ অভ্র সফটওয়্যার ব্যবহার করে কালপুরুষ ১২ পয়েন্ট ফন্টে মুদ্রিত হয়েছে।

সূচিপত্র

নিবেদন I

চিত্রসূচি VIII

সারণিসূচি IX

ভূমিকা ১

নির্বাচিত পরিভাষাসমূহ ৬

প্রথম অধ্যায়: সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা তৎসম-তদ্ভব শব্দের বানান ৮

১.১ বানান করা (spelling) ও বর্ণবিন্যাস (orthography) ৮

১.২ বাংলা বানান: প্রমিতকরণ এবং সর্বজনগ্রাহ্যতা ৯

১.৩ বাংলা বানানচর্চার বিবিধ ধারা ১১

১.৪ ভাষার আভ্যন্তরিক গঠনে বিকল্পের গুরুত্ব ১৩

১.৫ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত বানানবিধির গ্রহণযোগ্যতা: একটি সমীক্ষা ১৫

১.৫.১ সমীক্ষার উদ্দেশ্য ১৫

১.৫.২ বিষয়গত পরিকল্পনা ১৬

১.৫.৩ সমীক্ষা সম্পর্কিত নিয়মাবলি ১৭

১.৫.৪ নমুনা সমীক্ষা ১৭

১.৫.৫ তথ্য বিশ্লেষণ ২১

১.৫.৬ বানানবিধির ব্যর্থতার কারণ ২১

১.৬ বানান নিয়ন্ত্রক বিবিধ উপাদান ২৪

১.৭ সিদ্ধান্ত ৩১

তথ্যসূত্র ৩২

দ্বিতীয় অধ্যায়: বিদেশি শব্দের বাংলা বানান: কয়েকটি প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ৩৬

২.১ প্রারম্ভিক নীতি নির্ধারণ ৩৬

২.২ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশি বানান-নীতি ৩৭

২.৩ বিশ্বভারতীর বানানবিধি ৪১

২.৪ আকাদেমি এবং একাডেমি ৪৩

২.৫ *আনন্দবাজার পত্রিকা*-তে বিদেশি বানান ৪৫

২.৬ *প্রথম আলো* সংবাদপত্রগোষ্ঠীর বিদেশি বানাননীতি ৪৭

২.৭ সাহিত্য সংসদের বিদেশি বানাননীতি ৪৭

২.৮ সিদ্ধান্ত ৪৮

তথ্যসূত্র ৫০

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলা ক্রিয়াপদের বানান নির্ধারণে সামাজিক প্রভাব ৫২

৩.১ ক্রিয়াপদের বানান : ব্যাকরণে উপেক্ষিত ৫২
৩.২ বাংলা ক্রিয়াপদের গঠন: একটি প্রস্তাব ৫৪
৩.৩ বিবৃতিমূলক ভাবের ক্রিয়াপদের বানান ৫৮
৩.৪ অতীতবাচক বিভক্তির বানান প্রসঙ্গে ৬২
৩.৫ অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের বানান ৬৩
৩.৬ সিদ্ধান্ত ৭২
তথ্যসূত্র ৭৪

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলা লিপি এবং বানানের আন্তঃসম্পর্ক ৭৬

৪.১ সূচনা ৭৬
৪.২ 'সর্বভারতীয় লিপি'-র অভিমুখে বিবিধ প্রয়াস ৭৬
৪.৩ প্রমিত বানানের দ্বি-উপাদান গঠন ৭৯
৪.৪ বাংলা লিপির. ঐতিহাসিক পরম্পরা ৮১
৪.৫ লিপি-সংস্কারের যাথার্থ্য নির্ধারণ ৮২
৪.৫.১ আচার্য সুনীতিকুমারের লিপি-সংস্কার প্রস্তাব ৮৩
৪.৫.২ কৃষ্ণকুমার সিন্‌হা প্রচারিত ভারতী লিপি ৮৬
৪.৫.৩ আইআইটি মাদ্রাসের ভারতি লিপি এবং বাংলা বানান ৮৮
৪.৫.৪ পূর্ব পাকিস্তানে লিপি বিষয়ক নিরীক্ষা ৯০
৪.৬ মুদ্রণ-প্রযুক্তি, লিপি এবং বাংলা বানান ৯১
৪.৭ সিদ্ধান্ত ৯৩
তথ্যসূত্র ৯৫

পঞ্চম অধ্যায়: বাংলা বানানে বিকল্প স্বর ৯৯

৫.১ বিকল্প বানান: সংজ্ঞা নির্মাণ ৯৯
৫.২ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিকল্প বাংলা বানান ১০০
৫.৩ জন মারডকের বানান-বিষয়ক পত্র ১০৪
৫.৪ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির বিকল্প প্রস্তাব ১০৫
৫.৫ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বনাম দেবপ্রসাদ ঘোষ ১০৮
৫.৬ অণুপত্রিকায় বিকল্প বানান ১১২
৫.৭ নিরীক্ষামূলক বানান-নির্ভর দুটি গ্রন্থ ১১৪
৫.৭.১ বাংলা বানান সমতা ও নয়া বরন পরিচয়: সিতেস রায় ১১৪
৫.৭.২ নতুন বাংলা বানান: ড. মৃদুল কান্তি বসু ১১৬
৫.৮ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধির বিকল্প অনুসন্ধান ১১৮
৫.৮.১ পলাশ বরন পালের যুক্তিসমূহ ১১৯

৫.৮.২ আকাদেমির বানানবিধির অন্যান্য প্রতিপক্ষ ১২৩
৫.৯ সিদ্ধান্ত ১২৯
তথ্যসূত্র ১৩১

ষষ্ঠ অধ্যায়: সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বানান ১৩৬

৬.১ বাংলাদেশের বাংলা বানান এবং পশ্চিমবঙ্গের বাংলা বানান ১৩৬
৬.২ বাংলাদেশের বানান সংস্কারে ভিন্নতার কারণ ১৩৭
৬.৩ পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি (১৯৪৯ খ্রি.) ১৪০
৬.৩.১ ভাষা কমিটির লিপি-সংস্কার প্রস্তাব ১৪০
৬.৩.২ ভাষা কমিটির 'শহজ বাংলা' প্রস্তাব ১৪১
৬.৪ বাংলা একাডেমির বানান-প্রস্তাব (১৯৬৩ খ্রি.) ১৪২
৬.৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির ভিন্নমত (১৯৬৮ খ্রি.) ১৪৩
৬.৬ স্বাধীন বাংলাদেশে ভাষা-পরিকল্পনা ১৪৪
৬.৬.১ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন (১৯৭২ খ্রি.) ১৪৬
৬.৬.২ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (১৯৮৩ খ্রি.) ১৪৭
৬.৬.৩ কুমিল্লা কর্মশিবির (১৯৮৮ খ্রি.) ১৪৮
৬.৬.৪ বাংলা একাডেমি এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (১৯৯২-২০১২) ১৪৯
৬.৭ বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বানানচর্চা ১৫১
৬.৭.১ বাংলা একাডেমি অনুসারী গ্রন্থসমূহ ১৫২
৬.৭.২ বাংলা একাডেমি বিরোধী গ্রন্থসমূহ ১৬০
৬.৮ সিদ্ধান্ত ১৬৩
তথ্যসূত্র ১৬৫

সপ্তম অধ্যায়: আকাদেমি বানান-বিধির প্রায়োগিক সাফল্য: সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন ১৬৮

৭.১ প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাংলা বানান ১৬৮
৭.২ গবেষণা-প্রশ্ন ১৬৮
৭.৩ সমীক্ষার মূল নীতি ১৬৯
৭.৩.১ ক্ষেত্রসমীক্ষার বিবরণ ১৬৯
৭.৩.২ সাহিত্যিক নিদর্শন সমীক্ষার বিবরণ ১৭০
৭.৩.৩ ডিজিটাল নমুনা সমীক্ষার বিবরণ ১৭১
৭.৪ তথ্য বিশ্লেষণ ১৭১
৭.৪.১ ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ১৭২
৭.৪.২ সাহিত্যিক নিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ১৭৮
৭.৪.৩ ডিজিটাল নিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ১৮৩
৭.৫ সিদ্ধান্ত ১৮৪

তথ্যসূত্র.....১৮৭

উপসংহার.....১৮৯

পরিশিষ্ট ১: অধ্যাপক পবিত্র সরকারের সাক্ষাৎকার.....১৯৩

পরিশিষ্ট ২: অধ্যাপক সুভাষ ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার.....১৯৯

গ্রন্থপঞ্জি.....২০৮

চিত্রসূচি

চিত্র ৩.১: রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদে হস্-চিহ্নের দৃষ্টান্ত.....৬৫

চিত্র ৩.২: রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে অনুজ্ঞার বানানে অসাম্য.....৬৬

চিত্র ৪.১: ভারতী লিপির স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ.....৮৭

চিত্র ৬.১: যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রস্তাবিত নতুন বাংলা অক্ষর.....১০৭

চিত্র ৭.১: 'কীর্ত্তন'-আদি শব্দে রেফের নীচে দ্বিত্বপ্রয়োগ..... ১৭২

চিত্র ৭.২: রেফের নীচে দ্বিত্ববর্ণ রক্ষিত.....১৭৩

চিত্র ৭.৩: রেফের নীচে দ্বিত্ববর্ণ বর্জিত (ভারত সেবাশ্রম সংঘ, নবদ্বীপের প্রাচীর-লিখন).....১৭৩

চিত্র ৭.৪: সন্ধিযুক্ত শব্দে অনুস্বার অব্যবহৃত.....১৭৪

চিত্র ৭.৫: অতৎসম শব্দে দীর্ঘ ঈ-কার.....১৭৪

চিত্র ৭.৬ কি/কী-এর পার্থক্য.....১৭৫

চিত্র ৭.৭: গণপরিসরে ণত্ব-বিধান.....১৭৫

চিত্র ৭.৮: 'অস্বচ্ছ' যুক্তাক্ষর.....১৭৬

চিত্র ৭.৯: গণপরিসরে ভুল বানান.....১৭৭

চিত্র ৭.১০: কোনো/ কোনও বিকল্প বানানের স্বীকৃতি.....১৭৭

চিত্র ৭.১১: ভুল লিপ্যন্তরণ (কেটিং, কন্ট্রাক) ১৭৮

রেখাচিত্র ১.১: বানান-সংক্রান্ত আলোচনার শ্রেণিভেদ ১১

রেখাচিত্র ১.২: ভাষার গঠনে বিকল্পের ভূমিকা ১৪

রেখাচিত্র ৪.১: প্রমিত বানানের দ্বি-উপাদান গঠন.....৮০

রেখাচিত্র ৬.১: বাংলাদেশে বানান-সংস্কারের সময়রেখা.....১৫১

সারণিসূচি

সারণি ১.১: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত বানানের নমুনা সমীক্ষা.....১৮

সারণি ১.২ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত বানানবিধির গ্রহণযোগ্যতা.....২৩

সারণি ১.৩ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির সাফল্যের হার (শতাংশে).....২৪

সারণি ৩.১: ক্রিয়ার প্রকার এবং ভাবের প্রভেদ.....৫৪

সারণি ৩.২: ধাতু এবং বিভক্তিসহ ক্রিয়াপদের গঠন বিশ্লেষণ.....৫৬

সারণি ৩.৩: সমাপিকা এবং অসমাপিকা ক্রিয়াপদের রূপতাত্ত্বিক সাদৃশ্য.....৫৭

সারণি ৩.৪: অ-কার যুক্ত ধাতুর বিভিন্ন উচ্চারণ.....৬১

সারণি ৩.৫: বিভিন্ন পুরুষে অনুজ্ঞাভাবের ক্রিয়াপদের সম্ভাব্য বানান.....৬৪

সারণি ৩.৬: অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের বানান সম্পর্কিত প্রস্তাব.....৭২

সারণি ৫.১: বিকল্প মুদ্রণ-যন্ত্রে চাবির হিসাব.....১১৬

সারণি ৬.১: বাংলা একাডেমি (ঢাকা) অনুসারী গ্রন্থসমূহ.....১৬০

সারণি ৭.১: আবাপ-তে বিকল্পে সিদ্ধ হ্রস্ব-স্বরধ্বনি ব্যবহারের প্রবণতা.....১৭৯

সারণি ৭.২: আবাপ-তে -ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের বানান.....১৮০

সারণি ৭.৩: আবাপ-তে বিকল্পে সিদ্ধ অনুস্বার ব্যবহার.....১৮১

সারণি ৭.৪: আবাপ-তে দ্বিস্বরের বানান.....১৮২

সারণি ৭.৫: আবাপ-তে অতৎসম শব্দে ণ ব্যবহার.....১৮২

সারণি ৭.৬: আবাপ-তে ज़ ব্যবহার.....১৮৩

ভূমিকা

বাংলা বানান বিষয়ে ভূরি-পরিমাণ গ্রন্থ রচিত হলেও বিদ্যায়তনিক গবেষণাকর্মের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। বাংলাদেশের কথা বাদ দিলে সেই সংখ্যা আরও কমে আসে। বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে বানানচর্চায় শূন্যতার একাধিক কারণ অনুমান করা যায় —

প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার, মণীন্দ্রকুমার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ বানান-বিতর্কে অংশগ্রহণের পর তরুণ গবেষকদের এই বিষয়ে নতুন কী-বা বলার থাকতে পারে— এবম্বিধ চিন্তা হয়তো মানসিক বাধার সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয়ত, বানানচর্চা মানেই কঠিন এবং জটিল ব্যাকরণ-চর্চা— এই আশঙ্কাও হয়তো সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের বানান-বিষয়ক গবেষণাকর্মে অগ্রসর হতে নিরুৎসাহিত করেছে।

তৃতীয়ত, 'সহজে বানান শিখুন' ধরনের জনপ্রিয় এবং শিক্ষার্থীপাঠ্য গ্রন্থের সংখ্যাবৃদ্ধি নিবিড় গবেষণায় বাধার সৃষ্টি করেছে। বানান বিষয়ক জনপ্রিয় বইয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি মানে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ গবেষণাগ্রন্থ রচিত হওয়া নয়। এই বিভ্রান্তি গবেষকদের একাংশকে বানানচর্চা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

এমতাবস্থায় আমাদের লক্ষ্য, সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা প্রমিত বানানের তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণ। অভিসন্দর্ভের শিরোনামে 'সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত' শব্দবন্ধের তাৎপর্য এটাই। গবেষণার কালসীমা শুরু হয়েছে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির প্রথম সংস্করণ এই বছর প্রকাশিত হয়েছিল। প্রমিত বানানবিধির শুরুর মুহূর্ত থেকে আলোচনা শুরু করা সংগত বলে আমাদের মনে হয়েছে। অন্যদিকে, সাম্প্রতিকতম সময়কে ধরে ২০২২ সালে গবেষণার কালসীমায় ইতি টানা হয়েছে।

অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনা শুরুর আগে এই অভিসন্দর্ভে অবলম্বিত গবেষণা-পদ্ধতি বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে। যে কেন্দ্রীয় প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে বর্তমান গবেষণার অবতারণা, সেটি হল— কেন কোনো বানানবিধি সামাজিকভাবে সফল বা ব্যর্থ হয়? বানানবিধির গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করে কোন্ কোন্ সামাজিক উপাদান? এই মূল প্রশ্নটিকে সাতটি অধ্যায় জুড়ে বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে খতিয়ে দেখা হয়েছে। সমগ্র অভিসন্দর্ভের পর্বগত বিভাজন এইরকম— ভূমিকা, মূল আলোচনা (অধ্যায় ১-৭), উপসংহার, পরিশিষ্ট, গ্রন্থপঞ্জি। আমাদের গবেষণাকর্ম প্রধানত সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের (socio-linguistics) দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণে চালিত। বানান প্রমিতকরণ ভাষা-পরিকল্পনার অংশ। সেদিক থেকে এই গবেষণাকর্মের কিয়দংশ প্রায়োগিক ভাষাবিজ্ঞানের (applied linguistics) সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট। সমগ্র গবেষণা-অভিসন্দর্ভে প্রয়োজনমাফিক একাধিক গবেষণা-পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। যেমন: প্রথম অধ্যায়ে ঐতিহাসিক উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির ব্যর্থতা প্রমাণ করা হয়েছে। উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে আলোচ্য সময়ের মুদ্রিত পত্রপত্রিকা ও অভিধান থেকে। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে গুরুত্ব পেয়েছে ঐতিহাসিক-তুলনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি। পঞ্চম অধ্যায়ে এরই সঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে সাক্ষাৎকার-নির্ভর গবেষণাপদ্ধতি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশের বানান পরিস্থিতিকে একটি কেস স্টাডি হিসাবে বিবেচনা করে মহাফেজখানা, সংবিধান, সংবাদপত্র, সামাজিক মাধ্যম ইত্যাদি বিবিধ উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা স্থাপন করা হয়েছে। সপ্তম তথা অন্তিম অধ্যায়ের ভিত্তি ক্ষেত্রসমীক্ষা। এখানেও বিবিধ উৎস থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বানানের খুব অল্প অংশই ব্যাকরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বানানকে আসলে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যাকরণ-বহির্ভূত বিবিধ সামাজিক উপাদান। এই কথাটি বর্তমান গবেষণা-অভিসন্দর্ভে একাধিকবার একাধিকরকম প্রমাণসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। যদি এই সামাজিক উপাদানগুলি নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করে তারা কীভাবে বানানের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে তা ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে পণ্ডিতবর্গ-সমর্থিত প্রমিত বানান সাধারণ্যে বর্জিত হওয়ার অপঘাত এড়ানো যাবে। এতদিন এই কাজ হয়েছে আন্দাজে-আন্দাজে। কোনো প্রমিত বিধি নির্মাণের সময় বৈয়াকরণদের মনে আশঙ্কা কাজ করেছে — এই বানান আদৌ সর্বজনস্বীকৃতি পাবে তো? ধরা যাক, ব্যাকরণ অনুযায়ী 'শাঁড়' বা 'মানুশ' লিখলে ভুল হয় না। কিন্তু এই ধরনের বানান প্রচলিত হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু? 'অহঙ্কার', 'শ্রেণী'-র বদলে 'অহংকার', 'শ্রেণি' লিখলে সত্যই কি 'সমতাবিধান'-এর কারণে শিশুশিক্ষার সুবিধা হয়? বঙ্গাক্ষরের বদলে রোমক লিপিতে বাংলা ভাষা লিখলে কি আন্তর্জাতিক স্তরে কোনো সুবিধা পাওয়া যাবে? বাংলা আকাদেমির বানানবিধি সফল নাকি ব্যর্থ — তার মাপকাঠি কী? এতদিন পর্যন্ত এই ধরনের প্রশ্ন ব্যক্তিগত তর্ক-বিতর্কের স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল। এইসব প্রশ্নের কোনো বিজ্ঞানসম্মত তাত্ত্বিক উত্তর ছিল না। বর্তমান অভিসন্দর্ভে আমরা প্রমিত বানানবিধিকে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির ওপর স্থাপন করতে চেয়েছি। সমতাবিধান এবং শিশুশিক্ষার সুবিধা সম্পর্কিত বিবিধ 'মিথ' তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে যাচাই করা হয়েছে। ভবিষ্যতের বাংলা বানানবিধি কেবল ব্যাকরণগত কূটতর্ক-কেন্দ্রিক হলে ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাকে আবশ্যিকভাবে সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের নীতির ওপর স্থাপিত হতে হবে।

বর্তমান গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামোর মুখবন্ধ-স্বরূপ বলা যেতে পারে প্রথম অধ্যায়টিকে। ফ্যর্দিনান্দ দ্য সোস্যুরের *লাঁগ-পারোল* তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 'বর্ণবিন্যাস' (orthography) এবং 'বানান করা' (spelling) দুটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া বলে আমরা ব্যাখ্যা করেছি। বর্ণবিন্যাস প্রধানত ব্যাকরণ নিয়ন্ত্রিত; কিন্তু বানান করার সময় আরও বিবিধ সামাজিক উপাদান প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কেন একটি বানানবিধি ব্যর্থ হয় — তা এই অধ্যায়ের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। সুনির্দিষ্টভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্য বাংলা বানান-চর্চায় কোন্ কোন্ ক্ষেত্র অচর্চিত বা উপেক্ষিত রয়ে গেছে, তা আমরা চিহ্নিত করেছি (উপ-অধ্যায় ১.৩)। বানানের এই 'অন্ধকার অঞ্চল' ভাষাচর্চাকারীদের কাছে গুরুত্ব না-পাওয়ায় বানানচর্চা অদ্যাবধি কেবল ব্যাকরণগত কূট-তর্কের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেয়েছে। বিকল্প ভাষার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। নির্বিকল্প বানানবিধি আসলে একটি অলীক আদর্শ। 'এক শব্দ — এক বানান' নীতি শুনতে চিত্তাকর্ষক বলে মনে হলেও বাস্তবে গ্রহণযোগ্য নয়। তাতে বরং ভাষা-ব্যবহারকারীর বিভ্রান্তি বাড়ে। ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ বানানকে সহসা পুরাতন (তথা বাতিল) বলে ঘোষণা করলে ব্যাকরণের মূল ভিত্তিকেই আঘাত করা হয়। প্রথম অধ্যায়ে একটি সমীক্ষার মাধ্যমে আমরা দেখিয়েছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি (তৃতীয় সংস্করণ: ১৯৩৭) আদৌ সাফল্য লাভ করেনি। বিশেষত, তৎসম-তদ্ভব শব্দের বানানের ক্ষেত্রে এই বানানবিধি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। অথচ, রবীন্দ্রনাথ-সুনীতিকুমার-রাজশেখর বসুর মতো ব্যক্তিবর্গ এই বানানবিধির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। কেন এই পরিণতি, তার কিছু কারণ এই অধ্যায়ের শেষাংশে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অপ্রাতিষ্ঠানিকতা, সাক্ষরতা, ধর্ম, রাজনীতি, বহুভাষিকতা ইত্যাদি বিবিধ সামজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান বানানের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে। বানানবিধি নির্মাণের সময় এগুলিকে উপেক্ষা করে কেবল ব্যাকরণকে গুরুত্ব দিলে সেই বানানবিধি ব্যর্থ হতে বাধ্য।

প্রথম অধ্যায়ে তৎসম ও তদ্ভব শব্দের বানান সম্পর্কে আলোচনার পর দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিদেশি শব্দের বানানে মনোনিবেশ করা হয়েছে। প্রধানত দুটি বিপরীতধর্মী প্রবণতা বিদেশি শব্দের বানান নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। একদিকে বিদেশি উচ্চারণ বাংলা অক্ষরে যথাসাধ্য নির্ভুলভাবে প্রকাশের তাগিদ থাকে; অন্যদিকে, বিদেশি শব্দের বানানে বাঙালির উচ্চারণ কতটা গুরুত্ব পাবে, তা নিয়ে সংশয় থেকে যায়। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বিদেশি শব্দের বানান কীভাবে লেখা হচ্ছে তা বর্তমান অধ্যায়ে একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশ্বভারতী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি খতিয়ে দেখা হয়েছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে সাহিত্য সংসদ এবং *আনন্দবাজার পত্রিকা* বিদেশি শব্দের বানান কীভাবে লিখছে, তা নিরীক্ষা করা হয়েছে। বাংলা বানান সংক্রান্ত আলোচনা বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ হতে পারে না। সেখানকার বাংলা একাডেমি (ঢাকা) এবং *প্রথম আলো* পত্রিকাগোষ্ঠীর বানানবিধিতে খুব বেশি ফারাক নেই। আমরা উভয় বানানবিধিই খতিয়ে দেখেছি। সবমিলিয়ে আমাদের পর্যবেক্ষণ, 'বিদেশি' শব্দটি ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক অর্থে গ্রহণ না করে, বানানের আলোচনায় এর ভাষাবিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা নির্ধারণ করা শ্রেয়। অর্থাৎ, বাঙালির কাছে হিন্দি বা তামিল ভৌগোলিক অর্থে না হলেও ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে 'বিদেশি' ভাষা। এইসব 'বিদেশি' শব্দের বানান বাংলা ব্যাকরণের নিয়মের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। ফলে বিবিধ সামাজিক শর্তের ওপর নির্ভর করে তাদের বানান নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধিতে সংস্কারপ্রয়াস এবং রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। ফলে এই বানানবিধি সুনির্দিষ্ট কোনো মীমাংসায় পৌঁছোতে পারেনি। বিশ্বভারতীর ক্ষেত্রেও একই সমস্যা। অতিরিক্ত রক্ষণশীলতার কারণে রবীন্দ্র-গ্রন্থ ব্যতিরেকে অন্যত্র এই বানানবিধি অব্যবহার্য। অন্যদিকে, *আনন্দবাজার পত্রিকা* নাগরী অক্ষর মানেই প্রামাণিক বানান বলে ধরে নিয়েছে। সেই বানান আদৌ বাঙালির উচ্চারণ বা বাংলা ব্যাকরণের সঙ্গে মানানসই হল কি না, তা বিবেচনা করেনি। সাহিত্য সংসদের পক্ষপাত বিদেশি উচ্চারণের দিকে। /f/ বা /v/ স্বনিমের উচ্চারণ যথাযথভাবে বোঝানোর জন্য বাংলায় একাধিক অক্ষর সংযোজনে সংসদ দ্বিধা করেনি। এই বানানবিধি অবশ্য সংসদ-প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ এবং অভিধানে অনুসৃত হয়নি। *সংসদ বিদেশি নামের উচ্চারণ* লেখক সুভাষ ভট্টাচার্যের বহুভাষিক প্রজ্ঞার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু বাস্তবে এই জটিল বানানবিধি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া মুশকিল। দেখা যাচ্ছে, তৎসম-তদ্ভব শব্দের মতো বিদেশি শব্দের বানানও বহুবিধ সামাজিক উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে স্বল্পালোচিত একটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে — ক্রিয়াপদের বানান। বাক্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ক্রিয়াপদ। এতেই বাক্যের কাল, পুরুষ, ভাব ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য নিহিত থাকে। অথচ, প্রচলিত বানানবিধিতে ক্রিয়াপদের বানান সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা পাওয়া যায় না। ক্রিয়াপদের বানান নির্ধারণ করার আগে ক্রিয়াপদের উপাদানগুলি সুনির্দিষ্টভাবে চিনে নেওয়া জরুরি। বর্তমান অধ্যায়ের শুরুতে আমরা বাংলা ক্রিয়াপদের গঠন সম্পর্কিত একটি সর্বজনীন সূত্র পেশ করেছি— **ক্রিয়াপদ= ধাতু (+ সাধিত বিভক্তি) + কাল-বিভক্তি$_১$ + পুরুষ-বিভক্তি$_১$ (+ স্বার্থিক বিভক্তি) (+ প্রকার-বিভক্তি + কাল-বিভক্তি$_২$ + পুরুষ-বিভক্তি$_২$)**। যথাস্থানে এই সূত্রে ব্যবহৃত চিহ্নসমূহের অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তারপর পৃথক দুটি উপ-অধ্যায়ে বিবৃতিবাচক এবং অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের বানান কী হওয়া উচিত, তা যুক্তিসহ আলোচনা করা হয়েছে। এই 'যুক্তি' কেবল ব্যাকরণের যুক্তি নয়। একটি নির্ধারিত বানান ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে, সেটিও বিবেচনায় রাখা কর্তব্য। যেমন: অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদ হিসাবে মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থ বর্তমানে 'কর্' বানান প্রস্তাবিত হলেও ভবিষ্যৎ কালে 'করিস' লেখাই শ্রেয়। আপাতভাবে এই বানাননীতি

স্ববিরোধী বলে মনে হতে পারে। বর্তমান কালের অনুজ্ঞার বানান হস্-চিহ্নযুক্ত হচ্ছে, অথচ ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞায় হস্-চিহ্ন বাদ যাচ্ছে কেন? এর কারণ সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য। বাঙালির লিখন-অভ্যাস সাধারণত হস্-চিহ্ন বর্জন করে। বণিক্, সম্রাট্, পৃথক্ ইত্যাদি শব্দের আজকাল আর হস্-চিহ্ন দেওয়া হয় না। 'করিস' অনুজ্ঞাবাচক নাকি বিবৃতিবাচক অর্থে বলা হচ্ছে, তা বক্তার কণ্ঠভঙ্গির ওপর নির্ভরশীল। অধিধ্বনি (supra-segmental) যতিচিহ্ন দিয়ে বোঝানোই প্রথা। প্রশ্নবাক্য এবং বিবৃতির ফারাক এভাবেই হয়ে থাকে ('আপনি খাবেন' বনাম 'আপনি খাবেন?')। আর হস্-চিহ্ন বাদ দিলে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা (IPA) এবং রোমকে লিপ্যন্তরণ করাও সহজ হবে। সামগ্রিকভাবে, বাংলা ক্রিয়াপদের বানান কেবল ব্যাকরণের ওপর নির্ভরশীল নয়। প্রত্যেকটি ক্রিয়াপদ একটি বৃহৎ সংস্থানের (system) অন্তর্গত উপাদানরূপে বিবেচ্য। অন্যান্য ক্রিয়াপদের বানান, ভাষা-ব্যবহারকারীর শ্রমের সুরাহা, লিপ্যন্তরের সুযোগ ইত্যাদি একাধিক উপাদানের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে একটি ক্রিয়াপদের বানান নির্ধারিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়ে লিপি ও বানানের আন্তঃসম্পর্কের জটিলতা উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস করা হয়েছে। আপাতভাবে মনে হতে পারে, যে-কোনো ভাষা যে-কোনো লিপিতে লেখা যেতে পারে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কিংবা অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তীর মতো কেউ কেউ রোমক লিপিতে বাংলা লেখার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। তাতে নাকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। আবার অন্য অনেকে কৃত্রিম কোনো 'সর্বভারতীয় লিপি'-তে বাংলা-সমেত ভারতের যাবতীয় ভাষা লেখার প্রস্তাব দিয়েছেন। বর্তমান অধ্যায়ে আইআইটি মাদ্রাসের অধ্যাপক শ্রীনিবাস চক্রবর্তী প্রণীত 'ভারতি' লিপি এবং কৃষ্ণকুমার সিন্‌হা প্রণীত 'ভারতী' লিপির গ্রহণযোগ্যতা খতিয়ে দেখা হয়েছে। আমাদের বিবেচনায়, এই ধরনের নিরীক্ষা ভাষাকে তার লিখন-ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত করার প্রয়াস মাত্র। সর্বজনীন ভারতীয় লিপি মুদ্রণের সমস্যা আদৌ কমায় না, বরং বাড়িয়ে দেয়। জাতীয়তাবাদী আবেগের সঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানকে না মেশানোই শ্রেয়। ভারতি লিপির সমতুল্য পূর্ব পাকিস্তানের 'শহজ বাংলা' প্রস্তাবের (১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ) কথাও মনে পড়ে। আরবি অক্ষরে বাংলা লেখার প্রস্তাব সফল হয়নি। সর্বজনীন ভারতীয় লিপিরও একই পরিণতি প্রত্যাশিত। লিপি এবং বানানের আন্তঃসম্পর্ক ভারতি লিপি এবং 'শহজ বাংলা' প্রস্তাবের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মুদ্রণের সুবিধার্থে লিপিকে একরৈখিক (linear) করার তাগিদ শেষপর্যন্ত বানানেও হস্তক্ষেপ করে। একরৈখিকভাবে 'জ্‌ঞান' -এর লিখলে উচ্চারণ বোঝা মুশকিল হয়ে যায়। বস্তুত, লাইনোটাইপের আগমনের ফলেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে বানান সংস্কারে উদ্যোগ দেখা দিয়েছিল। এই অধ্যায়ে মূলত ভাষার লেখ্যরূপ এবং মুদ্রণ-প্রযুক্তি কীভাবে বানান তথা ব্যাকরণের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠছে, তার স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে।

প্রমিত বানান থাকলে তার বিকল্প প্রস্তাবও থাকবে। বাংলা বিকল্প বানানের মূল মাইলফলকগুলি স্পর্শ করা হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে। প্রমিত বানানের প্রতি ব্যাকরণগত আপত্তি থেকে খুব কম ক্ষেত্রেই বিকল্প বানান গড়ে ওঠে। বরং বিকল্প সম্ভাবনার পিছনে প্রণোদনা হিসাবে কাজ করে বিবিধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণ। কয়েকটি নির্দিষ্ট উদাহরণের সাপেক্ষে বর্তমান অধ্যায়ে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করা হয়েছে। জন মারডক প্রধানত বিদেশিদের সুবিধার কারণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে বানান সংস্কারের প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির প্রণোদনা ছিল মুদ্রণ-সহায়ক বাংলা বানানবিধি নির্মাণ। পরবর্তীকালে অণুপত্রিকার জগতের বানান-চেতনাও ব্যাকরণের বদলে মুদ্রণের সুবিধাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছে। অন্যদিকে আবার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধির বিরোধীগোষ্ঠী রাজনীতি, প্রকাশকের বাণিজ্যিক স্বার্থ, ব্যক্তিগত অসূয়া, প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা ইত্যাদি বহুমুখী আবেগের দ্বারা চালিত হয়েছেন। প্রমিত বানানের মতো বিকল্প বানানের

আঙিনাতেও বিবিধ অ-ব্যাকরণগত উপাদান ক্রিয়াশীল থাকছে। প্রশ্ন তুলছে প্রমিতর যাথার্থ্য নিয়ে। আর প্রমাণ করছে, বানান একটি সামাজিক ঘটনা — ব্যাকরণগত নয়।

বাংলা বানানের ওপর সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের প্রভাব আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায় বাংলাদেশে বানান সংস্কারের ইতিহাস থেকে। এই বিষয়ে ষষ্ঠ অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালের অনেক আগে থেকেই পূর্ববঙ্গে ভাষা ও লিপি সংস্কারের কিছু বিক্ষিপ্ত প্রস্তাব দেখা যাচ্ছিল। এইসব প্রস্তাব প্রধানত ধর্মীয় আবেগ থেকে সঞ্জাত। দেশভাগের পর নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানের আদর্শে বাংলা বানানকে গড়েপিটে নেওয়ার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। এই সময় থেকে ধর্ম বনাম ভাষার লড়াই ক্রমশ সুনির্দিষ্ট অভিমুখ ধারণ করতে থাকে। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন বাংলার ধর্মীয়করণের প্রয়াস রুখে দিতে সাহায্য করেছিল। পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের পর রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার বানান প্রমিতকরণ অনিবার্য হয়ে উঠল। ১৯৭২-১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কালপর্যায়ে বানান সম্পর্কিত এই চর্চা ব্যাকরণে আগ্রহের কারণে শুরু হয়নি। এটি স্পষ্টতই প্রশাসনিক উদ্যোগের অন্তর্গত ছিল। ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমির *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* প্রকাশিত হওয়ার পর সেই দেশে সমাজের সমস্ত স্তরে ক্রমশ এর গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বাংলাদেশে বানান-নিয়ন্ত্রক উপাদান হিসাবে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের প্রভাব তীব্রতর।

সপ্তম তথা অন্তিম অধ্যায়টি প্রায়োগিক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত হয়েছে। এই অধ্যায়ের মূল অবলম্বন ক্ষেত্রসমীক্ষা। তিনটি পর্যায়ে এই সমীক্ষা করা হয়েছে। প্রথমত, বাস্তবের মাটিতে আকাদেমি বানানবিধির গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করার জন্য নবদ্বীপ শহরে সামাজিক পরিসরে দৃশ্যমান বানান নিরীক্ষা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিককালের তিনটি প্রতিনিধিস্থানীয় পত্রিকা এবং একটি সংবাদপত্রের বানানে আকাদেমির প্রভাব খতিয়ে দেখা হয়েছে। তৃতীয়ত, ডিজিটাল জগতে সরকারি ওয়েবসাইট, সামাজিক মাধ্যম, ই-পত্রিকা, সংবাদ পোর্টাল ইত্যাদির বানানেও আকাদেমির গ্রহণযোগ্যতা নিরীক্ষা করা হয়েছে। এই তিনটি ক্ষেত্র বিচার-বিশ্লেষণ করে আমাদের মনে হয়েছে, এখনও পর্যন্ত নির্বিকল্প বাংলা বানানের আদর্শ বাস্তবায়িত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বরং আকাদেমির বানানবিধি কিছু ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি বাড়িয়েছে। কেন এই ব্যর্থতা, তা অধ্যায়ের শেষে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

বর্তমান গবেষণাকর্মের সীমানা ও সীমাবদ্ধতা উপসংহারে আলোচিত হয়েছে। এই গবেষণাকর্মের ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে কোন্ ধরনের গবেষণামূলক কাজ হতে পারে, তার ইঙ্গিত উপসংহারে পাওয়া যাবে। তা ছাড়া, ভবিষ্যতে প্রমিত বানানবিধি নির্মাণের সময় কোন্ কোন্ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের দিকে লক্ষ রাখতে হবে, তা উপসংহার অংশে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

নির্বাচিত পরিভাষাসমূহ

অণুপত্রিকা = little magazine

অধিধ্বনি = supra-segmental feature

অনুজ্ঞাবাচক = imperative

অবয়ব পরিকল্পনা = corpus planning

অর্ধস্বর = semi vowel

আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা = International Phonetic Alphabet (IPA)

আন্বয়িক = syntactic

উচ্চ কাণ্ড = high stem

একরৈখিক = linear

কণ্ঠ্যনালীয় = guttural

কথ্য বুলি = parole

কম্পিত = trilled

কোড-নির্মাতা = encoder

ক্রিয়ার কাল = tense

চিহ্নবিজ্ঞান = semiotics

জটিল বানান = deep orthography

দল = syllable

দললিপি = syllabic script

দ্বিস্বরধ্বনি = dipthong

ধাতু = root

ধ্বনিতত্ত্ব = phonology

ধ্বন্যর্থতত্ত্ব = phono-semantics

নিভাষা = ideolect

নিম্ন কাণ্ড = low stem

নির্দেশমূলক = prescriptive

ন্যূনতামূলক = minimalist

পক্ষ/ পুরুষ = person

পরিপার্শ্ব = context

পাঠোদ্ধার = decode

প্রকার = aspect

প্রথাগত ব্যাকরণ = traditional/normative grammar

প্রমিতকরণ = standardization

প্রস্বর = accent

প্রস্বরিত = accentuated

প্রায়োগিক ভাষাবিজ্ঞান = applied linguistics

ফাঁক = juncture

বর্ণনামূলক = descriptive

বর্ণলিপি = alphabetic script

বর্ণবিন্যাস/ বানান = orthography

বাগর্থতত্ত্ব = semantics

বানান করা = spelling

বিন্দুচিহ্ন = nuqta/ dot

বিবৃতিবাচক = indicative

বিভাষা = sub-dialect

বিমূর্ত সর্বজনীন ভাষা = langue

বিশেষক চিহ্ন = diacritic mark

ভাব = mood

ভাষা-পরিকল্পনা = language-planning

ভুক্তি = lexical entry

মর্যাদা পরিকল্পনা = status planning

মুক্ত বৈচিত্র্য = free variation

মুক্ত রূপ = free morph

যৌগিক কাল = compound tense

যৌগিক ক্রিয়া = compound verb

লিপ্যন্তর = transliteration

শ্রুতিধ্বনি = glide

সংরূপ = genre

সংস্থান = system

সমাজ-ভাষাবিজ্ঞান = sociolinguistics

সরল বানান = shallow orthography

সহরূপ = allomorph

সহলেখ = allograph

সহস্বনিম = allophone

সুনিশ্চয়বাচক = emphatic

স্বজ্ঞা = intuition

স্বনিম = phoneme

স্বরোচ্চতাসাম্য = vowel height assimilation

স্বার্থিক = pleonastic

প্রথম অধ্যায়: সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা তৎসম-তদ্ভব শব্দের বানান

১.১ বানান করা (spelling) ও বর্ণবিন্যাস (orthography)

সংস্কৃত 'বর্ণন' থেকে আগত 'বানান' শব্দের আভিধানিক অর্থ: "শব্দের অক্ষরবর্ণনা বা বর্ণবিশ্লেষণ" (বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ ১৫০২), "শব্দের বর্ণবিশ্লেষণ বা বর্ণের ক্রমিক বর্ণন বা লিখনপদ্ধতি, শব্দ লেখার সঠিক পদ্ধতি বা নিয়ম" (বিশ্বাস ৫৯৯), "শব্দের অক্ষরবিন্যাস (' — করা')" (বসু, রাজশেখর ৫০০) ইত্যাদি। বাংলার বিবিধ মান্য অভিধানের এইসব ভুক্তি (lexical entry) থেকে বোঝা যায়, ইংরেজিতে *spelling* এবং *orthography* দুটি আলাদা শব্দ হিসাবে পরিগণিত হলেও বাংলায় এদের পৃথগীকরণের উপযুক্ত কোনো পরিভাষা নেই। দুটির মধ্যে ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্য কিন্তু রয়েছে। 'বানান করা' (spelling) প্রায়োগিক ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত এবং প্রধানত শিশুশিক্ষা-সাক্ষরতার সঙ্গে যুক্ত। অন্যদিকে, বানান বা বর্ণবিন্যাস (orthography) সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত ভাষা-পরিকল্পনার অংশ। প্রথাগত ব্যাকরণের নিয়মকানুনও বর্ণবিন্যাস নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। মার্ক সেব্বা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করছেন এইভাবে —

> In languages like English, therefore, which make the distinction between orthography and spelling, the former may be seen as the set of conventions for writing words of the language, while the latter is the application of those conventions to write actual words. Hence I can truthfully write now, 'I am spelling the words of this sentence according to the orthography of English using the Roman writing system (or script)'. (Sebba 10–11)

বানান করা একটি যান্ত্রিক কাজ। বারংবার অভ্যাসের মাধ্যমে শিশু একটি শব্দের বানান, যুক্তি না বুঝেই, লিখতে শেখে। বর্ণবিন্যাস (বা বানান) কিন্তু বিবিধ ব্যাকরণগত ও সামাজিক যুক্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ইংরেজি orthography শব্দটিকে ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করলে ("Orthography") পাওয়া যায় গ্রিক শব্দ orthographia, যার অর্থ নির্ভুল (orthos) লিখন (graphia)। বাংলাতেও বর্ণকে বিশেষরূপে ন্যস্ত করার মধ্যে এই নির্ভুলভাবে সাজানোর ব্যঞ্জনা নিহিত আছে। 'Orthography' এবং 'বর্ণবিন্যাস' উভয় শব্দই মূলত নির্দেশমূলক তথা নিয়মতান্ত্রিক। বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভে সর্বত্র 'বানান' শব্দটি বর্ণবিন্যাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ফ্যর্দিনান্দ দ্য সোস্যুর ভাষার আলোচনায় বিমূর্ত সর্বজনীন ভাষা বা লাঁগ (langue) এবং কথ্য বুলি বা পারোল (parole) আলাদা বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন —

> In separating language from speaking we are at the same time separating: (1) what is social from what is individual; and (2) what is essential from what is accessory and more or less accidental.
>
> Language is not a function of the speaker; it is a product that is passively assimilated by the individual. (Saussure 14)

'বর্ণবিন্যাস' এবং 'বানান করা' যথাক্রমে এদের সমতুল্য বলে ধরা যেতে পারে। বর্ণবিন্যাস, ঠিক *লাঁগ*-এর মতোই, 'সর্বজনীন' সম্মতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। একই ধরনের বর্ণবিন্যাসে কেন মোটামুটি সকলে সম্মত হবেন? এর পিছনে ব্যাকরণগত এবং অ-ব্যাকরণগত কী কী যুক্তি কাজ করে, সেগুলি বর্তমান অধ্যায়ে ক্রমশ আলোচনা করা হবে। পক্ষান্তরে, বানান করা ব্যক্তিগত স্তরে সংঘটিত একটি ক্রিয়া। বানানে থাকে ভুলভ্রান্তি, লেখকের নিজস্ব পক্ষপাত, কখনও-বা ইচ্ছাকৃত নিয়মলঙ্ঘন। সোস্যুরের *লাঁগ-পারোল* তত্ত্বের সঙ্গে বর্ণবিন্যাস-বানান করার এই প্রতিতুলনার কিছু ফারাকও কিন্তু রয়েছে। *লাঁগ*-এর সর্বজনীনতা যতটা স্বীকৃত এবং সুপ্রাচীন, বর্ণবিন্যাসের সর্বজনীনতা ততটা নিরঙ্কুশ নয়। নির্দিষ্ট বৃক্ষকে 'কৃষ্ণচূড়া' নামে ডাকা হবে — বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশের স্তরে সুপ্রাচীন কোনো এক ক্ষণে এই সর্বজনীন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। বর্তমানে এই গাছের নাম নিয়ে বিতর্কের বিশেষ অবকাশ নেই। অন্যদিকে, 'কৃষ্ণচূড়া' বানান কীভাবে এবং কোন্ লিপিতে লেখা হবে — তা নিয়ে বিতর্কের আজও সুমীমাংসা হয়নি। অর্থাৎ, বর্ণবিন্যাসের নিয়ম সর্বজনীন নয়।[১] বর্ণবিন্যাসের গ্রহণযোগ্যতার অভাবের আরেকটি কারণ, বাংলা বানান সংস্কারের ইতিহাস অর্বাচীন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার প্রয়াসকে (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ) প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ[২] হিসাবে ধরলে প্রায় ৮৫ বছর। ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে কোনো নিয়ম সর্বজনগ্রাহ্যতা পাওয়ার ক্ষেত্রে ৮৫ বছর নিতান্ত অল্প সময়। বর্তমান গবেষণা-অভিসন্দর্ভে বানানের এই উভমুখী চরিত্র আমাদের আলোচ্য। 'বানান করা' ব্যক্তিগত অভ্যাস-নির্ভর প্রক্রিয়া। এই 'বানান করা'-কে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় বর্ণবিন্যাসের প্রমিত নিয়ম। সর্বদা সফল অবশ্য হয় না। উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের সম্পর্ক একটি ভাষার ব্যাকরণ ও লিখন-প্রক্রিয়াকে কীভাবে প্রভাবিত করছে, তা বর্তমান অভিসন্দর্ভের সাতটি অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

১.২ বাংলা বানান: প্রমিতকরণ এবং সর্বজনগ্রাহ্যতা

বানান শব্দটি তদ্ভব। ভাষার অবয়ব-পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে বানান সংস্কারের সচেতন প্রয়াস ধ্রুপদি সংস্কৃত ব্যাকরণে পাওয়া যায় না। সংস্কৃত ভাষায় বর্ণবিন্যাস প্রধানত ব্যাকরণের নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিদেশি শব্দের অনুপ্রবেশ তখনও পর্যন্ত সীমিত থাকায় সংস্কৃত ব্যাকরণই প্রমিত বানান নির্ধারণে যথেষ্ট ছিল। বাংলায় বানান-পরিস্থিতি জটিল হওয়ার পিছনে বিবিধ ব্যাকরণগত, ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কারণ নিহিত। প্রাকৃত-উত্তর কালে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির ক্ষেত্রে উচ্চারণ এবং লিখিত বর্ণের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। এই ভাষাগুলি সংস্কৃত বর্ণমালা যৎসামান্য পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করলেও আঞ্চলিক উচ্চারণগত প্রভেদের কারণে বানান-সমস্যার গোড়াপত্তন ঘটল। যেমন: 'স' অক্ষরটি সংস্কৃত বর্ণমালা থেকে বাংলায় গৃহীত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এর যা উচ্চারণ, বাংলা লিপিতেই লিখিত অসমিয়া ভাষায় 'স'-এর উচ্চারণ তার থেকে আলাদা। আবার,

---

[১] বাংলা বর্ণবিন্যাসের নিয়মে বিকল্প ধারা সম্পর্কে বর্তমান গবেষণা-অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

[২] অধ্যাপক পবিত্র সরকার প্রথম 'সংঘ-প্রণোদিত' বানান-সংস্কারের উদ্যোগ ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল বলে জানিয়েছেন। 'সারস্বত সমাজ'-এর সভাপতি ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সহ-সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সভার ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকলেও এঁদের বানান-সুপারিশ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। দ্র. (সরকার, *চম্‌স্কি ব্যাকরণ ও বাংলা বানান* ৩৪৭-৪৮) এবং (মুখোপাধ্যায় ১২৭)।

উভয় উচ্চারণই সংস্কৃত উচ্চারণের থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এর ফলে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলিতে উচ্চারণ এবং লিখন-পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। সোস্যুর লক্ষ করেছিলেন, "Spelling always lags behind pronunciation" (Saussure 28)। মানুষের মুখে মুখে দ্রুত উচ্চারণ পালটে যায়। স্থায়ী রূপে ধৃত বানান অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল। সহজে পালটায় না। তাই কথায়-লেখায় অসামঞ্জস্য তৈরি হয়। বাংলা বানানের বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির আরেকটি কারণ, অন্ত্য-মধ্যযুগ থেকে বাংলায় প্রচুর পরিমাণে বিদেশি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম এদের ওপর অপ্রযোজ্য। তাই এইসব শব্দের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য কোনো বিধি অদ্যাবধি গড়ে ওঠেনি। বানান (orthography) সংক্রান্ত বিভ্রান্তির আরও কিছু কারণ[৩] অনুমান করা যায়— ভারত-বাংলাদেশ জুড়ে সর্বজনমান্য প্রতিষ্ঠানের অভাব, ভাষিক ঐতিহ্য এবং অভ্যাসের মধ্যে আপোসরফা, লিপি বিষয়ক জটিলতা ইত্যাদি। লক্ষণীয়, ব্যক্তিগত লিখন-অভ্যাসে (spelling) বানান ভুল ঘটে যে-সব কারণে (অন্যমনস্কতা, ভুল উচ্চারণ ইত্যাদি), সেগুলি এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

যে-কোনো উন্নত ভাষার ক্ষেত্রে প্রমিতকরণ (standardization) ভাষা-পরিকল্পনার অপরিহার্য অংশ। প্রমিতকরণ না হলে নিভাষা-বিভাষা-উপভাষার স্তর পেরিয়ে একটি কথ্য বুলি ভাষার মর্যাদা লাভ করতে পারে না। ভাষার লেখ্য রূপের ক্ষেত্রে বানান এবং লিপি প্রমিতকরণ জরুরি। স্বাভাবিকভাবেই, এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত থাকে ভাষিক কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার ধারণা। কারও কারও কাছে প্রমিত বিধি ভাষিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলেও মনে হতে পারে। ঠিক-ভুল বানান নির্ধারণের প্রেক্ষিতে লুকিয়ে থাকা ক্ষমতার দ্বন্দ্বের এই গল্পটিকে ভুলে গেলে চলবে না। বানানবিধির সামাজিক স্তরে সাফল্য বা ব্যর্থতা যে কেবল ব্যাকরণের যুক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়, তা ক্রমশ আমরা আলোচনা করব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হোক কিংবা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি— বানান প্রমিতকরণের কোনো উদ্যোগ প্রত্যাশামাফিক সাফল্য লাভ করেনি। আমাদের বক্তব্য এই নয় যে, সময়ের সঙ্গে উক্ত বানানবিধিগুলি পরিমার্জনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এমনকি সমকালেও এইসব বিধি সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি। কেন এই ব্যর্থতা, তা বুঝতে হলে বানানকে ব্যাকরণের বাইরে একটি বৃহত্তর সামাজিক ঘটনা হিসাবে ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। বর্তমান অধ্যায়ে মূল আলোচনাকে আমরা চারটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। প্রথমত, বাংলা বানানচর্চার ইতিহাসে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রগুলি উপেক্ষিত বা অনালোচিত রয়ে গেছে, তা চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের প্রস্তাবিত তত্ত্ব— বিকল্প বানান নিছক দুর্বল ব্যাকরণের নিদর্শন নয়; ভাষার অবয়বের মধ্যেই সামাজিক স্তরে বিকল্পের স্বীকৃতি রয়েছে। পূর্বোক্ত উপেক্ষিত তথা ব্যাকরণ-বহির্ভূত উপাদানগুলি বিবেচনা না-করে বানানবিধি প্রণয়ন করলে, তা কখনোই সাধারণ্যে জনপ্রিয় হবে না। তৃতীয় পর্যায়ে, বানান-সংক্রান্ত প্রতর্ক কেবল ব্যাকরণের বৃত্তে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি কীভাবে ব্যর্থ হয়েছে, তার পরিসংখ্যানগত প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। চতুর্থ পর্যায়ে, এই সীমাবদ্ধতা নিরাকরণের উদ্দেশ্যে কিছু সমাধানসূত্র প্রস্তাব করা হয়েছে।

---

[৩] পবিত্র সরকার বানান ভুলের বিবিধ কারণ দর্শিয়েছেন— বাংলা উচ্চারণ ও বানানে অসামঞ্জস্য, ব্যক্তিগত স্তরে ভুল উচ্চারণ (কাঁচ, খুজরো ইত্যাদি), সাদৃশ্যের কারণে ভুল ('রামায়ণ'-এর প্রভাবে 'মঞ্চায়ণ'), ব্যক্তিগত অন্যমনস্কতা ইত্যাদি। (সরকার, *বাংলা বানান সংস্কার: সমস্যা ও সম্ভাবনা* ১৩-২৩)

১.৩ বাংলা বানানচর্চার বিবিধ ধারা

ড. মিতালী ভট্টাচার্যের গবেষণা থেকে জানা যায়, বাংলা বানান সম্পর্কে আলোচনা বিধিবদ্ধভাবে শুরু হচ্ছে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে[৪] (ভট্টাচার্য, মিতালী ৮১-৮৪)। অজ্ঞাতনামা লেখক 'বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার' নামে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন (পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ১২৮৫ বঙ্গাব্দ)। কালক্রমে বাংলা পত্রপত্রিকা, বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বানান-সংক্রান্ত প্রতর্কে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বেড়েছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে চলিত বাংলাকে লেখ্য ভাষার মর্যাদা প্রদানে উদ্যোগী হন প্রমথ চৌধুরী এবং রবীন্দ্রনাথ। তখন থেকে বানানচর্চায় আরও একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়— চলিত বাংলার বানান কোন্ নিয়মানুসারে লিখিত হবে? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি আত্মপ্রকাশ করে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তীকালে এই বিধিকে স্বীকার, অস্বীকার কিংবা আংশিক গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় বানানচর্চার আধুনিক আবহ গড়ে ওঠে।

পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ— উভয় ভূখণ্ড জুড়ে বিগত প্রায় ১৪০ বছর ধরে বানান-সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য চর্চা যা-কিছু হয়েছে, তাদের প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করা হল—

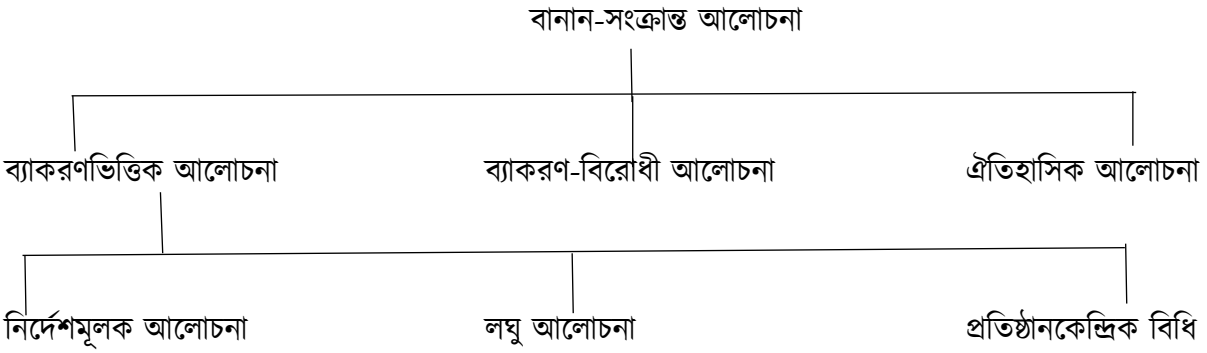

রেখাচিত্র ১.১ : বানান-সংক্রান্ত আলোচনার শ্রেণিভেদ

নীচে বিস্তারিতভাবে এই শ্রেণিভেদ বিষয়ে আলোকপাত করা হল—

১। **ব্যাকরণভিত্তিক আলোচনা:** বানান সংক্রান্ত প্রতর্কের অধিকাংশই ব্যাকরণকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হওয়া প্রত্যাশিত। তবে কীভাবে ব্যাকরণকে ব্যবহার করা হচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে এই ধরনের আলোচনাকে তিনটি উপবিভাগে ভাগ করা যায়—

ক। **নির্দেশমূলক আলোচনা:** লেখক (বা প্রতিষ্ঠান) এক্ষেত্রে বানান-নির্ধারকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর অবলম্বন নির্দেশমূলক ব্যাকরণ। নির্দেশমূলক বিধির সর্বজনমান্য হওয়ার তাগিদ থাকে। ফলে ভাষিক

[৪] ব্যাকরণ-গ্রন্থের অন্তর্গত হিসাবে বানান-সংক্রান্ত আলোচনাকে যদি বিবেচনা করা হয়, তাহলে এই ইতিহাস আরেকটু পিছিয়ে যেতে পারে। বাংলা ব্যাকরণের আদিযুগ থেকেই বানান-সংক্রান্ত সমস্যার বীজ কীভাবে বিকশিত হতে শুরু করেছিল, তা বর্তমান অভিসন্দর্ভের ৫.২ উপ-অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ঐতিহ্য তথা জনরুচির বিপক্ষে গিয়ে প্রচলিত ব্যাকরণ উল্লঙ্ঘন করা সম্ভব হয় না। বিধিগুলির ভূমিকা-অংশে প্রায়শই এই বাধ্যতার স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়।[৫] সরলীকরণ কিংবা সমতাবিধানের স্বার্থে দু-একটি অনুসিদ্ধান্তে হয়তো ব্যাকরণের কঠোর নিয়ম লঙ্ঘনের ছাড়পত্র পাওয়া যায় (সরকার, *বাংলা বানান সংস্কার: সমস্যা ও সম্ভাবনা* ১৭৫-১৭৬)। উদাহরণ: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি -ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ সমাসবদ্ধ হলেও ঈ-কার বজায় রাখার ('আগামীকাল', 'শশীভূষণ', 'মন্ত্রীগণ') পক্ষপাতী। আকাদেমির মতে, 'ছন্দ' শব্দটিকে অর্ধতৎসম ধরে বিসর্গ-সন্ধিজাত ও-কার বর্জন ('ছন্দগুরু', 'ছন্দলিপি', 'ছন্দমুক্তি') করা উচিত। তা ছাড়া, -বতুপ্ প্রত্যয়জাত বান্-কে বান-রূপে ('ভগবান', 'জ্ঞানবান', 'ধনবান') লেখার পক্ষে রায় দিয়েছে আকাদেমি। নির্দেশমূলক বিধিতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিকল্প বানান যথাসম্ভব পরিহার করা হয়। উদা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি (১৯৩৬-৩৭), পরেশচন্দ্র মজুমদারের গ্রন্থ *বাঙলা বানান বিধি*, দেবপ্রসাদ ঘোষের গ্রন্থ *বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান* ইত্যাদি।

খ। **লঘু আলোচনা:** এই ধরনের লেখারও মূল ভিত্তি ব্যাকরণ। এগুলিও নির্দেশমূলক। তবে প্রথম গোত্রীয়দের সঙ্গে এদের তফাত আলোচনার গভীরতায়। লঘু আলোচনায় শিশু-শিক্ষার্থী বা সাধারণ বানান-জিজ্ঞাসু পাঠকদের কথা মাথায় রেখে ব্যাকরণগত যুক্তি-প্রতিযুক্তির জটিলতা পরিহার করে হাস্যরসাত্মক একটি আবহ নির্মাণ করা হয়। বানান-আলোচনার স্বার্থে একটি-দুটি চরিত্রও নির্মাণ করতে পারেন লেখক। এই ধরনের কয়েকটি গ্রন্থ— কুন্তকের *শব্দ নিয়ে খেলা*, পবিত্র সরকারের *হাসতে হাসতে বানান*, স্বরোচিষ সরকারের *অকারণ ব্যাকরণ* ইত্যাদি।

হাস্যরসাত্মক লঘু চালের আলোচনাকে আলাদা শ্রেণিভুক্ত করার অর্থ এই নয় যে, নির্দেশমূলক প্রতর্কে হাস্য-পরিহাসের কোনো স্থান নেই। বিপক্ষের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করার তাগিদে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ সুপ্রাচীন কৌশল। পূর্বোল্লিখিত *বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান* গ্রন্থে যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়য়ের বানান সমিতির বিপক্ষে তীব্র প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেখান থেকে একটিমাত্র নমুনা পেশ করা হল—

> ... অসংস্কৃত সব বাংলা শব্দেই ঐ-কার ঔ-কার বর্জ্জন করতে হবে, তার শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায় তা একবার ভেবে দেখেছেন? এই ফতোয়া মানতে গেলে যে, অতঃপর ফুলের ওপর শুধু 'মউমাছিরা' গুঞ্জন করবে, কুকুরগুলো শুধু 'ভউ ভউ' করে ডাক্‌বে, ছেলেরা শুধু 'দউড়া দউড়ি' করবে, আর রাস্তার 'চউমাথায়' 'হই হই রই রই' শুনে পুলিশ 'ফউজ' তাড়া করে আসবে! (ঘোষ, দেবপ্রসাদ ৬৭)

পরিহাসমুখর হওয়া সত্ত্বেও দেবপ্রসাদ ঘোষের গ্রন্থটিকে লঘু আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না। কারণ, ব্যাকরণের জটিলতায় লেখকের অনাগ্রহ নেই। অদীক্ষিত পাঠকের ভীতি কাটানোর জন্য লঘু রসের উত্থাপন করা হয়নি। বরং বিপক্ষের বক্তব্যকে নস্যাৎ করা মূল লক্ষ্য। ব্যাকরণ বিশ্লেষণের গভীরতাই আলোচ্য শ্রেণিভেদের নির্ণায়ক মাপকাঠি।

---

[৫] তুলনীয়: "...এটি কোনো বানান-সংস্কারের প্রয়াস নয়। আমরা কেবল নিয়ম বেঁধে দিয়েছি ... বানানের নিয়মগুলিকে ব্যবহারকারীর সামনে তুলে ধরেছি। এইসব নিয়ম বা এইসব বানানে ব্যাকরণের বিধান লঙ্ঘন করা হয়নি।" (*বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* ১১)

গ। **প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক বিধি:** এগুলিও নির্দেশমূলক আলোচনা। তবে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নির্মিত। প্রতিষ্ঠানের বাইরে এই বিধির ব্যবহার যদি হয়ে থাকে, সেটি প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা বা সর্বজনমান্যতার নিদর্শন। কিন্তু এই বিধির উদ্দিষ্ট পাঠক সর্বসাধারণ নন। উদা: পশ্চিমবঙ্গে *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র বানানবিধি *বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন*, বিশ্বভারতী প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে ব্যবহারের জন্য *বানান ও বিন্যাস-বিধি*, বাংলাদেশের *প্রথম আলো* সংবাদপত্রগোষ্ঠীর বানানবিধি *প্রথম আলো ভাষারীতি* ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক বিধিতে লঘু আলোচনার মতোই ব্যাকরণের যুক্তি-প্রতিযুক্তির গভীরে প্রবেশ করা হয় না। তবে কর্তৃত্বব্যঞ্জকতা বজায় রাখার স্বার্থে লঘুরস এখানে পরিত্যাজ্য।

২। **ব্যাকরণ-বিরোধী অভিমত:** কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রচলিত ব্যাকরণকে অস্বীকার করে লেখক বানান-সংক্রান্ত অভিনব কোনো প্রস্তাব পেশ করছেন। সেই প্রস্তাব সম্পূর্ণ ধ্বনিসংবাদী বানানের হতে পারে, কিংবা লিপির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক কোনো সংস্কারের। প্রথাগত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করলে কোনো প্রস্তাবের পক্ষে সর্বজনমান্য হয়ে ওঠা মুশকিল। বানানচর্চার ইতিহাসে এই ধরনের ব্যক্তিগত বিপ্লবের গুরুত্ব নগণ্য। উদা: *প্রবাসী* পত্রিকায় প্রকাশিত যোগেশচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ 'বাঙগলা অক্ষর' (কার্তিক, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ), *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত জগন্নাথ চক্রবর্তীর প্রবন্ধ 'বাংলা বানান সংস্কার প্রস্তাব' (১৯ মার্চ, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ), ড. মৃদুল কান্তি বসুর গ্রন্থ *নতুন বাংলা বানান* (২০০২) ইত্যাদি। বর্তমান অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলা বানানে বিকল্প স্বর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩। **ঐতিহাসিক আলোচনা:** বানানচর্চার ইতিহাসে পক্ষ-বিপক্ষের যুক্তি নিরপেক্ষভাবে নথিবদ্ধ করা ঐতিহাসিকের কাজ। এরই সঙ্গে যুক্ত থাকে তাঁর নিজস্ব মূল্যায়ন। তবে ব্যাকরণ-বিরোধী ব্যক্তিগত অভিমত ঐতিহাসিক আলোচনায় সাধারণত ব্যক্ত হয় না। বাংলা বানান-সংক্রান্ত ঐতিহাসিক বিবরণ খুব বেশি লেখা হয়নি। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম— ড. মিতালী ভট্টাচার্যের গবেষণা-গ্রন্থ *বাংলা বানানচিন্তার বিবর্তন*, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'বাংলা বানান সংস্কারের রূপরেখা' (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১২১ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা, ১৪২১ বঙ্গাব্দ), সুভাষ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ 'বাংলা বানান-সংস্কারের পাঁচ দশক' (রায়চৌধুরী ৩১২-৩৩১) ইত্যাদি।

বানান-সংক্রান্ত আলোচনার এই শ্রেণিভেদ জল-অচল নয়। কোনো লেখায় একই সঙ্গে একাধিক শ্রেণির বৈশিষ্ট্য দেখা যেতে পারে। মণীন্দ্রকুমার ঘোষের 'বাংলা বানান' নামক প্রবন্ধটি যেমন কিয়দংশে ঐতিহাসিক বিবরণধর্মী, আবার ব্যাকরণভিত্তিক নির্দেশমূলক আলোচনাও এতে রয়েছে (ঘোষ, মণীন্দ্রকুমার ১৫)। দেবপ্রসাদ ঘোষের পূর্বোক্ত গ্রন্থে ঐতিহাসিক এবং নির্দেশমূলক বিবরণের মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। এই মিশ্রণের কথা স্বীকার করে নিয়েও প্রথম রেখাচিত্রে প্রদর্শিত শ্রেণিভেদের তাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে বলে আমরা মনে করি। বাংলা বানানচর্চার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, মনোভাষাবিজ্ঞান, সমাজভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদি দৃষ্টিকোণ যে অদ্যাবধি অচর্চিত রয়ে গেছে, তা প্রথম রেখাচিত্র থেকে বোঝা যায়। বানান-গবেষণাকে আধুনিক সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে হলে, চর্চার ক্ষেত্রে এই শূন্যতাকে চিহ্নিত করা জরুরি ছিল।

১.৪ ভাষার আভ্যন্তরিক গঠনে বিকল্পের গুরুত্ব

ভাষা একপ্রকার সামাজিক মাধ্যম। তাই ভাষাবিজ্ঞান, বৃহত্তর অর্থে, সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত। তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সন্ধিৎসা এবং নিরীক্ষার স্থান অবশ্যই রয়েছে। তবু ভাষাবিজ্ঞানের নিয়মাবলি গণিত বা রসায়নের মতো ব্যক্তি-নিরপেক্ষ নয়। বানান নামক তাত্ত্বিক পরিসর ভাষার দৃশ্যগত প্রকাশ-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ভাষার অন্যান্য অংশের মতো এটিও বিবিধ সামাজিক উপকরণ দ্বারা প্রভাবিত। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি[৬] নিম্নরূপ—

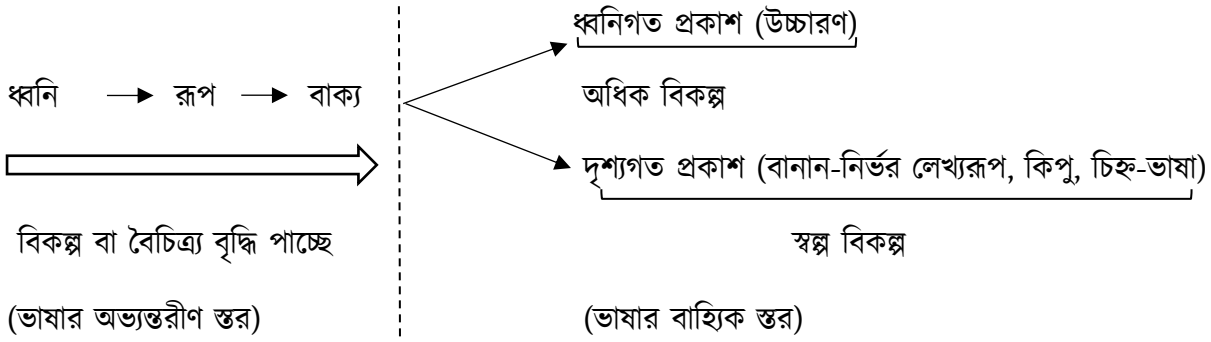

রেখাচিত্র ১.২: ভাষার গঠনে বিকল্পের ভূমিকা

লেখ্য ভাষাকে সুসংহতরূপে প্রকাশ করার তাগিদে বানান নামক শাস্ত্রের উদ্ভব। ভাষার উচ্চার্য প্রকাশের সঙ্গে তার সম্পর্ক কম হলেও একেবারে সম্পর্করহিত বলা যায় না। আদর্শ অবস্থায়, প্রথমে আসে উচ্চারণ। বানান সেই উচ্চারণকে লিখিত আকারে স্থায়িত্ব (অ-ক্ষরত্ব) প্রদান করে। বানানের শৈশবকালে মান্যতা বা প্রমিতকরণের কোনো ধারণা না-থাকাই স্বাভাবিক। তবু লেখার ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচার চলত না। প্রাথমিক যুগে বানানকে নিয়ন্ত্রণ করত উচ্চারণ। ড. সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জানাচ্ছেন:

> এখন পর্যন্ত পৃথিবীর শব্দের বানান সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছি বা জানি তাতে কোন ভাষাকেই উচ্চারণভিত্তিক বানানে পরিণত করে নি। ভাষার বর্ণমালার প্রথম উৎপত্তির সময়ে হয় ত বর্ণমালা উচ্চারণভিত্তিক ছিল এবং সে বর্ণমালা দিয়ে শব্দ তৈরীও হয়েছে। কালক্রমে ভাষার বিবর্তনের ফলে শব্দের গঠনের অনেক পরিবর্তন হলেও বর্ণমালা সে ভাষায় সেরকমই আছে। (বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যরঞ্জন ৯১০)

ক্রমশ ভাষার বিবর্তনের ফলে লিখিত অক্ষর আর উচ্চারণের মধ্যে ব্যবধান বাড়তে থাকে। কখনও দেখা গেল একই অক্ষর একাধিক ধ্বনিকে প্রকাশ করছে। কখনও-বা, একাধিক অক্ষর একই ধ্বনির সূচক হয়ে উঠেছে। এই অনিয়মকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার নামই প্রমিতকরণ।

ভাষার অভ্যন্তরীণ স্তরে ধ্বনি থেকে বাক্যের দিকে অগ্রসর হলে বিকল্প ক্রমশ বৃদ্ধি পায় (রেখাচিত্র ১.২ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বাহ্যিক স্তরে খুব বেশি বিকল্পের অবকাশ নেই। অর্থাৎ, প্রমিতকরণ প্রক্রিয়া মূলগতভাবে ভাষার

---

[৬] এখানে ধ্বনিগত এবং দৃশ্যগত প্রকাশ ক্ষেত্রবিশেষে সমাপতিত হতে পারে। উভয়ের মিশ্রণের মাধ্যমে দৃশ্য-শ্রাব্য উপায়ে ভাষার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। ধ্বনি এবং দৃশ্যের দ্বিবিভাজনের বাইরে ব্রেইলকে স্পর্শগত বহিঃপ্রকাশ বলা যায় কি না, তাও ভেবে দেখা যেতে পারে।

অভ্যন্তরীণ বিকল্পাত্মক গঠনের বিরোধী। আমাদের জ্ঞান মতে, প্রমিতকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই তাত্ত্বিক অসুবিধার দিকে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ড. মনসুর মুসা:

> ... ভাষার অবয়ব বিশ্লেষণ করলে যেমন আমরা বিকল্পের সন্ধান পাই, তেমনি তার অপেক্ষক বা কার্যাদি (functions) ব্যাখ্যা করলেও পাই নানাবিধ বিকল্প। সে-জন্য এটা বলতেই হয় যে, ভাষায় যাঁরা অবিকল্পের অভীপ্সা প্রকাশ করেন তাঁরা ভাষাতত্ত্বের মৌলিকতত্ত্বের ক্ষেত্রে বেঠিক কাজ করেন। (মুসা ২০)

তবু কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতাকে মেনে নিয়ে তাকে প্রমিতকরণের মাধ্যমে অল্পবিস্তর নিয়মানুগ করে তোলা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন জরুরি। ভাষা-পরিকল্পককে মনে রাখতে হবে, ভাষার মূল চরিত্র বিকল্পকে প্রশ্রয় দেয়। এই প্রবণতার বিপরীতে তাঁর কাজ। তাই ভাষার মূল চরিত্রকে অস্বীকার করে কাল্পনিক কোনো ভাষাতাত্ত্বিক আদর্শের (রোমক লিপিতে বাংলা, ধ্বনিসংবাদী বানান, বাংলায় 'এক ধ্বনি— এক বর্ণ' নীতি ইত্যাদি) উদ্দেশে ছুটে চললে প্রমিতকরণের বিধান সর্বজনমান্যতা পাবে না।

রেখাচিত্র ১.১ থেকে জানা যায়, বানান সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনার প্রায় ৮০ শতাংশ[৭] প্রচলিত ব্যাকরণকে মেনে নিয়ে অগ্রসর হয়। ব্যতিক্রম কেবল ব্যাকরণ-বিরোধী বিক্ষিপ্ত কিছু প্রস্তাব। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোনো নির্দেশমূলক বিধি বাংলা বানানের ক্ষেত্রে সর্বজমান্য হয়ে ওঠেনি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী কিংবা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি— কোনোটিই প্রায়োগিকভাবে একশ শতাংশ সফল নয়। কেবল নিশ্ছিদ্র ব্যাকরণগত যুক্তির ওপর স্থাপিত হলেই বিধি সর্বজনমান্য হয়ে ওঠে না। তাকে সফল হতে গেলে আরও কিছু সামাজিক উপাদানের কথা মাথায় রাখতে হয়। একটি নির্দেশমূলক বানানবিধি আসলে বেশ কিছু নিয়মের সমষ্টি। সামগ্রিকভাবে একটি বিধি ব্যর্থ হলেও তার অন্তর্গত কয়েকটি নিয়ম গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে। বর্তমান সমীক্ষায় 'বিধি' এবং 'নিয়ম' শব্দদুটির মধ্যে অর্থগত পার্থক্য লক্ষণীয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক বানাননীতি 'বিধি' শব্দে দ্যোতিত। আর সেই বিধির অন্তর্গত একেকটি নির্দেশকে 'নিয়ম' বলা হয়েছে। যে-সব নিহিত সামাজিক কারণের ওপর ভিত্তি করে একটি বিধির অন্তর্গত কিছু নিয়ম সর্বজনমান্য হয়ে উঠল, আবার কিছু নিয়ম সাধারণ্যে স্বীকৃতি পেল না— সেগুলিকে চিহ্নিত করা জরুরি। এই উদ্দেশ্য থেকে আলোচনার পরবর্তী অংশে ব্যাখ্যাত সমীক্ষাটি করা হয়েছে।

১.৫ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত বানানবিধির গ্রহণযোগ্যতা: একটি সমীক্ষা

সমীক্ষার জন্য আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' (তৃতীয় সংস্করণ: ১৯৩৭) বেছে নিয়েছি। বাংলা সারস্বত সমাজে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব ও গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। অবিভক্ত বাংলায়, ১৯৩৭ সালে তা বেশি বই কম ছিল না! সেই প্রতিষ্ঠান থেকে তিনবার সংস্করণের পর যে বানানবিধি প্রকাশিত— যা রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুনীতিকুমার কর্তৃক অনুমোদিত— তা বাস্তবে কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে ওঠেনি।

১.৫.১ সমীক্ষার উদ্দেশ্য

[৭] রেখাচিত্র ১.১-এ প্রদর্শিত পাঁচটি শ্রেণিভেদের মধ্যে চারটি (নির্দেশমূলক আলোচনা, লঘু আলোচনা, প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক বিধি, ঐতিহাসিক আলোচনা) ব্যাকরণ মেনে চলে।

বর্তমান সমীক্ষায় আমরা তিনটি প্রশ্নের মীমাংসা করতে চাইছি —

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি সর্বজনমান্য হয়ে ওঠেনি— এই দাবির যাথার্থ্য কতটুকু? সমকালীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, অভিধানের বানানে এই বিধি কতটা প্রতিফলিত?

২। এই বিধি যদি আংশিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে বিধির কোন্ নিয়মগুলি পেল? আর কোন্‌গুলিই বা স্বীকৃতি পেল না?

৩। এই বিধির স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির পিছনে নিহিত সামাজিক কারণগুলি চিহ্নিত করে তার ভিত্তিতে যে-কোনো বানানবিধির গ্রহণযোগ্যতার কিছু সর্বজনীন সূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব কি?

১.৫.২ বিষয়গত পরিকল্পনা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি[৮] প্রকাশের পর বাংলা বানানের জগতে ১৯৫৭ সালের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। একই বছরে প্রকাশিত হয় শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সম্পাদিত *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*। পরবর্তীকালে এই অভিধানটির একাধিক সংস্করণ হয়েছে। অদ্যাবধি বাংলা বিদ্যাচর্চার জগতে এই অভিধানের মান্যতা অনস্বীকার্য। এই অভিধানের প্রথম সংস্করণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি কতটা মেনে নেওয়া হয়েছে, তা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের একাংশ। কিন্তু বানান তো কেবল অভিধানে সীমাবদ্ধ থাকে না। গ্রন্থাদি, পত্রপত্রিকা, বিজ্ঞাপন, হোর্ডিং, প্যামফ্লেট, সরকারি নথিপত্র ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যম থেকে মুদ্রিত বানানের প্রবণতা সম্পর্কে ধারণালাভ করা সম্ভব। এই অধ্যায়ে অভিধান ব্যতিরেকেও বানানের নমুনা সংগ্রহের জন্য চারটি পত্রিকা আমরা বেছে নিয়েছি—

ক. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*

খ. সাহিত্যকেন্দ্রিক পত্রিকা *সমকালীন*

গ. আনন্দবাজার-গোষ্ঠী প্রকাশিত সাহিত্য-পত্রিকা *দেশ*

ঘ. সাহিত্য এবং সংবাদকেন্দ্রিক পত্রিকা *প্রবাসী*

প্রত্যেক পত্রিকার ১৯৫৮ সালের কোনো-না-কোনো সংখ্যা সমীক্ষার জন্য চয়ন করা হয়েছে। পত্রিকাগুলি বেছে নেওয়ার উদ্দেশ্য— সংসদ অভিধানের প্রথম প্রকাশের সমকালে মান্য পত্রপত্রিকায় যে-ধরনের বানান লেখা হচ্ছিল, তাদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ। প্রত্যেকটি পত্রিকাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্মরণীয় হয়ে আছে। আমাদের বিবেচনায়, সম্পাদকীয় তৎপরতা তথা বানান-সচেতনতার দিক থেকে এই পত্রিকাগুলিকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা যায়।

---

[৮] এই বানানবিধির মুদ্রিত সংস্করণ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় পরেশচন্দ্র মজুমদারের *বাঙলা বানান বিধি* গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত রূপ আমাদের আলোচনায় ব্যবহার করা হয়েছে। দ্র. (মজুমদার ১০২-১০৭)

১.৫.৩ সমীক্ষা সম্পর্কিত নিয়মাবলি

- সারণির প্রথম দুটি নিয়ম তৎসম-, ৩ থেকে ১১ সংখ্যক নিয়ম অতৎসম-, এবং ১৩ থেকে ২২ সংখ্যক নিয়ম বিদেশি শব্দ-সংক্রান্ত।
- তৃতীয় থেকে সপ্তম স্তম্ভে আলোচ্য পত্রপত্রিকা এবং অভিধান থেকে গৃহীত প্রাসঙ্গিক শব্দাবলি প্রদর্শিত হয়েছে। কোনো একটি শব্দে একাধিক কারণে বিতর্কের সম্ভাবনা থাকলে একাধিক ক্রমাঙ্কে তাদের অন্তর্ভুক্তি পাওয়া যাবে। যেমন, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* থেকে গৃহীত 'স্ট্রীট' শব্দটি তৃতীয় স্তম্ভের ১৫ সংখ্যক (ই-ঈ বিকল্প) এবং ২০ সংখ্যক (স-ষ বিকল্প) অনুভূমিক সারিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- উপর্যুক্ত একটি পত্রিকারও সম্পাদকীয় বিবৃতিতে পত্রিকার বানান সম্পর্কিত কোনো স্পষ্ট ঘোষণা নেই। এমতাবস্থায়, গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ ইত্যাদিতে লেখকের নিজস্ব বানান বজায় রাখা হয়েছে, নাকি পত্রিকার নিজস্ব বিধি অনুযায়ী বানান পালটে দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে সংশয় থেকে যায়। তাই আমরা যথাসম্ভব সাহিত্যিক রচনার বানান যাচাই করা থেকে বিরত থেকেছি। পত্রিকার নিজস্ব বানাননীতি বোঝার তাগিদে সম্পাদকীয় বিবৃতি, পত্রিকাকর্মীদের লিখিত সাময়িক সংবাদ, টীকাটিপ্পনী, সভার কার্যবিবরণী ইত্যাদি হয়েছে প্রধান সমীক্ষিত উপাদান।
- *সমকালীন* পত্রিকায় যথেষ্ট সম্পাদকীয় বিবৃতির অভাববশত অলোক রায় এবং দীপ্তি ত্রিপাঠীর লেখা দুটি প্রবন্ধ বেছে নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রেও অন্যমনস্ক বানান ভুল এড়াতে প্রতিষ্ঠিত প্রাবন্ধিক এবং অধ্যাপকদের লেখাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- সংসদ অভিধানে বিকল্প বানানের ক্ষেত্রে কেবল প্রথম ভুক্তিকে গ্রহণ করা হয়েছে।
- নির্দিষ্ট নিয়মের ক্ষেত্রে অলভ্য প্রাসঙ্গিক নমুনা ড্যাস দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। গ্রাফ নির্মাণের সময় এইসব ক্ষেত্রে নিয়ম পালিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।
- চারটি পত্রিকা মিলিয়ে সর্বমোট আনুমানিক ১০২৭৩টি শব্দের বানান নিরীক্ষা করা হয়েছে। এই শব্দগুলির বানান *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* থেকেও মিলিয়ে দেখা হয়েছে। মোট নিরীক্ষিত বানানের মধ্যে সারণিতে উল্লিখিত প্রাসঙ্গিক নমুনা শব্দের সংখ্যা ২৮৯।

১.৫.৪ নমুনা সমীক্ষা

ক.বি. প্রস্তাবিত বিধিতে ক্রমিক সংখ্যা	নিয়ম	*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* [৯]	*সমকালীন* [১০]	*দেশ* [১১]	*প্রবাসী* [১২]	*সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* [১৩]
১	রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বিত্ব (তৎসম শব্দ)	কার্য্য, পর্য্যন্ত, সর্ব্ব, পূর্ব্ব, আচার্য্য, কর্ম্ম, বর্ত্তমান, নির্ব্বাহক, কার্ত্তিক, 'শর্ম্মিষ্ঠা', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন', পূর্ব পূর্ব (য), মূর্ত্তি, অর্দ্ধ, নির্বাহক(য), নির্ব্বাচন, নির্বাচন(য), বিপর্য্যয়, আশীর্ব্বাদ, অপরিহার্য্য, বিপর্য্যস্ত	পর্য্যন্ত, নির্মম, সহধর্মী, পর্যন্ত (য), নির্দ্ধারণ , সৌন্দর্য, কর্ত্তৃক, কীর্ত্তন, প্রবর্ত্তন, পূর্ব্ব	সমর্থিত, পর্যন্ত, বর্তমান, সর্ব, অর্জন, গর্ব	পূর্ব্ব, পর্য্যন্ত, দুর্দ্দশা, চতুর্দ্দিক, কর্ত্তৃপক্ষ,কার্য্য, বর্ত্তমান	কার্য, সৌন্দর্য, অর্ধ, অপরিহার্য, আচার্য, আশীর্বাদ, কর্তৃক, কর্তৃপক্ষ, কর্ম, কার্তিক, বর্তমান, নির্ধারণ
২	সন্ধিজাত ঙ অথবা অনুস্বার	অলঙ্কৃত, সঙ্কুলান, সঙ্কট	অলঙ্কার, সঙ্গীত	কিম্বা, সঙ্কীর্ণ, সঙ্গত, সঙ্কুচিত	সঙ্কীর্ণ	অলঙ্কার, অলঙ্কৃত, সঙ্কুলান, সঙ্কট, সঙ্গত, কিংবা

[৯] মুখোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র (সম্পা.): *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* বর্ষ ৬৫ সংখ্যা ১, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, পৃ- এক আনা- আট আনা

[১০] ঠাকুর, সোমেন্দ্রনাথ ও সেনগুপ্ত, আনন্দগোপাল (সম্পা.): *সমকালীন* (অলোক রায়: 'বাঙলা সমালোচনা ও সাময়িক পত্রিকা'), পঞ্চম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, পৃ– ১১৩-১১৯

ঠাকুর, সোমেন্দ্রনাথ ও সেনগুপ্ত, আনন্দগোপাল (সম্পা.): *সমকালীন* (দীপ্তি ত্রিপাঠী: 'মধুসূদন কিন্নর ও ঢপগান'), পঞ্চম বর্ষ, আষাঢ় ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, পৃ-১৬৯-১৮২

[১১] সরকার, অশোককুমার (সম্পা.): *দেশ,* ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৫৮। পত্রিকার চারটি অংশ থেকে বানান নিরীক্ষা করা হয়েছে— 'আইডিয়া বনাম অস্ত্র' (পৃ-৫৮৫), 'প্রসঙ্গত' (পৃ-৫৮৬), 'বৈদেশিকী' (পৃ-৫৮৭-৮), 'সাপ্তাহিক সংবাদ' (পৃ-৬৪৮)।

[১২] চট্টোপাধ্যায়, কেদারনাথ (সম্পা.): *প্রবাসী,* ৫৮ ভাগ, প্রথম খণ্ড, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, পৃ -১-৮

[১৩] বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র: *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: ১৯৫৭

ক.বি. প্রস্তাবিত বিধিতে ক্রমিক সংখ্যা	নিয়ম	*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* [৯]	*সমকালীন* [১০]	*দেশ* [১১]	*প্রবাসী* [১২]	*সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* [১৩]
৩	রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বিত্ব (অতৎসম শব্দ)	কর্নওয়ালিস, সার্কুলার	_	মার্চ	মার্চ্চ, চার্চ্চ, চার্জ্জ, পর্দ্দা	চার্চ, চার্জ, মার্চ
৫	ই, উ	ইংরাজী, দীঘি, বাঙালী, বাড়ী, নাড়ী	ফরাসী, ইংরেজী, মিশনারী	ফরাসী, গুলী, বেশী, সরকারী, চুল্লী, পাকিস্তানী	বাঙালী, দামী, গাড়ী, হিন্দী, গাফিলতী, বাঙ্গালী	বাড়ি, দামী, নাড়ি, হিন্দি, দিঘি, বাঙ্গালী, ইংরেজী, ফরাসী, মিশনারি, সরকারি
৭	ণ, ন	লণ্ডন, এণ্ড, ইণ্ডিয়ান	বায়রণ, আর্ণল্ড, আর্নল্ড, পুরোণো	ইণ্ডিয়া, দখিন, প্রেসিডেণ্ট	জয়েণ্ট, পার্লামেণ্ট, ইনটেলিজেন্স	পার্লামেণ্ট, প্রেসিডেন্ট,
৮	ও-কার এবং ঊর্ধ্বকমা	মত (মতো অর্থে)	মত (মতো অর্থে)	_	ত, মত (মতো অর্থে), যত, তত	মত (মতো অর্থে)
৯	অনুস্বার, ঙ, ঙ্গ	বাঙলা, বাঙ্‌লা (য)	বাঙ্‌লা	বাঙলা, ডিঙ্গিয়ে	বাংলা, লিঙ্ক	বাঙ্গালা, ডিঙ্গান
১০	শ, ষ, স	_	সুরু	সর্ত, মসলা	শহর, পুলিস	শহর, শর্ত, শুরু, পুলিস, মশলা
১১	ক্রিয়াপদ	দেখান (নো)	করেছিল, দাঁড়ালো, থাক্‌তো, থাক্‌বে, হোতো, মিল্‌লো, নিলো, হোল, ছিল	হয়েছিল, এলো, হোলো, রইল, জাগল	ছিল, হ'ল, গেল, করল	এল
১৩	বিবৃত অ	_	_	দ্য গল	সার	সার

ক.বি. প্রস্তাবিত বিধিতে ক্রমিক সংখ্যা	নিয়ম	*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* [৯]	*সমকালীন* [১০]	*দেশ* [১১]	*প্রবাসী* [১২]	*সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* [১৩]
১৪	অ্যা	ক্যালিফোনিয়া(য), এণ্ড	এ্যাডোনেইস, এ্যস্থেটিক্	অ্যাটলাস	ম্যাট্রিক, ফাইন্যাল	বর্ণানুক্রমে অ্যা স্বীকৃতি পায়নি
১৫	ঈ, ঊ (বিদেশি)	কোম্পানী, ষ্ট্রীট, কর্নওয়ালিস	কীট্‌স, শেলী, থিওরী	কলোনী, জানুয়ারী, জার্মানী, নাৎসী	এজেন্সী, ষ্টীমার, লিপষ্টিক	এজেন্সি, কলোনি
১৬	f, v: ফ, ভ	_	ভারজিনিয়া উল্‌ফ, রিভিউ	ভলতেয়ার, ফাসিস্ট	টাইফয়েড, সার্ভিস, অফিসার	অফিস, রিভলবার
১৭	w: উ, ও	কর্নওয়ালিস	(অস্কার) ওয়াইল্ড, ডারউইন	(আইজেন) হাওয়ার, উইলিয়াম	রেলওয়ে	ওয়ারেন্ট, ওয়েটিংরুম
২০	স্ট	হিষ্টরিকাল, ষ্ট্রীট	ইম্‌প্রেসনিষ্টিক্, হিষ্টোরিক্, খ্রীষ্টাব্দ, খ্রীস্টাব্দ	ফাসিস্ট, কম্যুনিস্ট	ষ্টেট, ষ্টেশন, লিপষ্টিক	স্টেশন, স্টীমার, স্ট্যাম্প
২১	ज़, ज	বয়েস্	ফিলজফিক	আইজেন, কম্যুনিজম	_	ম্যাগাজিন
২২	হস্-চিহ্ন	এশিয়ান, আফ্রিকান, রেকর্ডস, কমিশন, গড্‌রেজ, বয়েস্, ট্যাক্স	‘এন্‌ডিমিয়ন’, ডিডাক্‌টিভ্, শেক্‌সপীয়র, অবজেক্‌টিভ, সাবজেক্‌টিভ, ইনডাক্‌টিভ, ইম্‌প্রেসনিষ্টিক, ফিলজফিক, ইম্‌প্রেসনিষ্টিক্, হিষ্টোরিক্,	টেলিভিশন, প্রক্টর, কৃস্‌মাস, ম্যালেনকভ, মলোটভ, শেপিলভ, বুলগানিন	অডিট, কনট্রাক্ট	অডিট, আফ্রিকান, টেক্স, কমিশন

ক.বি. প্রস্তাবিত বিধিতে ক্রমিক সংখ্যা	নিয়ম	*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* [৯]	*সমকালীন* [১০]	*দেশ* [১১]	*প্রবাসী* [১২]	*সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* [১৩]
			রোম্যান্টিক, ক্রিটিসিজ্‌ম			

সারণি ১.১: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত বানানের নমুনা সমীক্ষা

১.৫.৫ তথ্য বিশ্লেষণ

১. বিশ্ববিদ্যালয়-প্রস্তাবিত বানানবিধির অন্যতম বিতর্কিত নিয়ম ছিল সংস্কৃত শব্দে রেফের নীচে ব্যঞ্জনদ্বিত্ব বর্জন। এই বানানবিধি প্রকাশের ২০ বছরের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে, ব্যঞ্জনদ্বিত্ব বর্জনের প্রবণতা সামাজিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সংসদ অভিধান এবং *দেশ* দ্বিত্ব বর্জনের পক্ষে। অন্যদিকে, *প্রবাসী*-তে ব্যতিক্রমহীনভাবে সর্বত্র দ্বিত্ব রক্ষিত হয়েছে। *সমকালীন* মিশ্র বানানরীতি অবলম্বন করেছে। ঐতিহ্যবাহী পরিষৎ পত্রিকা এই বিষয়ে খানিক রক্ষণশীল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রেফের নীচে ব্যঞ্জনদ্বিত্ব রক্ষিত। এমনকি গ্রন্থনামেও দ্বিত্ব লেখা হচ্ছে। তবু *সমকালীন*-এর মতোই পরিষৎ পত্রিকাতেও দ্বিত্ববিহীন কিছু বানান (নির্বাহক, নির্বাচন, পূর্ব) দেখা যাচ্ছে। এই ঘটনাকে বানান ভুল না-বলে সামাজিক প্রবণতার কাছে প্রতিষ্ঠানের নতিস্বীকার বলাই শ্রেয়।

২. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির দ্বিতীয় নিয়মে ছিল, "যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ্ বিধেয়" (মজুমদার ১০২)। এখানে পক্ষপাত অনুস্বারের দিকে; ঙ্ বিকল্প মাত্র। বাস্তবে অবশ্য দেখা যাচ্ছে, সন্ধিজাত ঙ-এর স্থানে অনুস্বার উপর্যুক্ত পাঁচটি ক্ষেত্রে কোথাওই নেই। সংসদ অভিধান এবং *দেশ* রেফের নীচে দ্বিত্ববর্জনের নীতি সর্বাত্মকভাবে মেনে নিয়েছিল। অথচ, তৎসম শব্দের বানান সংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় নিয়ম এরা মেনে নেয়নি। সংসদ অভিধানে সন্ধিজাত অনুস্বার-যুক্ত বানান (অহংকার, অলংকার) প্রথম ভুক্তির স্বীকৃতি পায়নি। অর্থাৎ, রেফের নীচে দ্বিত্ববর্জনের নিয়ম মোটামুটি স্বীকৃতি পেলেও সন্ধিজাত অনুস্বার সম্পর্কিত নিয়মটি সাধারণ্যে জনপ্রিয় হয়নি। এর কারণ কী?

এই দ্বিতীয় নিয়মটি আসলে ঙ এবং অনুস্বারের ব্যবহার বিষয়ে জটিলতা বাড়িয়েছে মাত্র। ব্যাকরণে বিকল্প থাকা সত্ত্বেও কী কারণে তৎসম শব্দে ঙ-এর বদলে অনুস্বার বেশি গ্রহণযোগ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি তার কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি। পরিবর্তে অনেকগুলি বিভ্রান্তিকর বিকল্পের সূচনা করেছে—

- ক, খ, গ, ঘ পরে থাকলে সন্ধিবদ্ধ শব্দে ম্ স্থানে অনুস্বার হবে।
- পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে বিকল্পে ঙ্ হতে পারে।

- ক-বর্গ ব্যতিরেকে অন্যান্য বর্গের ক্ষেত্রে কিন্তু অনুস্বার ব্যবহার করলে উচ্চারণ-বিভ্রাট ঘটতে পারে। যেমন: *সংজাত, *স্বয়ংভূ। তাই ঙ-এর স্থানে অনুস্বার লেখার নিয়ম কেবল ক-বর্গের আগেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তক্ষেপের আগে যা ছিল একটিমাত্র সন্ধির নিয়ম, এই নিয়ম প্রণয়নের পর সেখানে তিনটি জটিল বিকল্পের সৃষ্টি হচ্ছে। সুস্পষ্ট নির্দেশের অভাবে পত্রিকা-অভিধানগুলি এই নিয়মকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

৩. কেবল *প্রবাসী* পত্রিকায় অসংস্কৃত শব্দে রেফের নীচে দ্বিত্ব বজায় রয়েছে। বাকি নমুনাগুলিতে দ্বিত্ববর্জন স্বীকৃত হয়েছে।

৪. জাতিবাচক বা ভাষাবাচক শব্দে ('ফরাসী', 'ইংরেজী' ইত্যাদি) ঈ-কার সর্বত্র মান্যতা পেয়েছে। পরিষৎ পত্রিকা এবং *প্রবাসী*-তে অতৎসম শব্দেও ('বাড়ী', 'নাড়ী', 'গাড়ী' ইত্যাদি) ঈ-কার ব্যবহৃত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০ বছর আগেই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঈ-কারের বদলে ই-কার ব্যবহারে উৎসাহ দিয়েছেন (মজুমদার ১০৩)। তবু, অ-বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে পত্রিকাগুলি দীর্ঘকাল-লালিত ঈ-কারের অভ্যাস থেকে বেরোতে পারেনি। বিদেশি শব্দে (১৫ সংখ্যক নিয়ম) পত্রিকাগুলিতে অল্প কিছু ই-কারের নিদর্শন ('কর্নওয়ালিশ', 'লিপষ্টিক') পাওয়া যায়।

৫. *সমকালীন* অসংস্কৃত শব্দেও ণত্ব বিধান ('বায়রণ', 'আর্ণল্ড') মেনে চলেছে। এই ধরনের শব্দে যুক্তাক্ষর হিসাবে ণ্ট, ণ্ড পাঁচটি ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত।

৬. পত্রিকা এবং অভিধান কোথাওই বিশ্ববিদ্যালয়-সমর্থিত 'মতো' বানান গৃহীত হয়নি।

৭. 'বাংলা' শব্দটির একাধিক বৈচিত্র্য পাওয়া যাচ্ছে: বাঙলা, বাঙ্‌লা, বাঙ্গালা। বস্তুত অনুস্বার এখানে সংখ্যালঘু। কেবল *প্রবাসী*-তেই 'বাংলা' পাওয়া যাচ্ছে। অন্যত্র, এর নানা বানানভেদ। সন্ধিযুক্ত শব্দের প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছিলাম, অনুস্বার ব্যবহারের বহুল প্রবণতা ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত অন্তত দেখা যায় না।

৮. ক্রিয়াপদের বানানে ঊর্ধ্বকমা সমীক্ষিত পাঁচটি নমুনায় দেখা যায় না। তবে ও-কার ব্যবহারের ক্ষেত্রে একাধিক বিকল্প পাওয়া যাচ্ছে। একটি-দুটি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে *সমকালীন* অতীতবোধক ক্রিয়াপদ ও-কারান্ত করে ('হোতো', 'দাঁড়ালো', 'মিল্‌লো', 'নিলো') লেখার পক্ষপাতী। *দেশ* পত্রিকায় ও-কারের প্রাধান্য। এই দুটি পত্রিকাতেই 'হয়েছিল', 'করেছিল' ইত্যাদি বানানে কিন্তু ও-কার ব্যবহৃত হচ্ছে না। অন্যদিকে, সংসদ এবং পরিষৎ পত্রিকায় ক্রিয়াপদে ও-কার বর্জিত।

৯. বিবৃত অ-এর বানান লেখার ব্যাপারে *প্রবাসী* এবং সংসদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম (আদ্যক্ষরে আ-কার, উদা: সার) মেনে নিয়েছে।

১০. /æ/ ধ্বনি বোঝানোর জন্য *প্রবাসী* এবং *দেশ* বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ মেনে 'অ্যা' অথবা য-ফলা আ-কার ব্যবহার করেছে। *সমকালীন* এবং পরিষৎ পত্রিকায় শব্দের আদ্যক্ষরে এছাড়া আরও তিন রকমের বৈচিত্র্য নজরে পড়ে: এ, এ্য, এ্যা।

১১. f এবং v-এর উচ্চারণ বোঝানোর জন্য ফ এবং ভ ব্যতীত অন্য কোনো নিরীক্ষা নজরে পড়ে না।

১২. w-এর উচ্চারণের ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মোতাবেক উ এবং ও লেখা হয়েছে সব ক'টি ক্ষেত্রে।

১৩. পরিষৎ, *সমকালীন* এবং *প্রবাসী* পত্রিকায় বিদেশি শব্দে 'ষ্ট' লেখার প্রবণতা বেশি। অন্যদিকে, *দেশ পত্রিকা* বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মেনে নিয়ে 'স্ট' ব্যবহার করেছে।

১৪. z-এর উচ্চারণ বোঝাতে ज़ বা জ় কোথাও ব্যবহৃত হয়নি।

১৫. পরিষৎ পত্রিকা হস্ চিহ্ন ব্যবহারে সংযমী। উচ্চারণ ভুলের সম্ভাবনা (গড়্‌রেজ, ট্যাক্‌স) না-থাকলে অতৎসম শব্দে হস্ ব্যবহারের প্রবণতা কম। *সমকালীন* পত্রিকায় বিদেশি শব্দে হস্ চিহ্নের ব্যবহার অত্যধিক। কোনো কোনো বানান নীতিগতভাবে পরস্পরবিরোধী বলেও মনে হতে পারে। 'ডিডাক্‌টিভ্' হস্ চিহ্ন দিয়ে শেষ হলে 'অবজেক্‌টিভ', 'সাবজেক্‌টিভ', 'ইনডাক্‌টিভ' হস্-বিহীন কেন? একইভাবে 'হিস্টোরিক্' হস্-যুক্ত, অথচ 'রোম্যান্টিক', 'ফিলজফিক' হস্-বিহীন। নিছক বানান ভুল বা মুদ্রণপ্রমাদ যদি না হয়, এই আপাত-বিরোধিতার সম্ভাব্য কারণ: বাঙালি পাঠকের কাছে অপেক্ষাকৃত চেনা শব্দগুলিতে হস্-চিহ্ন বাহুল্যবোধে বর্জন করা হয়েছে। *দেশ, প্রবাসী* এবং সংসদের বানানে হস্-চিহ্ন বর্জনের দিকে পক্ষপাত দৃষ্ট হয়। *দেশ* পত্রিকায় 'ম্যালেনকভ', 'মলোটভ', 'শেপিলভ' ইত্যাদি স্বল্প-পরিচিত বিদেশি শব্দেও হস্-চিহ্ন বর্জিত।

১৬. একঝলকে বোঝার সুবিধার্থে, উপরে বিশ্লেষিত তথ্যের ভিত্তিতে একটি গ্রাফ পেশ করা হল—

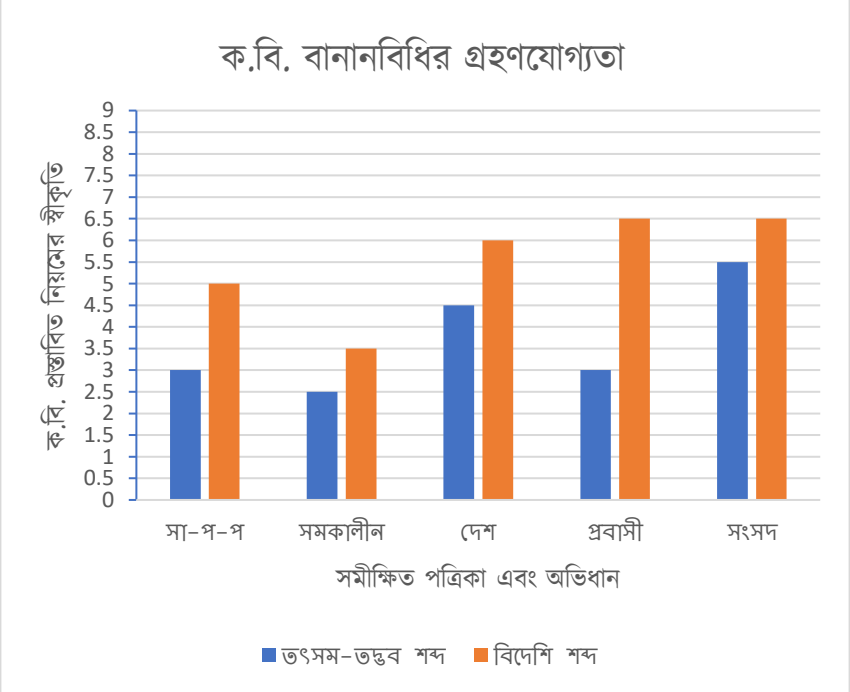

সারণি ১.২ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত বানানবিধির গ্রহণযোগ্যতা

সারণিতে উদ্ধৃত তৎসম-তদ্ভব শব্দ সংক্রান্ত ৯টি এবং বিদেশি শব্দ সংক্রান্ত ৮টি নিয়ম আলোচ্য পত্রিকা-অভিধানগুলি কতটা মেনে চলেছে, তার প্রাথমিক আন্দাজ এই গ্রাফ থেকে পাওয়া যাবে। কোনো নিয়মে যথেষ্ট সংখ্যক বিকল্প বা ব্যতিক্রম স্থান পেলে (যেমন: *সমকালীন* পত্রিকার ক্ষেত্রে তৎসম শব্দে রেফের নীচে ব্যঞ্জনদ্বিত্বের নিয়ম), সেটি অর্ধেক স্বীকৃত বলে গণনা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের শতাংশের নিরিখে হিসাব নীচের সারণি থেকে পাওয়া যাবে—

পত্রিকা-অভিধান	তৎসম-তদ্ভব শব্দ	বিদেশি শব্দ
সা-প-প	৩৩	৬৩
সমকালীন	২৮	৪৪
দেশ	৫০	৭৫
প্রবাসী	৩৩	৬৯
সংসদ	৬১	৮১

সারণি ১.৩ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির সাফল্যের হার (শতাংশে)

১.৫.৬ বানানবিধির ব্যর্থতার কারণ

পত্রিকা-অভিধান মিলিয়ে মাত্র পাঁচটি সূত্র থেকে বাংলা বানানের সামগ্রিক চিত্র হয়তো পাওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য বিবিধ উৎস থেকে যথেষ্ট সংখ্যক নমুনা বাছাই করা দরকার। সেটি একটি পৃথক গবেষণার বিষয় হতে পারে। তবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি প্রকাশের ২০ বছর পর আদৌ কতটা সর্বজনমান্য হয়ে উঠেছিল, তার প্রাথমিক আন্দাজ উপরের বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

আলোচ্য পত্রিকা-অভিধানগুলির প্রত্যেকটিই তৎসম-তদ্ভব শব্দের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রস্তাবিত বানান মেনে নিতে দ্বিধা দেখিয়েছে। এমনকি, মান্য অভিধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি ৬১%-এর বেশি স্বীকৃতি পায়নি। *দেশ*-এর মতো বানান বিষয়ে নিরীক্ষাপ্রবণ পত্রিকা মাত্র ৫০% নিয়মকে মেনে নিয়েছে। পক্ষান্তরে, বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বানানের গ্রহণযোগ্যতার হার তুলনামূলকভাবে বেশি।

সব মিলিয়ে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ-সুনীতিকুমার-রাজশেখর সমর্থিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি প্রকাশের ২০ বছর পরেও সর্বজনমান্য হয়ে ওঠেনি। ভবিষ্যতে বানানবিধি প্রণয়নের সময় তৎসম-তদ্ভব শব্দের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল এই মানসিক জাড্যের কথা স্মরণে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে পরিবর্তন ন্যূনতম হওয়া শ্রেয়। ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ একাধিক বিকল্প থাকলে সেই বানানকে নির্বিকল্প করে তোলার প্রয়াস যে সফল হয় না, বিশ্ববিদ্যালয়-বিধির দ্বিতীয় নিয়ম থেকে তা বোঝা যায়। বিদেশি উচ্চারণকে প্রকাশ করার তাগিদে বর্ণমালায় নতুন গ্রাফিমের (জ়, ভ়, ফ় ইত্যাদি) স্বীকৃতি বাঞ্ছনীয় নয়।

১.৬ বানান নিয়ন্ত্রক বিবিধ উপাদান

পূর্ববর্তী সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে, একই বানানবিধির কিছু নিয়ম সামাজিকভাবে গৃহীত হচ্ছে, আবার কিছু নিয়ম অত্যধিক জটিলতা কিংবা বানান-জাড্যের কারণে পরিত্যক্ত হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে যে-সব উপাদান দ্বারা বানান নিয়ন্ত্রিত হয়, তাদের সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল—

১। **ব্যাকরণ:** রেখাচিত্র ১.১ থেকে বোঝা যায়, বানান-সংক্রান্ত আলোচনার অন্তত ৮০ শতাংশ নির্দেশমূলক ব্যাকরণকে মান্য করে চলে। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইতোপূর্বে (উপ-অধ্যায় ১.৪) করা হয়েছে।

২। **ধ্বন্যর্থতত্ত্ব:** ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় প্রচলিত কাঠামোয় ধ্বনিতত্ত্ব (phonology) এবং অর্থতত্ত্ব (semantics) দুটি আলাদা বিদ্যায়তনিক শাখা। বানানের নিরিখে বিচার করলে এই বিভাজন খুব টেকসই নয়। কালের নিয়মে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ধ্বনিপরিবর্তন ব্যতিরেকেও বিশেষ অর্থ প্রকাশ করার জন্য স্বেচ্ছায় কোনো শব্দের ধ্বনি পালটে উচ্চারণ করতে পারেন কথক। সেই বিশেষ অর্থবহ ধ্বনিকে প্রকাশ করার জন্য বানানও পালটে যাবে। তাহলে বানানের প্রশ্নটি এখানে আর কেবল ব্যাকরণগত প্রতর্কে সীমাবদ্ধ থাকল না। পরিবর্তে বাগর্থতত্ত্ব প্রবেশ করে যাচ্ছে বানানের আলোচনায়। ধ্বনির ওপর নির্ভর করে অর্থ পালটে যাওয়ার ঘটনাটিকে স্বীকৃতি দিয়ে এই শাস্ত্রকে **ধ্বন্যর্থতত্ত্ব** নামে অভিহিত করা যেতে পারে।

ব্যাকরণের শৃঙ্খলার বিপরীতে কোনো কোনো বানানকে নিয়ন্ত্রণ করে ধ্বনির সামাজিক অর্থ। নীচে কয়েকটি উদাহরণ ব্যাখ্যা করা হল—

ক. সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যবহৃত 'কোবি', 'কোবিতা', 'বোই' ইত্যাদি বানানে মাঝে-মধ্যে লক্ষ করা যায়। ব্যবহারের প্রেক্ষিত থেকে বুঝে নেওয়া যায়, ও-ধ্বনিকে প্রস্বরিত করে (accented) উক্ত কাব্য বা বই সম্পর্কে লেখক বিদ্রুপবাণ বর্ষণ করছেন। রবীন্দ্র-রচনাতেও ব্যঙ্গাত্মক 'কাব্যি'/ 'কাব্যু' স্মরণীয় —

> ...এইপ্রকার ভাষাকে কেহ বলেন "ধুঁয়া", কেহ বলেন "ছায়া", কেহ বলেন "ভাঙা ভাঙা" এবং কিছুদিন হইল নবজীবনের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয় কিঞ্চিৎ হাস্যরসাবতারণার চেষ্টা করিতে গিয়া তাহাকে "কাব্যি" নাম দিয়াছেন। (ঠাকুর ১৭০)

প্রত্যক্ষভাবে বানান পরিবর্তন বলে দাবি করা না-গেলেও অর্থগত প্রেক্ষিতের ওপর নির্ভর করে এখানে ধ্বনি পালটে যাচ্ছে। সোস্যুরের তত্ত্বে দ্যোতক এবং দ্যোতিতের মধ্যে সম্পর্ক ছিল আপতিক। ব্যতিক্রম হিসাবে সোস্যুর ধ্বন্যাত্মক অব্যয় এবং আবেগ-প্রকাশক কিছু শব্দকে গণ্য করেছিলেন। এই উদাহরণে কিন্তু বিশেষ্যের ক্ষেত্রেও সোস্যুরের তত্ত্বের ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়।

খ. আধুনিক প্রয়োগের মধ্যে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর লেখা থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক —

> ক্ষীর ক্ষীর রক্ত রক্ত' বলে যে চিল্লাচ্ছে সে কিন্তু বিসর্জন নাটকের রঘুপতির কিংবা প্রতিশোধ সিনেমার পোসেনজিতের ডায়লগ ঝাড়ছে না, ও বিক্রি করছে বিট-গাজর! (চক্রবর্তী, স্বপ্নময়)

রঘুপতি 'রোঘুপোতি' হল না, কিন্তু অভিনেতা প্রসেনজিতের নামের বানান 'পোসেনজিত' হয়ে গেল। গ্রামীন পশ্চিমবঙ্গে এক বিশেষ পপ-সংস্কৃতির প্রতিনিধি হিসাবে লিখিত হচ্ছে 'পোসেনজিত' বানান। অন্যত্রও এই প্রয়োগ লক্ষ করা যায়— "পত্র-পত্রিকা থেকে জানা যায় যে প্রসেনজিৎ এখন আর 'পোসেনজিত' থাকতে চান না। উনি এখন মনে রাখার মতো চরিত্র করার চেষ্টা করছেন এবং করবেন" (চট্টোপাধ্যায়)।

গ. র-বিহীন বানান তথা উচ্চারণের প্রতি অভিজাতের উচ্চম্মন্যতা সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিসরেও বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। ২৯ এপ্রিল, ২০১৯ বামপন্থী রাজনীতিক সূর্যকান্ত মিশ্র ট্যুইট করেন:

> Gobment,poblem, theat, poposal, popaganda, poperly, pocuring, pocess, popety, pice, kalpits, potection, pesident, poject.. and the list goes on!!!

If you want the "R" back..... vote judiciously! (Surjya Kanta Mishra [@mishra_surjya])

এরপরই বিষয়টি রাজনৈতিক মাত্রা পেয়ে যায়। সেই বিতর্ক অবশ্য বর্তমান আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক। উপরের তিনটি উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, অপ্রমিত বানানকে নিছক বানান ভুল বলে উপেক্ষা করা যায় না। তথাকথিত 'ভুল'-এর পিছনে নিহিত থাকছে সমাজ-মনস্তত্ত্ব। ফ্যর্দিনান্দ দ্য সোস্যুর তাঁর 'Course in General Linguistics' গ্রন্থে দাবি করেছিলেন, শব্দের দ্যোতক এবং দ্যোতিতের মধ্যে সম্পর্ক নিতান্ত আপতিক—

> The bond between the signifier and the signified is arbitrary. ...The idea of 'sister' is not linked by any inner relationship to the succession of sounds s-ö-r which serves as its signifier in french; that it could be represented equally by just any other sequence is proved by difference among languages... (Saussure 67–68)

যেমন, 'গাছ' শব্দ গঠনকারী ধ্বনিগুলির সঙ্গে গাছের ধারণা আপতিকভাবে অন্বিত। গাছের ধারণা প্রকাশের জন্য যদি অন্য কোনো শব্দ (উদা: 'ভাত') সুদূর অতীতে ব্যবহৃত হত, তাহলে আজ মানুষ 'ভাত' বললে গাছকেই বুঝত। সোস্যুরের এই দাবি ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে স্বীকৃত হলেও ভাষা সম্পর্কিত কোনো কোনো প্রাচ্য তত্ত্বকাঠামো এই মতের বিরোধিতা করে থাকে। তন্ত্রে প্রত্যেকটি বর্ণের ধর্মীয় তাৎপর্য স্বীকৃত। আচার্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত জানাচ্ছেন:

> The different *varṇas* therefore represent the different functions of the *māṭrkās* and these *māṭrkās* being parts of the creative forces are associated with particular conative, cognitive and emotional tendencies... (Dasgupta 68)

প্রত্যেকটি বর্ণের স্বকীয় তাৎপর্যের কথা কলিম খান এবং রবি চক্রবর্তী প্রণীত ক্রিয়া-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থতত্ত্বেও স্বীকার করা হয়েছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। আচার্য নাকি আচার্য্য— কোন্ বানান গৃহীত হবে? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতে, রেফের নীচে দ্বিত্ববর্জন করে 'আচার্য' লেখা উচিত। অন্যদিকে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় য-ফলার ধ্বনিগত উচ্চারণকে গুরুত্ব দিয়ে 'আচার্য্য' লেখার পক্ষপাতী। কলিম খানের মতে, শব্দদুটি ভিন্নার্থক (হোসেন ৫১-৫২)। 'আচার্য' মানে আচার (আচরণসমূহের আশ্রয়) ধৃত থাকে যাতে। উদা: কাগজ, বই, নথি ইত্যাদি। আর 'আচার্য্য' মানে আচার্য ধৃত থাকে যাতে। অর্থাৎ, পূর্বোক্ত বই, নথি ইত্যাদি যিনি মনে রাখেন। অপ্রাতিষ্ঠানিক এই তত্ত্ব নিশ্চয়ই বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। তবু বানান সমতাবিধানের আত্যন্তিক উৎসাহ ব্যাকরণকে সমাজ-বিচ্যুত নিরালম্ব যান্ত্রিকতায় যাতে পর্যবসিত না-করে, সেদিকে লক্ষ রাখা দরকার।

ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ধ্বনির অর্থগত তাৎপর্য ভাষাবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন। শৈলীবিজ্ঞানের আলোচনাতে স্বর এবং ব্যঞ্জনধ্বনির নিজস্ব অর্থগত তাৎপর্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায়, বাংলা ভাষার বানান সংস্কর্তারা কেউই বানানবিধি নির্মাণের সময় ধ্বন্যর্থতত্ত্বকে গুরুত্ব দেননি। কিন্তু লোকায়ত ব্যবহারে, অপ্রাতিষ্ঠানিক লিখনরীতিতে ধ্বনির অর্থগত তাৎপর্য বানানকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

৩। **সাক্ষরতা:** বানান প্রমিতকরণের সপক্ষে একটি বহুল প্রচলিত যুক্তি হল— এতে শিশুদের ভাষাশিক্ষায় সুবিধা হবে। এক শব্দের এক বানান হওয়ায় বিভ্রান্তির অবকাশ থাকবে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার কমিটির প্রস্তাবে এবম্বিধ যুক্তি দেখা যায়—

> কেবল বর্তমান লেখক ও পাঠকগণের লাভালাভ হিসাব করিয়া বানানের নিয়ম গঠন করিলে সুবিচার হইবে না। ভবিষ্যতে যাহারা লেখাপড়া শিখিবে তাহাদের যদি অধিকতর সুবিধা হয়, তবেই নিয়ম সার্থক হইবে।[১৪] (মজুমদার ১০১)

ভবিষ্যতে শিক্ষণের ক্ষেত্রে সুবিধার কথা ভেবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকে উক্ত বিধি মেনে চলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত শতকের আটের দশকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আরেকবার বানান সংস্কারের উদ্যোগ করা হয়। তখন অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তী উচ্চারণ-অনুগ বানানের (উদা: রক্ত, রুক্‌কিনি, পদ্‌দঁ ইত্যাদি) পক্ষে সওয়াল করেন। এই বানান-নীতি ১৯৩৬ সালের বানান-নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে থেকে বাংলা বানানের খোলনলচে পালটে দিতে চেয়েছিল। আশ্চর্যজনকভাবে, এখানেও কিন্তু বানান সংস্কারের কারণ হিসাবে শিশুশিক্ষার দোহাই দেওয়া হচ্ছে—

> নতুন টাইপ পুরোনো টাইপ, এ-কেলে বানান সেকেলে বানান, যুক্তাক্ষর বিষয়ে এক এক জায়গায় এক এক পদ্ধতি এ সবই এক ধরনের অস্থিরতার পরিচায়ক। শিক্ষার্থী শিশুর পক্ষে—চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার প্রভাব যেখানে প্রবল — বাংলা অক্ষর ও পদের এই বহুরূপী চেহারা অত্যন্ত ক্ষতিকর। (চক্রবর্তী, জগন্নাথ ২৫৯)

এর প্রায় এক দশক পরে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বানান সমতাবিধানের উদ্যোগ করেন। আকাদেমির বানান-বিষয়ক সুপারিশপত্রে ফিরে আসে সেই বহু পুরাতন শিশুশিক্ষার যুক্তিটি —

> ...সেই নিয়মসূত্র অনুসরণ করে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চতর পর্যায় অবধি পাঠ্যপুস্তক রচিত হলে, এবং ব্যানার ইত্যাদির ঘোষণায়, দূরদর্শনের বিজ্ঞপ্তিতে, সরকারি নানা প্রচারপত্রে তা অনুসৃত হলে, শিক্ষার্থীদের পক্ষে একধরনের বানানরীতিতে অভ্যস্ত হওয়া সম্ভব হবে এবং বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা দূর হতে পারবে। (মজুমদার ১১৩)

পরবর্তীকালে ভাষাতাত্ত্বিক এবং অভিধানকার সুভাষ ভট্টাচার্যের বানান প্রমিতকরণ বিষয়ে লেখাতেও ফিরে আসে শিক্ষা-সংক্রান্ত সেই পুরাতন 'যুক্তি' —

> হয় সবাইকে কোনোভাবে একমত হতে হবে একটি বানান নিয়ে, নয়ত সবাইকে একমত হয়ে এক বা একাধিক বিকল্প স্বীকার করে নিতে হবে। পাঠক লেখক ও শিক্ষার্থীর প্রতি তাতেই কিছু সুবিচার হবে। (ভট্টাচার্য, সুভাষ ৯৩)

পূর্বোক্ত বানানবিধিগুলির মধ্যে ব্যাকরণগত অবস্থানের ফারাক বিস্তর। সুভাষ ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এবং সাহিত্য সংসদের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করলেও তাঁর ব্যক্তিগত বানান-নীতি এই দুই সংস্থার সঙ্গে হুবহু মেলে না। তবু উপর্যুক্ত চারটি ক্ষেত্রেই প্রমিতকরণ কার্যকর করলে শিক্ষার্থীদের সুবিধা হবে বলে দাবি করা হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই, প্রত্যেকের দাবি সত্য হতে পারে না। এখন খতিয়ে দেখতে হবে, প্রমিত বানান সত্যই শিক্ষা-শিক্ষণ পদ্ধতি (learning and teaching process) সহজ করে তোলে কি না।

ভাষাতাত্ত্বিকের কাজ ভাষাকে নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ। 'এক স্বনিম — এক অক্ষর' এবং 'এক শব্দ — এক বানান' নীতি মেনে নিলে ভাষাতাত্ত্বিকের কাজে সুবিধা হয়। পক্ষান্তরে, একজন ভাষা ব্যবহারকারীর পক্ষে কিন্তু এই নীতিসমূহ অসুবিধার কারণ হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে *সরল* এবং *জটিল* বানানের

---

[১৪] নিম্নরেখ সর্বদা বর্তমান গবেষক-কৃত। অন্যথায় আলাদাভাবে উল্লেখ করা হবে।

(shallow and deep orthography) ধারণা (Bird 24)। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কথিত 'শহজ বাংলা' নীতিকে *সরল* বানান বলা যেতে পারে। উচ্চারণ-অনুগ বানানবিধিও আসলে একধরণের *সরল* বানানবিধি। এখানে একটি স্বনিমের জন্য একটিমাত্র অক্ষর বরাদ্দ করা হয়। বিকল্প বানানের কোনো স্বীকৃতি নেই। বানানবিধি নির্মাণের সময় ভাষার ঐতিহাসিক বিবর্তন গুরুত্ব পায় না। প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা সাধারণত প্রত্যেকটি অক্ষর ধরে-ধরে সরবে পাঠ করে থাকেন। তাঁদের পক্ষে *সরল* বানানবিধি সুবিধাজনক। অন্যদিকে, অভ্যস্ত পাঠক প্রত্যেকটি অক্ষর পড়েন না। নীরবে একেকটি শব্দে তিনি মনোনিবেশ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার্থীর কাছে গুরুত্ব পায় উচ্চারণ। অভ্যস্ত পাঠকের কাছে গুরুত্ব পায় শব্দার্থ। এক্ষেত্রে *সরল* বানানবিধি অভ্যস্ত পাঠককে দ্রুত শব্দার্থনির্ণয়ে সাহায্য করে বলে গবেষণায় কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরং *সরল* বানানবিধির অনৈতিহাসিক চরিত্র শব্দার্থ নির্ণয়ে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, পারিভাষিক শব্দ চলভাষ (mobile)-এর অর্থ না-জানলেও অভ্যস্ত পাঠক এইটুকু অন্তত আন্দাজ করতে পারবেন গতি (চল) এবং ভাষার (ভাষ) সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে। কিন্তু 'চলোভাশ' বানান লেখা হলে শব্দার্থের ঐতিহাসিক যোগসূত্রটি ছিন্ন হয়ে যায়।

রিচার্ড এল ভেনেজ়কি প্রাথমিক শিক্ষার্থীর ক্রমশ অভ্যস্ত পাঠকে পরিণত হয়ে ওঠার পর্যায়গুলিকে নিম্নলিখিতরূপে চিহ্নিত করেছেন (Venezky 260) —

১। অক্ষর চেনা। প্রতিটি অক্ষরের সঙ্গে ধ্বনির সম্পর্ক স্থাপন করা।

২। শব্দ উচ্চারণ করে পড়তে শেখা।

৩। দীর্ঘ লেখা (discourse) উচ্চারণ করে পড়তে শেখা।

৪। অধিক ব্যবহৃত শব্দাবলি দেখামাত্র চিনতে শেখা। একে বলে দৃশ্যগত শব্দসম্ভার (sight vocabulary) গঠন।

৫। নীরব পাঠ ও অর্থগ্রহণ।

লক্ষণীয়, প্রথম তিনটি ধাপের ক্ষেত্রে *সরল* বানান সহায়ক। কিন্তু চতুর্থ এবং পঞ্চম ধাপে দ্রুত পঠনের স্বার্থে বানানের জটিলতা বৃদ্ধি (স্বনিম ও অক্ষরের 'one-to-one mapping' অমান্য করা, যুক্তাক্ষর, সন্ধি-সমাসের প্রয়োগ, বিকল্প বানানের স্বীকৃতিলাভ ইত্যাদি) অনিবার্য। স্বাভাবিক ভাষা ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে বানান নিছক স্বনিমীয় লিপ্যন্তরে পরিণত হলে সেই শিকড়হীন ভাষার ব্যবহার্যতা হ্রাস পাবে। বানানের জটিলতা কমলেই প্রাথমিক শিক্ষা সহজ হবে, এটি বহুল-প্রচারিত মিথ। ভেনেজ়কি জানাচ্ছেন —

> Justification for the retention of all phonemic contrasts is usually based upon the argument that children learn to read much more quickly with a regular (i.e. phonemic) writing system, than they do with a system which deviates in any way from this ideal.
>
> For this contention there is no supporting evidence; in fact, experiments with the I.T.A sysytem for almost ten years in America and England have produced, at best, equivocal results. (Venezky 263)

একই সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন ভাষাবিজ্ঞানী জন ডাউনিং, "The slower learning children do begin to show some benefit from I.T.A. at the end of third year, but the poorest 10 per cent show negligible improvements in the results" (Downing 293)। বানানের তথাকথিত জটিলতা নয়, শিক্ষা-সম্পর্কিত অন্য বিভিন্ন উপাদানের ন্যূনতা শিক্ষার্থীর অক্ষর চেনার ক্ষমতাকে ব্যাহত করে। ফিটেলসান তাঁর গবেষণায় (Feitelson 55–61) প্রধানত শিক্ষার্থীর আর্থিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে জড়িত এইরকম কিছু উপাদানকে চিহ্নিত করেছেন—

১। শিক্ষার্থীর গৃহে ক্রেয়ন, কাগজ, হস্তশিল্পের ন্যূনতম সরঞ্জামের অভাব শিশুর কার্যক্ষমতা বিকাশ (motor skill development) ব্যাহত করে।

২। শৈশবে যে-সব শিশু ছবির ধাঁধা (puzzle), বোর্ড গেম ইত্যাদির সংস্পর্শে আসেনি, তাদের একইরকম দেখতে অক্ষরগুলির মধ্যে পার্থক্য করতে সমস্যা হয়।

৩। শৈশবে বাবা-মা যদি বাড়িতে বিস্তারিত ভাষিক কোড (elaborate language code) ব্যবহার করে কথা না বলেন, তা শিশুর ভাষিক দক্ষতা হ্রাসের কারণ হয়। প্রাথমিক শিক্ষার্থীর বানান ভুলের অন্যতম কারণ লিখিতব্য শব্দটির সঙ্গে শিশুর অপরিচয়। এক্ষেত্রে ওই নির্দিষ্ট ভাষার বানান *সরল* কি না, সেই প্রশ্ন গৌণ।

প্রাথমিক শিক্ষার্থীর অক্ষর পরিচয়ে কেন সমস্যা হয়, এই প্রশ্নটিকে অন্য দিক থেকেও বিবেচনা করা যেতে পারে। ধরা যাক, ফিনিশ ভাষার বানানের কথা। এই ভাষার বানান অত্যন্ত নিয়মানুগ। স্বনিম-গ্রাফিমের মধ্যে প্রায় সর্বত্র 'one-to-one mapping' সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ, এক ধ্বনি— এক অক্ষর নীতি মেনে চলে এই ভাষা। তাহলে কি ফিনিশ ভাষার প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের কাছে অক্ষর-পরিচয় অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ বলে মনে হয়? H. Lyytinen এবং M. Aro- এর মতে,

> Nonetheless, a number of Finnish children also struggle with the acquisition of literally skills, albeit of such transparent, alphabetic orthography. This means that even when the acquisition of phonological recoding skill is facilitated by the orthography, there are obviously other obstacles that hinder mastery of accurate reading and spelling and also fluent reading. (Lyytinen and Aro 101)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বানানবিধি তথাকথিত *সরল* হলেই প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সুবিধা হবে, এমন নয়। এমনকি যদি তা হতও, কেবল প্রাথমিক শিক্ষার কথা ভেবে পরিণত ভাষা শিক্ষার্থীদের ওপর *সরল* বানান চাপিয়ে দেওয়া, ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতাকে অস্বীকার করে বিকল্প বানানে নিষেধ আরোপ করা, যাবতীয় ইদানীন্তন এবং ধ্রুপদী গ্রন্থ *সরল* বানানে মুদ্রিত করা যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত হতে পারে না।

৪। বহুভাষিকতা: বানান প্রমিতকরণ কোনো নৈর্ব্যক্তিক প্রক্রিয়া নয়। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে এই কাজে যাঁরা বিভিন্ন সময়ে যুক্ত থেকেছেন, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকে কমপক্ষে তিনটি ভাষায় (বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত) স্বচ্ছন্দ। বিশেষত, উনিশ শতকের র‍্যনেসাঁস-পরবর্তী সময় থেকে বহুভাষিক বাঙালির সংখ্যা অপ্রতুল নয়।

বানান প্রমিতকরণের ক্ষেত্রে এইসব আলোচকদের পাণ্ডিত্য অনেকসময় বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রকাশের পথকে রুদ্ধ করেছে। কয়েকটি বিশেষ উদাহরণ নীচে আলোচনা করা হল।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রণীত 'চ'লতি ভাষার বানান' (১৯২৫ খ্রি.) সম্পর্কে প্রধান আপত্তি এই যে, ঊর্ধ্বকমার অতিরিক্ত ব্যবহার লিখনের স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করেছে। বুদ্ধদেব বসুর বানান-রীতিতেও একই সমস্যা দেখা যায়। ইংরেজি ভাষার প্রভাবে এই সমস্যা বাংলা বানানে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে, ফরাসি সাহিত্য-সংস্কৃতির নিবিড় রসভোক্তা বুদ্ধদেব বসুর বানান-চেতনাকে জটিল করে তুলেছে ফরাসি ভাষার প্রভাব। ফরাসি /j/ -এর উচ্চারণ বোঝানোর জন্য তিনি জ-এর নীচে দ্বিবিন্দুচিহ্ন ব্যবহার করতেন। আরেক ফরাসি বিশেষজ্ঞ পলাশ বরন পাল পূর্বোক্ত ধ্বনির যথাযথ উচ্চারণ বোঝানোর জন্য ঝ-এর নীচে বিন্দুচিহ্ন ব্যবহারের পক্ষপাতী। বহুভাষাবিদ সুভাষ ভট্টাচার্য ফরাসি /j/ বোঝাতে কখনও ঝ, কখনও বা জ-এর নীচে দ্বিবিন্দুচিহ্ন ব্যবহার করেছেন। তিনি দন্তৌষ্ঠ্য v, f- স্বনিমকে লিপিগত স্বীকৃতি দিতে যথাক্রমে ভ এবং ফ -এর নীচে বিন্দুচিহ্ন ব্যবহার করেছেন (ভট্টাচার্য, সুভাষ, *সংসদ বিদেশি নামের উচ্চারণ* চোদ্দো-সাতাশ)। নির্দিষ্ট কোনো বিদেশি স্বনিম কোন্ বাংলা অক্ষর দ্বারা প্রকাশিত হবে, তা নিয়ে বিতর্ক প্রত্যাশিত। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত লেখকেরা যদি বহুভাষিক না হতেন, এইসব স্বনিম নিজস্ব ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যসমেত বাংলা বানানে আদৌ স্বীকৃতি পেত না। মূল বিদেশি ভাষার উচ্চারণের প্রতি বিশ্বস্ত হতে গিয়ে বানানে অনাবশ্যক জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫। ধর্ম: আপাতভাবে ব্যাকরণ ধর্মের সঙ্গে অন্বিত নয়। তবু ক্ষেত্রবিশেষে জনমানসে বিরাজমান ধর্মকেন্দ্রিক আবেগ ব্যাকরণকে প্রভাবিত করতে পারে। ত্রিপুরা বসু জানিয়েছেন, 'প্রভু' এবং 'কৃষ্ণ' লেখার সময় আলাদাভাবে ব্যবহৃত চিহ্নের কথা (বসু, ত্রিপুরা ২১২)। এখানে দুটি অক্ষর একসঙ্গে না লিখে একটিমাত্র চিহ্ন দ্বারা শব্দকে প্রকাশ করা হচ্ছে। হিন্দুসমাজে সিদ্ধিসূচক ৭, মুসলমান সমাজে ৭৮৬ সংখ্যার বিশেষ তাৎপর্যের কথাও তিনি উল্লেখ করছেন। ওঙ্কারধ্বনি বোঝাতেও বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বর্ণের বা যুক্তবর্ণের প্রথাগত গঠননির্ভর উচ্চারণ হয় না। বরং এই শব্দগুলির ধর্মীয় তাৎপর্য থাকায় তাদের দৃশ্যমান রূপ পৃথক স্বীকৃতিলাভ করে। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগোতে নাগরী লিপিতে লিখিত সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া যায়। সংস্কৃতের নিজস্ব কোনো লিপি না-থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় গুরুত্বের কারণে নাগরী লিপি এইসব ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাচ্ছে। ঢাকার বাংলা একাডেমির বানানবিধিতে ধর্ম-সংক্রান্ত কিছু বিদেশি শব্দে ব্যতিক্রমীভাবে য-কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে—

> ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ শব্দে 'যে', 'যাল', 'যোয়াদ', 'যোই' রয়েছে, যার ধ্বনি ইংরেজি z-এর মতো, সে ক্ষেত্রে উক্ত আরবি বর্ণগুলির জন্য য ব্যবহার হওয়া সঙ্গত। যেমন: আযান, এযিন, ওযু, কাযা, নামায, মুয়াযযিন, যোহর, রমযান। (সেনগুপ্ত এবং বসু ৭৮)

গত শতকের বিশের দশকে ধর্মীয় নিরপেক্ষতার কারণে আরবি বা সিরিলিক লিপিকে বাদ দিয়ে রোমক লিপিতে তুর্কি ভাষা লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল (Winner 133–47)। সাম্প্রতিককালে উভয় বাংলায় ঘনিয়ে ওঠা ইদ/ঈদ বানান-বিতর্ক ব্যাকরণের আঙিনায় ধর্মীয় আবেগ অনুপ্রবেশের আরেকটি দৃষ্টান্ত।

৬। উপর্যুক্ত উপাদানগুলি ছাড়াও আরও কিছু গৌণ উপাদান বানানকে প্রভাবিত করে থাকে। প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে বিশেষ বানানের ব্যবহার ইংরেজি ভাষায় লক্ষ করা যায়। টেক্সট মেসেজ, ইন্টারনেট বার্তা, গেমিং ইত্যাদি

ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্তকরণের জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বিত হয়। যেমন- u r r8 (you are right), kool, je t'♥ (=je t'aime) ইত্যাদি। ফরাসি ক্রিয়াপদ aimer (ভালোবাসা)-এর বদলে হৃদয়চিহ্ন ব্যবহৃত হচ্ছে। তারুণ্য, উদ্দীপনা ইত্যাদি বোঝাতে প্রচলিত বানানে c-এর বদলে k ব্যবহার বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের নামে পাওয়া যায়। বাংলা অক্ষরে এই ধরনের প্রয়োগ প্রায় নেই। তবে রোমক লিপিতে বাংলা লিখলে ছ বোঝাতে 6-এর ব্যবহার (উদা: kor6i) ব্যতিক্রম বলে ধর্তব্য। মান্য বানান নির্ধারণের সময় মুদ্রণের আর্থিক খরচের বিষয়টিও মাথায় রাখতে হয়। গত শতকের ষাটের দশকে আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠী বিদেশি শব্দে যুক্তাক্ষর ভেঙে লেখার প্রস্তাব করেন। আন্টার্কটিকা শব্দটিকে আনটারকটিকা লিখলে শুধু যে ব্যাকরণ আহত হয় তা-ই নয়, মুদ্রণের খরচও বৃদ্ধি পায়।

১.৭ সিদ্ধান্ত

এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনায় দেখা গেল, বানান-সংস্কার বলতে বাংলা ভাষায় এতদবধি কেবল কলকাতাকেন্দ্রিক মান্য ভাষার ব্যাকরণভিত্তিক সংস্কার হয়েছে। শতাধিক বছরের বানান-প্রতর্কে সামাজিক স্তরে বানান নিয়ন্ত্রক উপাদানগুলি সম্পর্কে চর্চা প্রায় হয়নি। উপভাষার বানান প্রমিতকরণের উদ্যোগ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থেকে গেছে। 'সমতাবিধান শিশুশিক্ষার সহায়ক' — গোত্রের আপ্তবাক্য বারবার ঘুরিয়েফিরিয়ে বলা হয়েছে। অথচ ভাষিক দক্ষতা অর্জন সম্পর্কিত গবেষণার সংখ্যা নগণ্য। সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বানান পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহার বাধ্যতামূলক করলেই কোনো বানানবিধি সর্বজনমান্য হয়ে যায় না। সাধারণ্যে গ্রহণযোগ্যতা পেতে হলে আধুনিক বাংলা বানানের নিয়ম সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের ওপর স্থাপিত হতে হবে।

তথ্যসূত্র

Bird, Steven. "Strategies for Representing Tone in African Writing Systems." *Written Language & Literacy*, vol. 2, no. 1, July 1999, pp. 1–44. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1075/wll.2.1.02bir.

Dasgupta, Sashi Bhusan. *An Introduction to Tāntric Buddhism*. University of Calcutta, 1950.

Downing, John. *Evaluating the Initial Teaching Alphabet*. Cassel, 1967.

Feitelson, Dina. "Teaching Reading to Culturally Disadvantaged Children." *The Reading Teacher*, vol. 22, no. 1, 1968, pp. 55–61, http://www.jstor.org/stable/20196046. JSTOR.

Lyytinen, H., and M. Aro. "Children's Language Development and Reading Acquisition in a Highly Transparent Orthography." *Handbook of Orthography and Literacy*, edited by R.M. Joshi and P.G. Aaron, First Published, Routledge, 2016.

"Orthography." *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/orthography?q=orthography.

Saussure, Ferdinand de. *Course in General Linguistics*. Edited by Charles Bally and Albert Sechehaye, Translated by Wade Baskin, Philosophical Library, 1959.

Sebba, Mark. *Spelling and Society: The Culture and Politics of Orthography around the World*. 1st ed., Cambridge University Press, 2007. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1017/CBO9780511486739.

Surjya Kanta Mishra [@mishra_surjya]. “"Gobment,Poblem, Theat,Poposal, Popaganda, Poperly, Pocuring,Pocess, Popety, Pice, Kalpits Potection, Pesident, Poject.. and the List Goes on !!! If You Want the " R ‘ Back.....Vote Judiciously ! 😜 😜 ’ Excellent Ponunciation! Hold High the Redflag to Get the R Back. #Vote4Left.” *Twitter*, 29 Apr. 2019, https://mobile.twitter.com/mishra_surjya/status/1122868367159779328.

Venezky, Richard L. “Principles for the Design of Practical Writing Systems.” *Anthropological Linguistics*, vol. 12, no. 7, 1970, pp. 256–70, http://www.jstor.org/stable/30029259. JSTOR.

Winner, Thomas G. “Problems of Alphabetic Reform among the Turkic Peoples of Soviet Central Asia, 1920-41.” *The Slavonic and East European Review*, vol. 31, no. 76, 1952, pp. 133–47, http://www.jstor.org/stable/4204408. JSTOR.

ঘোষ, দেবপ্রসাদ. *বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান.* মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ.

ঘোষ, মণীন্দ্রকুমার. *বাংলা বানান.* দে’জ ষষ্ঠ সংস্করণ, দে’জ পাবলিশিং, শ্রাবণ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ.

চক্রবর্তী, জগন্নাথ. “বাংলা বানান সংস্কার প্রস্তাব.” *ভাষা,* সম্পাদক- মৃণাল নাথ, প্রথম প্রকাশ, এবং মুশায়েরা, ২০১৮.

চক্রবর্তী, স্বপ্নময়. "বাজারিয়া." আনন্দবাজার অনলাইন, ২১ নভেম্বর, ২০১৫, https://www.anandabazar.com/amp/supplementary/patrika/%E0%A6%AC-%E0%A6%9C-%E0%A6%B0-%E0%A7%9F-1.245194.

চট্টোপাধ্যায়, শিলু. "২২ গজে প্রসেনজিতের মস্তানি." আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ অক্টোবর, ২০১১, https://archives.anandabazar.com/archive/1111008/8cine.html.

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *সাহিত্য.* তৃতীয় সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ.

বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যরঞ্জন. *সংস্কৃত বনাম বাঙলা ব্যাকরণ.* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৩.

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ. "বানান." *বঙ্গীয় শব্দকোষ,* দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমী.

বসু, ত্রিপুরা. *বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠপরিক্রমা.* প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, ২০০০.

বসু, রাজশেখর. "বানান." *চলন্তিকা,* এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪২১ বঙ্গাব্দ.

বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম. পরিমার্জিত সংস্করণের প্রথম মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৫.

বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র, সম্পা. "বানান." *সংসদ বাংলা অভিধান,* ত্রয়োবিংশতিতম মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, জুলাই, ২০১৬, https://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/app/biswas-bangala_query.py?page=599.

ভট্টাচার্য, মিতালী. *বাংলা বানানচিন্তার বিবর্তন.* প্রথম সংস্করণ, পারুল প্রকাশনী, ২০০৭.

ভট্টাচার্য, সুভাষ. *ভাষার অভিমুখ.* প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০.

— *সংসদ বিদেশি নামের উচ্চারণ.* চতুর্থ মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, ২০১৭.

মজুমদার, পরেশচন্দ্র. *বাঙলা বানান বিধি.* দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪.

মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ. "বাংলা বানান সংস্কারের রূপরেখা." *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* সম্পা. উৎপল ঝা, ১২১ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ (মাঘ ১৪২২ বঙ্গাব্দ).

মুসা, মনসুর. বানান: *বাংলা বর্ণমালা পরিচয় ও প্রতিবর্ণীকরণ.* প্রথম প্রকাশ, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৭.

রায়চৌধুরী, মাণিকলাল, সম্পা. *আ-মরি বাংলা ভাষা.* প্রথম সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ প্রধানশিক্ষক সমিতি, ফেব্রুয়ারি, ২০০৫.

সরকার, পবিত্র. *চম্‌স্কি ব্যাকরণ ও বাংলা বানান.* পুনশ্চ, ২০১৩.

— *বাংলা বানান সংস্কার: সমস্যা ও সম্ভাবনা.* দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪.

সেনগুপ্ত, সমীর এবং বসু, সমীর, সম্পা. "বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম, প্রথম সংস্করণ ১৯৯২." *বাংলা বানান: বিতর্ক ও সমাধান,* প্রথম প্রকাশ, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৭.

হোসেন, শওকত, সম্পা. *বাংলাভাষার বানান সংস্কার: কলিম খান-মঈন চৌধুরী বিতর্ক.* প্রথম প্রকাশ, নালন্দা প্রকাশন, ২০০৭.

দ্বিতীয় অধ্যায়: বিদেশি শব্দের বাংলা বানান: কয়েকটি প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পর্যবেক্ষণ

২.১ প্রারম্ভিক নীতি নির্ধারণ

বাংলা বানান নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। তবে সেইসব বিতর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবর্তিত হয়েছে তৎসম ও তদ্ভব শব্দের বানানকে কেন্দ্র করে। অ-বাংলা (অন্যান্য ভারতীয় ভাষার এবং বিদেশি) শব্দের বানান নির্ণয় নিয়ে মৌলিক প্রবন্ধ খুব বেশি নজরে পড়ে না। অ-বাংলা শব্দের বানান প্রসঙ্গে প্রথমেই একটি সংশয়ের সম্মুখীন হতে হয়। লেখককে বেছে নিতে হয় যে-কোনো একটি পন্থা –

১। অ-বাংলা শব্দটির উচ্চারণ বাংলা অক্ষরে যতটা সম্ভব কাছাকাছি প্রকাশের চেষ্টা করা যেতে পারে। যেমন: ফরাসি নাম Rimbaud- এর বানান বঙ্গাক্ষরে র‍্যাঁবো বা হ্যাঁবো লেখা যেতে পারে।[১]

২। শব্দটির উচ্চারণ নিয়ে ভাবিত না হয়ে তার প্রতিবর্ণীকরণের/ লিপ্যন্তরের[২] চেষ্টা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে নাগরী বা অন্যান্য ভারতীয় লিপি থেকে লিপ্যন্তরের প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায়। রোমক লিপি থেকে লিপ্যন্তরের সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকলেও তা এখনও সর্বজনের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

বর্তমান অধ্যায়ের প্রথমাংশে লিপ্যন্তরের নিয়ম সম্পর্কিত বিভিন্ন বিতর্কের ওপর আলোকপাত করা হবে। শেষাংশে বাংলা ভাষায় লিপ্যন্তরের সম্ভাব্য নিয়ম কী হওয়া উচিত, সে বিষয়ে আমাদের নিজস্ব প্রস্তাব পেশ করা হবে। এর ফলে একদিকে যেমন লিপ্যন্তর সম্পর্কিত বিতর্কের ঐতিহাসিক রূপরেখাটির ঝলকদর্শন পাওয়া যাবে; আবার তার ওপরে ভিত্তি করে ভবিষ্যতের বাংলা বানান কেমন হওয়া উচিত, সে সম্পর্কেও প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যাবে। তবে মনে রাখা দরকার, বাংলা বানান বিতর্কের ঐতিহাসিক তালিকা-নির্মাণ আমাদের বর্তমান অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য নয়। ফলে লিপ্যন্তর বিষয়ক নির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাবের ওপরেই আলোকপাত করা সম্ভব হবে।

অবশ্য এই বাছাই নিতান্ত আপতিকভাবে করা হয়নি। ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের প্রস্তাবের মধ্যে যাতে ভারসাম্য থাকে, সেদিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। সরকারি এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তাব হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির লিপ্যন্তর-বিষয়ক প্রস্তাব বিশদে আলোচনা করা হবে। ব্যক্তিগত প্রস্তাব হিসাবে আমরা বেছে নিয়েছি সুভাষ ভট্টাচার্যের *সংসদ বিদেশি নামের উচ্চারণ*।[৩] এর পাশাপাশি বিশ্বভারতীর বানানবিধির ওপরেও আলোকপাত করা হবে। তবে একই সঙ্গে স্বীকার্য, এই প্রতিষ্ঠানটি

---

[১] র‍্যাঁবো এবং হ্যাঁবোর মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য সে প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা হবে।

[২] পবিত্র সরকার মহাশয়ের লেখায় (সরকার ৯৫) transliteration-এর বাংলা হিসাবে 'লিপ্যনুবাদ' শব্দটিও পাওয়া গেছে। তবে সংক্ষিপ্ততা এবং ব্যাবহারিক সুবিধার দিকে নজর রেখে 'লিপ্যন্তর' শব্দটিই বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে।

[৩] লক্ষণীয়, বইয়ের নামকরণে *সংসদ* শব্দটি থাকলেও এই বইকে আমরা লেখকের লিপ্যন্তর-বিষয়ক ব্যক্তিগত প্রস্তাব হিসাবেই গ্রহণ করতে চাই। কারণ, *সাহিত্য সংসদ* প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থের বিদেশি নামের বানানে এই বইয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি। উচ্চারণের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে গিয়ে বানানের যে জটিল প্রস্তাব এই বইয়ে পেশ করা হয়েছে, তা সাধারণ্যে প্রচলিত হওয়া মুশকিল।

বিদেশি শব্দের বানানে খুব অভিনব কোনো প্রস্তাব সংযোজন করতে পারেনি। বিশেষত রবীন্দ্র-রচনার বাংলা বানান নির্ধারণেই তারা মনোযোগ দিয়েছে। অপরপক্ষে, বাংলাদেশের সর্বজনমান্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঢাকা বাংলা একাডেমির বানানবিধি পর্যালোচনা করা হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন সংবাদপত্রগোষ্ঠীও বানান নির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সমস্ত সংবাদপত্রের বানানবিধি লিখিত অবস্থায় সর্বসাধারণের জন্য প্রাপ্য নয়। সেক্ষেত্রে মুদ্রিত সংবাদপত্র থেকেই তাদের বানানের প্রবণতা আন্দাজ করে নিতে হয়। সংবাদপত্রের বানানের জন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গের আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠীর *বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন* বইটি বেছে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের প্রথম আলো সংবাদপত্রগোষ্ঠীর *প্রথম আলো ভাষারীতি* বইটি সম্পর্কেও আলোচনা করা হবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, বানান সংক্রান্ত প্রবন্ধে বানান ও লিপির গুরুত্ব সমধিক। আমরা জ্ঞানত কোনো উদ্ধৃতির বানান পরিবর্তন করিনি। কিন্তু নিতান্ত প্রযুক্তিগত বাধ্যতার কারণেই কিছু লিপিগত পরিবর্তন করতে হয়েছে। য-ফলা আ-কারের রূপটি কোনো বর্ণের সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট অবস্থায় লিখতে অপারগ হওয়ায় আমরা ক্ষেত্রবিশেষে বানান করে 'য-ফলা আ-কার' লিখেছি। পলাশ বরন পাল তাঁর বেশিরভাগ বই নিজের আবিষ্কৃত হরফে প্রকাশ করে থাকেন। তাঁর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার সময় আমরা হরফ অপরিবর্তিত রাখতে পারিনি। আর *সংসদ বিদেশি নামের উচ্চারণ* নামক বইটিতে বিশেষ কিছু বর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে। ফ এবং ভ-এর নীচে বিন্দুচিহ্ন, জ-এর নীচে বিন্দুচিহ্ন (জ়) এবং দ্বিবিন্দুচিহ্ন ইত্যাদি। আমাদের আলোচনার সময় উপযুক্ত বর্ণের অভাবে আমরা সাবস্ক্রিপ্ট ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি। যেমন, ফ$_১$ এবং ভ$_১$ লেখা থাকলে যথাক্রমে ফ এবং ভ-এর নীচে বিন্দুচিহ্ন বুঝতে হবে। একইভাবে, জ$_২$ বলতে জ-এর নীচে দ্বিবিন্দুচিহ্ন (ফরাসি j-এর উচ্চারণ) বুঝতে হবে। বিদেশি শব্দের বানান আমাদের মূল আলোচ্য হলেও কখনও কখনও একটি প্রতিষ্ঠানের বানাননীতির মূলগত প্রবণতাকে বোঝার তাগিদে অ-বিদেশি শব্দের বানান সম্পর্কেও আমরা অল্পবিস্তর আলোচনা করেছি।

২.২ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশি বাননীতি

ঐতিহাসিক কালক্রমকে মর্যাদা দিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু হবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধিকে কেন্দ্র করে। এই বানানবিধির (১৯৩৭) অ-সংস্কৃত শব্দের বানান সংক্রান্ত প্রথম নিয়মটিই হল – "রেফের পর ব্যঞ্জনবর্গের দ্বিত্ব হইবে না" (মজুমদার ১০২)।[৪] এই নিয়ম নিয়ে ২০১৮ সালে আর অবশ্য বিতর্কের বিশেষ অবকাশ নেই। ৪ সংখ্যক বিধিটি নিয়ে বরং কথা বলা যেতে পারে –

> শব্দের শেষে সাধারণতঃ হস্-চিহ্ন দেওয়া হইবে না ...কিন্তু যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হস্-চিহ্ন বিধেয়। ...যদি হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হয় তবে হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের পর হস্-চিহ্ন আবশ্যক, যথা – শাহ্, তখ্ত্, জেম্স্, বণ্ড্। (মজুমদার ১০২)

আলোচনার জন্য 'তখ্ত্' শব্দটিকেই বেছে নেওয়া যাক। শব্দের উচ্চারণ খুবই সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করছে এই বানান। কিন্তু ব্যাবহারিক দিক থেকে অস্বস্তির কারণ ঘটাচ্ছে হস্-চিহ্নের দু'বার ব্যবহার। এই বানান ব্যতিরেকে আর যে যে বানান হতে পারে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে –

১। **তখত্/তখৎ:**এক্ষেত্রে শব্দটির সঙ্গে পরিচিতি না থাকলে পাঠক ত-খত্ উচ্চারণ করবেন, এই আশঙ্কা থেকে যায়। লক্ষণীয়, ঠিক উচ্চারণের দলগঠন CVCC। দলের *কোডা* অংশে দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির সমাবেশ (তাদের

[৪] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির মুদ্রিত রূপ সুলভ না হওয়ায় আমাদের আলোচনায় পরেশচন্দ্র মজুমদারের গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত বানানবিধিটি ব্যবহার করা হয়েছে।

মধ্যে একটি আবার মহাপ্রাণ ধ্বনি /খ/) বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-প্রবণতার অনুগ নয়। পক্ষান্তরে, ভুল উচ্চারণ ত-খত্ দলগঠনের দিক থেকে বাংলা স্বাভাবিক উচ্চারণের প্রবণতাকে মান্য করে— CV-CVC। ফলে আলোচ্য বানান লিখলে মূল উচ্চারণ না-জানা আনকোরা পাঠকের পক্ষে ভুল উচ্চারণ করার সম্ভাবনা থেকে যায়।

২। **তখ্ত:** এই বানান অন্তত তিন রকমের উচ্চারণের জন্ম দিতে পারে – তখ্-তঅ, তখ্-তো এবং অভীপ্সিত ঠিক উচ্চারণ তখ্ত্। এক্ষেত্রেও প্রথম দুটি ভুল উচ্চারণের দলগঠন (CVC-CV) বাংলা স্বাভাবিক উচ্চারণ-প্রবণতার অনুগামী বলে ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থেকে যায়।

৩। **তখত:** লিপিগতভাবে সবচেয়ে সহজ। অথচ, বিভিন্ন রকমের ভুল উচ্চারণের জন্ম দিতে পারে এই বানান— ত-খত্ (CV-CVC), ত-খ-ত (CV-CV-CV), তখ্-ত (CVC- CV) ইত্যাদি।

উপরে আলোচিত তিনটি বানানের ক্ষেত্রেই দেখা গেল, ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা রয়েছে। তাহলে কি উচ্চারণ ভুলের আশঙ্কা একেবারে নিকেশ করে 'তখ্ত্' লেখাই বিধেয়? কিন্তু সেক্ষেত্রে আবার হস্-চিহ্নের বাহুল্য অস্বস্তি ঘটায়। বাংলা অভিধানগুলির দিকে নজর ফেরালে এই অস্বস্তির বিষয়টি যে কল্পিত নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। নীচে কয়েকটি মান্য অভিধানে এই শব্দটির বানান কীভাবে লেখা হচ্ছে, সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হল–

১। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এ এই শব্দটির সরাসরি ভুক্তি নেই। পরিবর্তে *তক্ত* শব্দটির ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ফারসি *তখ্ত্*-এর উল্লেখ আছে। *তখ্ত্-ই-রবান* বা তখ্ত্-ই-তাউস – এই দুটি শব্দকেও আলাদাভাবে ফারসি বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ১০১২)।

২। সংসদ বাংলা অভিধানে তিনটি শব্দের ভুক্তি এই ক্রমে পাই – তকত, তক্ত, তখত। স্পষ্টতই, হস্-চিহ্ন বর্জনের পক্ষে সংসদের রায় (বিশ্বাস ৩৬৩)।

৩। *বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান* জানাচ্ছে: " 'তখত', 'তখৎ' নয়"(ভট্টাচার্য, *সুভাষ, বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান* ১০২)।

৪। ঢাকার বাংলা একাডেমি প্রকাশিত *আধুনিক বাংলা অভিধান* মূল শব্দ হিসাবে বানান লিখছে: তখ্ত (*বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান* ৫৭৯)। অথচ, *তক্ত* শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্দেশের সময় ফারসি শব্দটির বানান লেখা হচ্ছে: তখত। মূল ফারসি শব্দের বানানেই যেখানে হস্-চিহ্ন ব্যবহার করা হচ্ছে না; সেখানে বাংলায় গৃহীত ফারসি শব্দের বানানে হস্-চিহ্ন বাহুল্য বলেই মনে হয়।

৫। কাজী রফিকুল হক সম্পাদিত *বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*-এ আলোচ্য শব্দের তিনটি বানান এই ক্রমে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে— তখত, তখৎ, তক্ত (হক ১৬৩)। যে অভিধান নিজের নামকরণে দীর্ঘ ঈ-কারের যথেচ্ছ ব্যবহার করছে (তারই সঙ্গে *ফার্সী* শব্দটির অপ্রয়োজনীয় হস্-চিহ্ন লক্ষণীয়); এমনকি সেই অভিধানও আলোচ্য শব্দটির ক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মেনে দুটি হস্-চিহ্ন ব্যবহারের পক্ষপাতী নয়।

৬। গোলাম মুরশিদ সম্পাদিত *বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান* শব্দটির *তখত* বানান লেখার পক্ষপাতী (মুরশিদ ১১৯৪)।

৭। রাজশেখর বসুর *চলন্তিকা*-য় আলোচ্য শব্দটি সরাসরি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে এর বাংলা রূপ *তক্ত*-এর ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের সময় অভিধানকার ফারসি *তখ্ৎ* বানান লিখছেন (বসু ২২৫)।

এই সাতটি অভিধানের মধ্যে কোনোটিই যে বাংলা বানানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কথিত হস্-দ্বিত্ব সমর্থন করছে না; বরং ক্ষেত্রবিশেষে বিরোধিতা করছে। এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত আপতিক নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বোক্ত নিয়মের (১৯৩৭) পর প্রায় পঁচাশি বছর সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। বর্তমানকালে যে *তখত*

বানানটিই অভিধান-সমর্থন পাচ্ছে; এর থেকে বোঝা যায়— ব্যাকরণই বানান নির্ণয়ের একমাত্র নির্ধারক উপাদান নয়। *তথ্যত* বানানের সপক্ষে কোনো ব্যাকরণগত বা ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তি নেই। নেহাত লিখন-সুবিধার কারণেই এই বানান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিকে অস্বীকার করে সমাজে মান্যতা পেল। উচ্চারণ ভুলের আশঙ্কা এখানে নাকচ হয়ে যায় সামাজিক প্রচলনের যুক্তিতে। কোনো নির্দিষ্ট শব্দের বানান-ব্যবহারকারীদের মধ্যে যদি ওই শব্দের উচ্চারণ যথেষ্ট প্রচলিত থাকে, তাহলে যথাযথ উচ্চারণ প্রকাশের অতিরিক্ত তাগিদে বানানকে জটিল না করাই শ্রেয়। *সংসদ বিদেশি নামের উচ্চারণ* গ্রন্থের বানানও এই ত্রুটি এড়িয়ে যেতে পারেনি। সেই প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচিত হবে।

আলোচ্য বানানবিধির আরেকটি বিতর্কিত ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল এর ১০ সংখ্যক নিয়ম— "বিদেশি শব্দের মূল উচ্চারণ অনুসারে s স্থানে স, sh স্থানে শ হইবে" (মজুমদার ১০৪)। এই নিয়ম যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। অনেকগুলি সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়—

১। বিদেশি শব্দের উচ্চারণে s কি সর্বদাই /স/ আর sh কি সর্বদাই /শ/ উচ্চারিত হয়?

২। 'মূল উচ্চারণ' বলতে কী বোঝানো হচ্ছে? কোনো একটি শব্দ যদি একাধিক ভাষায় থাকে এবং বিভিন্ন ভাষায় তাদের উচ্চারণ আলাদা হয়; সেক্ষেত্রে মূল উচ্চারণ বলতে কোন্ ভাষার উচ্চারণকে গ্রাহ্য করা হবে? যেমন ধরা যাক, restaurant শব্দটি লাতিন-মূল থেকে পুরোনো ফরাসি (old french) ভাষার মাধ্যমে আধুনিক ফরাসি ভাষার সূত্র ধরে ইংরেজিতে প্রবেশ করেছে।[৫] শেষ দুটি স্তরের কথাও যদি বিবেচনা করি, ফরাসি মতে রেস্তোরাঁ লেখা হবে নাকি ইংরেজি মতে রেস্টুরেন্ট; তার সুনির্দিষ্ট উত্তর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি থেকে পাওয়া যায় না। এমনকি, শব্দকে বাদ দিয়ে একটি স্বনিমকেও যদি বিবেচনা করা যায়, ভাষাভেদে তার উচ্চারণ পাল্টে যায়। এই /r/ -এর উচ্চারণ ইংরেজিতে প্রায় বাংলার /র/ এর মতো হলেও, ফরাসিতে তা অনেকটা /হ্র/ ধ্বনির মতো গলা থেকে উচ্চারিত/ কণ্ঠ্যনালীয় (guttural r) হয়। আবার ইতালীয় এবং এসপেরান্তো ভাষায় /র/ -এর উচ্চারণ অতিরিক্ত কম্পিত (trilled)।

৩। নিছক লোকপ্রচলিত অভ্যাস ব্যতিরেকে 'খ্রীষ্ট' বানানটিকে মান্যতা দেওয়ার আর কী বা অর্থ হয়?

লোকপ্রচলনের কাছে পরাজয় স্বীকার করার এবম্বিধ দৃষ্টান্ত অবশ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধিতে অপ্রতুল নয়। আলোচ্য বিধির অব্যবহিত আগেই ৯ সংখ্যক নিয়মে জানানো হয়েছে— "হসন্ত ধ্বনি হইলে বিকল্পে ং বা ঙ বিধেয়, যথা – রং, রঙ; সং, সঙ; বাংলা, বাঙলা" (মজুমদার ১০৪)। বিকল্পাত্মক উভয় বানানকেই যদি বিধেয় বলে মান্যতা দেওয়া হয়, তাহলে তো বানানবিধি প্রণয়নের আগে ও পরে বানান পরিস্থিতি একই থেকে যায়। সাহসিকতার অভাবে বিধি প্রণয়নের উদ্দেশ্যটিই ব্যর্থ হয়। ণ এবং ন সম্পর্কিত বিকল্পাত্মক বানানের ক্ষেত্রেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একই রকমের দ্বিধার পরিচয় দিয়েছে— "অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল ন হইবে ... কিন্তু যুক্তাক্ষর ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ চলিবে" (মজুমদার ১০৩)। পূর্বোক্ত বিধির ত্রিবিন্দুচিহ্নের আগে ও পরের বাক্যাংশ প্রায় পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দ্বিধাগ্রস্ততাকে ব্যঙ্গ করে সমীর সেনগুপ্ত একটি কাল্পনিক ট্রাফিক বিধি প্রণয়ন করেছিলেন –

> সব গাড়ি রাস্তার বাঁদিক ধরে যাবে; তবে বাঁদিকে যদি বেশি ভিড় বা খানাখন্দ থাকে, তাহলে প্রয়োজনবোধে ডানদিক দিয়েও যাওয়া যাবে। রাজনীতিক, পুলিশ, উচ্চপদস্থ সরকারি আমলা এবং মহামান্য বিচারকদের লাল বাতি জ্বালানো গাড়ি রাস্তার ডানদিক ধরে যেতে পারবে। সাধারণ আরোহীর খুব ব্যস্ততা থাকলে তিনিও ডানদিক

[৫] দ্র. https://www.etymonline.com/word/restaurant

দিয়ে যেতে পারবেন। তবে এই তালিকায় উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রে, কর্তব্যরত ট্রাফিক সার্জেন্টের লিখিত অনুমতি অবশ্যই নিতে হবে। (বি: দ্র: কর্তব্যরত ট্রাফিক সার্জেন্ট যদি কর্তব্যব্যপদেশে নিজের জায়গায় না থাকেন, তাহলে ট্রাফিক কনস্টেবলের অনুমতি নিলেই চলবে। ...) (সেনগুপ্ত এবং বসু ৪৭)

উদ্ধৃতি আর দীর্ঘ করার প্রয়োজন নেই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধিতে ব্যতিক্রম ও বিকল্প বানান বিষয়ে নমনীয় নীতি প্রসঙ্গে সুতীব্র ব্যঙ্গ এইটুকু থেকেই বোঝা যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, নির্দেশ মানেই তো শুধু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ নয়। ১৯৩৭ সালের নির্দেশ না-মানার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি থাকলেও, ১৯৯৭ সালেই প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি কেন পরিত্যাজ্য, সেই বিষয়ে লেখক একটি শব্দও ব্যয় করেননি।

পরস্পরবিরোধের এখানেই শেষ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ সংখ্যক নিয়মের উদাহরণ ব্যাখ্যা করতে 'ওঅর-বণ্ড' শব্দটিকে বিধেয় বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। আবার কিছু আগেই ৪ সংখ্যক নিয়মে হস্-চিহ্নের ব্যবহার বোঝাতে গিয়ে 'বণ্ড্' বানানকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

ভাষাতাত্ত্বিকভাবে ১৪ সংখ্যক নিয়মটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। বক্র আ বা বিকৃত এ (/æ/ ধ্বনি) বোঝাতে শব্দের আদিতে 'অ্যা' এবং শব্দমধ্যে য-ফলা আ-কার ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এই বিধি প্রায় সর্বজন-প্রচলিত হলেও অন্তত দু'জন ব্যতিক্রমী চিন্তক /æ/ ধ্বনি প্রকাশের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধির বিকল্প কোনো পথের সন্ধান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শব্দের আদিতে ব্যবহৃত এ-কারের মাত্রা বর্ধিত করে ব্যঞ্জন-সংশ্লিষ্ট /æ/ ধ্বনি প্রকাশের প্রচলন করেন। অদ্যাবধি, বিশ্বভারতী প্রকাশিত গ্রন্থাবলিতে এই বিধি পালিত হয়। এই রীতির সুবিধা হল অভীপ্সিত ধ্বনির সঙ্গে যে /আ/ ধ্বনি অপেক্ষা /এ/ ধ্বনির সম্পর্ক নিকটতর, তা এই বানান থেকে বোঝা যায়। /æ/ সম্মুখ নিম্নমধ্য স্বরস্বনিম। /এ/ সম্মুখ উচ্চমধ্য স্বরস্বনিম। অন্যদিকে, /আ/ কেন্দ্রীয় নিম্ন স্বরস্বনিম। ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে /æ/ ধ্বনির বানান /এ/ ধ্বনির কোনো রকমফের দ্বারাই নির্ধারিত হওয়া উচিত।[৬] ধ্বনিতাত্ত্বিক এই সমস্যার পাশাপাশি স্মর্তব্য, শব্দমধ্যে য-ফলা আ-কার ব্যবহারের এই নিয়ম কেবল বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে ব্যবহারের কথা বলা হচ্ছে। তৎসম শব্দের কথা যদি বাদও দেওয়া যায়, তদ্ভব শব্দের ক্ষেত্রে এই বানান লেখার স্বাধীনতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দিচ্ছে না। 'ম্যান' লেখা যাবে অথচ 'ধুলোখ্যালা' লেখা যাবে না— এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা কোথায়? তাহলে কি বিশ্বভারতীর নীতিই গ্রহণীয়? সেখানেও কিন্তু সমস্যার অবকাশ রয়েছে। বিশ্বভারতীর নীতির মূল সীমাবদ্ধতা হল, শব্দমধ্যে /এ/ এবং /æ/ ধ্বনির উচ্চারণের পার্থক্য এ-কারের বর্ধিত মাত্রা দ্বারা বোঝানো সম্ভব নয়।

আমাদের মতে, এই সমস্যার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সমাধান মেলে পলাশ বরন পালের নিজস্ব বানানবিধিতে।[৭] তিনি স্বনিম হিসাবে শব্দের শুরুতে /æ/-এর উচ্চারণ বোঝানোর জন্য 'পেট-কাটা এ' লিখে থাকেন। আর ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অবস্থায় /æ/-এর উচ্চারণ বোঝানোর জন্য এ-কারের মাঝখানে একটি অনুভূমিক দাগ দেওয়ার (পেট-কাটা এ-কার) পক্ষপাতী। এর ফলে শব্দমধ্যে /এ/ এবং /æ/ ধ্বনির উচ্চারণ নিয়ে বিভ্রান্তির কোনো অবকাশ থাকে না। একই সঙ্গে উল্লেখ্য, /এ/ ধ্বনির সঙ্গে /æ / ধ্বনির নিবিড় সম্পর্কের আভাসও এখানে রক্ষিত হয়েছে। যুক্তির দিক থেকে নিশ্ছিদ্র হওয়া সত্ত্বেও একক ব্যক্তির তৈরি বিধি বলেই বোধহয় এই 'পেট-কাটা এ-কার' লেখার প্রবণতা সমাজে এখনও মান্যতা পায়নি।

---

[৬] পরেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে এই যুক্তিটি সম্পর্কে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। (মজুমদার ২৪-২৫)

[৭] '... পেটকাটা 'এ' এখানে 'নিচু-এ' ধ্বনির জন্য বসেছে, পেটকাটা 'এ'-কার বসেছে ওই একই ধ্বনি ব্যঞ্জনের সাথে যখন আছে তখন।' (পাল ৯২)

২.৩ বিশ্বভারতীর বানানবিধি

বাংলা বানানবিধি নির্মাণের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি এবং তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলাম। এই বানানবিধি খুঁটিয়ে নজর করলে আরও কিছু অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তবে আলোচনা সংক্ষিপ্ত রাখার স্বার্থে আমরা কেবল মূলগত সমস্যাগুলির কথা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হলাম।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস হিসাবে এরপর আমরা বিশ্বভারতী প্রকাশিত *বানান ও বিন্যাস-বিধি* সম্পর্কে আলোচনা করব। ১৯ জুন, ২০১২ সালে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগে বাংলা বানান সম্পর্কিত একটি কর্মশালা আয়োজিত হয়। এই কর্মশালায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ১৪২২ বঙ্গাব্দে (২০১৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশিত হয়। এর প্রায় ২০ বছর আগেই (১৫ নভেম্বর, ১৯৯৫) প্রকাশিত হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানান সম্পর্কিত সুপারিশপত্র। তবু বর্তমান আলোচনায় কালানুক্রম লঙ্ঘন করে বিশ্বভারতীর বিধিই আগে আলোচনা করা হল। কারণ, আমাদের মতে, বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীর এই বিধি কিয়দংশে ভাষাতাত্ত্বিক রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছে। সেই হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধির পরেই এর আলোচনা হওয়া সংগত। ভাষাতাত্ত্বিকভাবে সর্বাধুনিক বিধি হিসাবে সর্বশেষে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বিধি আলোচিত হবে। বস্তুত প্রাতিষ্ঠানিক বানানবিধি হিসাবে বিশ্বভারতীর বিধিই আমাদের কাছে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয়েছে।

বিশ্বভারতী ব্যতিরেকে আর কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই কি কেবল একজন লেখকের জন্য একরকম বানান, অন্য লেখকদের জন্য অন্যরকম বানান— এবম্বিধ বিধি প্রণয়ন করেছে? আবার একজন লেখকের একটি বইয়ের ক্ষেত্রে একরকমের বানান মান্য, তাঁরই অন্য বইয়ের ক্ষেত্রে অন্যরকমের বানান মান্য— এরকম 'বিধি'র দৃষ্টান্তও এই পুস্তিকায় মেলে বই-কি! এই বিধির উদ্দেশ্যজ্ঞাপক দুটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা হল—

১। '...আধুনিকতার সঙ্গে প্রচলিত বিন্যাসের সম্ভাব্য বিরোধ বা অসামঞ্জস্য যথাসম্ভব পরিহার সম্পর্কেও সতর্কতা বাঞ্ছনীয়।'

২। '...রবীন্দ্ররচনার ক্রেতা ও গ্রাহকদের কাছে প্রজন্ম-পরিচিত রূপরীতির ক্ষেত্রে কোনো আকস্মিক অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন, প্রকাশনার পরম্পরায় যে ধারাবাহী প্রতিষ্ঠিত আদর্শ ও মান স্থাপনা করেছে, তার হেরফের, যাতে পাঠক-প্রকাশক সম্পর্কে কোনো দূরত্ব না তৈরি করে, সেদিকেও সাবধানতা অবলম্বনীয়' (*বানান ও বিন্যাস-বিধি* ৯)

কার্যক্ষেত্রে অবশ্য আমরা লক্ষ করি, পূর্বোক্ত দুটি উদ্দেশ্যের মধ্যে কখনও বিরোধ উপস্থিত হলে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটিই প্রাধান্য পাচ্ছে। এই বিধিতে বারবারই 'রবীন্দ্রনাথ-অনুমোদিত', 'কবি-কর্তৃক অনুমোদিত', 'রবীন্দ্রনাথ নির্দেশিত' ইত্যাদি শব্দবন্ধ ঘুরেফিরে আসবে। কয়েকটি মূলগত অসংগতির প্রসঙ্গ নীচে উল্লেখ করা হল—

১। 'সাধারণভাবে, অ-তৎসম শব্দে, প্রচলিত দেশজ ও বিদেশি, বা কৃতঋণ বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে, ঈ-কার ই-কারে ঊ-কার উ-কারে পরিবর্তিত হবে। ... কাহিনী অ-তৎসম হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থনাম এবং গ্রন্থমধ্যে অপরিবর্তিত। ...দেশি বিদেশি স্বদেশি চলবে। তবে, বিদেশিনী বানান অপরিবর্তিত থাকবে 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'-তে' (*বানান ও বিন্যাস-বিধি* ১৫)। স্বাভাবিকভাবেই, এই ব্যতিক্রমপ্রবণ বিধি পূর্বোক্ত সমীর সেনগুপ্তের মন্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই নিয়ম অনেকগুলি সংশয় উত্থাপন করে—

ক। কেন অ-তৎসম শব্দ হিসাবে 'কাহিনি' বানান গ্রহণযোগ্য নয়? গ্রন্থনামে বানান পরিবর্তন ঐতিহ্যের খাতিরে স্বীকৃত নাও হতে পারে। কিন্তু গ্রন্থমধ্যে 'কাহিনী' কেন লেখা হবে? এই ব্যতিক্রম-আকীর্ণ বিধি আরও একটু জটিল হয়ে যায়, যখন আমরা পুস্তিকার শেষে সংকলিত 'কিছু প্রশ্ন ও উত্তর' নামের অংশটির দিকে নজর

ফেরাই।[৮] সেখানে ঘোষিত বিধি এইরকম— 'কাহিনি। [কিন্তু *কথা ও কাহিনী, কাহিনী* রবীন্দ্র-গ্রন্থ নামে অপরিবর্তনীয়]'। রবীন্দ্রনাথ-লিখিত গ্রন্থনামে অপরিবর্তনীয়তার নির্দেশ ইঙ্গিত করে যে,'কাহিনী' বানান গ্রন্থমধ্যে পরিবর্তনীয় এবং রবীন্দ্রনাথ ব্যতিরেকে অন্যান্য লেখকদের ক্ষেত্রে গ্রন্থনামেও পরিবর্তনীয়। না-হলে এই 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ নামে' শব্দবন্ধটির ব্যবহার বাহুল্য হয়ে যায়। অথচ, অব্যবহিত আগের আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি, বিশ্বভারতীর বানানবিধির প্রথম বিধিতেই রয়েছে, কাহিনী 'গ্রন্থমধ্যে অপরিবর্তিত'। এই সংশয়ের মীমাংসা বিশ্বভারতীর বানান-পুস্তিকা থেকে পাওয়া যায় না।

খ। বিশ্বভারতী জানাচ্ছে, রবীন্দ্র-রচনাবলিতে 'বিদেশিনী' বানানই রাখা হবে। স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু সহজেই অনুমেয়, এই সংস্থা থেকেই প্রকাশিত অন্য লেখকদের বইয়ে কিন্তু 'বিদেশিনী' বানান রক্ষিতব্য নয়। লেখকের পরিচয় অনুযায়ী বানানবিধি পালটে যাওয়া কতদূর সংগত?

গ। রবীন্দ্রনাথের লেখায় কেবল 'বিদেশিনী' শব্দেই কি স্ত্রী-লিঙ্গার্থক -ইনী প্রত্যয় ব্যবহৃত হবে? অন্য স্ত্রী-লিঙ্গার্থক শব্দের ক্ষেত্রে -ইনী নাকি ইনি কোন্ প্রত্যয় ব্যবহৃত হবে, সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া নেই।

ঘ। আবলি অভিধান-স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' বানান কেন?

২। আমাদের মন্তব্যে খ-চিহ্নিত সংশয় আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিশ্বভারতীর বানানবিধির ৫ সংখ্যক নিয়ম দেখলে— 'রবীন্দ্রগ্রন্থে খৃষ্ট বানান রক্ষিত হবে, অন্যক্ষেত্রে খ্রিস্ট, খ্রিস্টাব্দ সিদ্ধ' (*বানান ও বিন্যাস-বিধি* ১৬)। লেখকের পরিচয় অনুযায়ী বানানবিধি বদলে যাওয়ার সেই দৃষ্টান্ত আরও একবার খুঁজে পাওয়া গেল।

৩। এর পরের ধাপে আমরা লক্ষ করব, এমনকি রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও একাধিক সংরূপের (genre) ক্ষেত্রে একাধিকরকম বানানের সুপারিশ করা হচ্ছে। যেমন ধরা যাক, একই শব্দের বানান কবিতায় ও গানে পালটে যাচ্ছে! ১০ সংখ্যক বিধিতে বলা হচ্ছে – 'গানে ঐ স্থানে ওই। কিন্তু কবিতায় 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে' সিদ্ধ'। অন্য রবীন্দ্র-কবিতার ক্ষেত্রেও ঐ কি বিধেয়, নাকি ওই; তা বলা হল না। যেমন, *খেয়া* কাব্যগ্রন্থের *শেষ খেয়া* কবিতায় 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ওই/ঐ ছায়া' কোন্ বানানে লেখা হবে? গল্প-উপন্যাস কিংবা নাটকের ক্ষেত্রেই বা কোন্ বানান লিখিতব্য?

৪। সংরূপগতভাবে বানানের অসংগতি দেখানোর পরে লক্ষণীয়, একই সংরূপের মধ্যেও এমনকি বিভিন্ন ছন্দ অনুসারে একই শব্দের একাধিক বানান সুপারিশ করা হচ্ছে! ১৬ সংখ্যক নিয়মে জানানো হচ্ছে— 'রবীন্দ্রকবিতায় সংস্কৃত মাত্রারীতির ছন্দে এস' জাগ' কর' ইত্যাদি শব্দে যেখানে ইলেক বা ঊর্ধ্ব কমা আছে ('এস' দানবীর দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা') সেখানে ঊর্ধ্বকমা সংস্কৃত ছন্দরীতির বাধ্যতাজনিত, সুতরাং অপরিবর্তিত থাকবে'। সংস্কৃত ছন্দের কারণে বাংলা বানান পরিবর্তিত হচ্ছে— এই যুক্তি বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়া মুশকিল। ছন্দশাস্ত্র ধ্বনির নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল। শেষপর্যন্ত, কানের সঙ্গে এর সম্পর্ক; চোখের তথা দৃশ্যমান লিপির সঙ্গে নয়। এটি রবীন্দ্রনাথের বদলে সত্যেন্দ্রনাথ বা অন্য কোনো কবির সংস্কৃত ছন্দনির্ভর কবিতার বানান হলে, তাঁদের জন্য বিশ্বভারতী এই পরিমাণে ব্যতিক্রমকে প্রশ্রয় দিত কি না সন্দেহ।

---

[৮] 'কর্মশালার পরে শ্রীঅরুণ দে কয়েকটি প্রশ্ন লিখিত আকারে পেশ করেন যার উত্তরগুলি প্রস্তুত করে দেন অধ্যাপক অরুণকুমার বসু। 'কিছু প্রশ্ন ও উত্তর' শিরোনামে তা প্রকাশ করা হল।' (*বানান ও বিন্যাস-বিধি* ৭)

৫। শব্দের শুরুতে এ-কারের বর্ধিত মাত্রা দিয়ে ব্যঞ্জনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট /æ/ উচ্চারণ বোঝানোর রীতি বিশ্বভারতীর বানানবিধির একটি মৌলিক লিপিকৌশলগত বৈশিষ্ট্য। এই প্রবণতার সমস্যা কোথায় তা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি।

৬। এই বানানবিধির ১৭ সংখ্যক নিয়মে বিদেশি শব্দের লিপ্যন্তর সম্পর্কিত প্রাথমিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে— 'বিদেশি শব্দের বানান যথাসম্ভব মূলানুগ হবে; প্রয়োজনে পাশে বন্ধনী-মধ্যে মূল শব্দটি ছাপা যেতে পারে'। এতই সংক্ষিপ্ত এই নির্দেশ, এর থেকে বানান সম্পর্কিত প্রায় কোনো ইঙ্গিতই পাওয়া যায় না। মূলানুগ মানে কী? বিশ্বভারতী কি ইংরেজি /f/-এর যথাযথ মূলানুগ উচ্চারণ বোঝাতে ফ্‌ লিখতে প্রস্তুত? কিংবা বুদ্ধদেব বসু যেমন ফরাসি /j/-এর উচ্চারণ বোঝানোর জন্য জ্‌ লিখতেন, পলাশ বরন পাল যেমন পূর্বোক্ত /j/-এর উচ্চারণ বোঝানোর জন্য ঝ্‌ লিখে থাকেন; বিশ্বভারতী কি 'যথাসম্ভব মূলানুগ' হতে গিয়ে এইসব বিশেষ বর্ণ ব্যবহার করতে রাজি আছে? একটি শব্দ যখন একাধিক ভাষার পথ পরিক্রমা করে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে, তখন তার 'মূল' উচ্চারণ নির্ণয় করাও কিছু মুশকিল হয়ে পড়ে। বর্তমান নিবন্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'রেস্তোরাঁ' শব্দটির মূল উচ্চারণ প্রসঙ্গে বিতর্কের উল্লেখ করা হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, বিশ্বভারতীর বানানবিধিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির মতোই কিয়দংশে রক্ষণশীলতার পথে হেঁটেছে। উভয় বানানবিধির মূল সমস্যা: অজস্র ব্যতিক্রমকে স্বীকৃতি দেওয়া। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে লোকপ্রচলিত অভ্যাসকে লঙ্ঘন করতে পারেনি, বিশ্বভারতীও রাবীন্দ্রিক বানানের বেড়াজালে আবদ্ধ। বিশ্বভারতীর ক্ষেত্রে আবার অতিরিক্ত সমস্যা, লেখকের পরিচয়, সাহিত্যের সংরূপ এবং ছন্দ অনুযায়ী বানান পালটে যাওয়ার প্রবণতা। শেষপর্যন্ত উল্লেখ্য, এই রক্ষণশীলতার সমস্যা সম্পর্কে বিশ্বভারতীর বানানবিধি প্রণেতারা যে অসচেতন, তা কিন্তু নয়—

> সর্বাত্মক বানান-সংস্কারের মধ্যবর্তী পর্বে একাধিক ক্ষেত্রে এই আপোষমূলক মানরক্ষার প্রয়োজনীয়তা বহু আলোচনা ও মতামত-বিনিময়ের ফলে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে (*বানান ও বিন্যাস-বিধি* ১৬)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের পর প্রায় আশি বছর অতিক্রান্ত। এই মধ্যবর্তী-পর্ব আর কতদিন দীর্ঘস্থায়ী হয়, তা এখনও অনির্দিষ্ট রয়ে গেছে।

২.৪ আকাদেমি এবং একাডেমি

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক বানাননীতির সর্বাধুনিক রূপ পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধিতে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বানান সংক্রান্ত একটি ভিত্তিপত্র প্রকাশ করে। এই ভিত্তিপত্র কিছুটা সংশোধন করে ১৯৯৫ সালের ১৫ নভেম্বর প্রকাশিত হয় *বাংলা বানানের সমতাবিধান এবং লিখনরীতি ও লিপির সরলীকরণ* নামাঙ্কিত সুপারিশপত্র। এরপর ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ সালে আকাদেমির উদ্যোগে বানান ও লিপি বিষয়ক একটি আলোচনাসভা আয়োজিত হয়। এই আলোচনাসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কিছু পরিমার্জনের পর আকাদেমির তরফে *বাংলা বানানবিধি* নামক পুস্তিকা প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে। বাংলা বানান সংস্কারের সুদীর্ঘ ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছেন ড. মিতালী ভট্টাচার্য তাঁর *বাংলা বানানচিন্তার বিবর্তন* নামক বইতে (ভট্টাচার্য, মিতালী ২০২)। আকাদেমির বানানবিধি ১৯৯৭ সালের পরেও ক্রমশ পরিমার্জিত হয়েছে। সেই পরিবর্তনের কালানুক্রমিক ইতিহাস আমাদের বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্বভারতীর বানানবিধির তুলনায় আকাদেমির বানানবিধির মূলগত প্রবণতা কীভাবে আলাদা হয়ে গেল, তা আমরা পূর্বোক্ত সুপারিশপত্রের ভিত্তিতে আলোচনা করা হবে।

প্রথমেই নজরে পড়ে, এই সুপারিশপত্রকে সাজানো হয়েছে আলাদা তিনটি অংশে— লিপিবিষয়ক প্রস্তাব, বানানবিষয়ক প্রস্তাব এবং লিখনরীতিবিষয়ক প্রস্তাব। এর আগের দুটি বানানবিধিতেই কিন্তু লিপি সংক্রান্ত প্রস্তাব কিঞ্চিৎ উপেক্ষিত হয়েছিল। বিধি প্রণেতাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মান্য বানান নির্ধারণ। যুগোপযোগী লিপি নির্মাণে তাঁরা ততটা ভাবিত ছিলেন না। /ae/ ধ্বনি বোঝাতে আকাদেমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই 'অ্যা'লেখার পক্ষপাতী।[৯] এই স্বরস্বনিমের চিহ্ন হিসাবে য-ফলা আ-কার ব্যবহারের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তি থাকা সত্ত্বেও সম্ভবত প্রচলন-সিদ্ধতার কথা মাথায় রেখেই 'এ্যা' লেখার প্রস্তাব আকাদেমির কাছে মান্যতা পায়নি।

২.৪০ সংখ্যক সুপারিশে বলা হচ্ছে: "তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ৎ বর্ণটি অপরিহার্য"। কেন অপরিহার্য, তার সপক্ষে কিন্তু কোনো যুক্তি দেওয়া হচ্ছে না। নাগরী লিপিতে ৎ ছিল না। তাহলে বঙ্গাক্ষরে লিখিত সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রে ৎ থাকার প্রয়োজনীয়তা কী? বরং 'ত্' বর্ণটি ব্যবহার করলেই তা নাগরী লিপির অধিকতর নিকটবর্তী হত। অবশ্য এইটুকু রক্ষণশীলতার কথা বাদ দিলে, ত/ৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আকাদেমির সুপারিশপত্র যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে নিঃসন্দেহে। যেমন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বোক্ত ১৯৩৭ সালের বানানবিধির ১০ সংখ্যক নিয়মে বিদেশি শব্দ হওয়া সত্ত্বেও 'শরবৎ' লেখার নির্দেশ দিয়েছে। পক্ষান্তরে, আকাদেমি ২.৪০ সংখ্যক সুপারিশে 'শরবত' লেখার প্রস্তাব দিচ্ছে।

এমন কিছু অ-তৎসম শব্দ রয়েছে, যাদের দৃশ্যগতভাবে সমতুল্য তৎসম শব্দের উচ্চারণ এবং অর্থ আলাদা। যেমন, তাত (<তপ্ত, হসন্ত উচ্চারণ) এবং তাত (খুল্ল –); সংগত (<সংগতি, তবলার –, হসন্ত উচ্চারণ) এবং সংগত (মানানসই/উচিত অর্থে ব্যবহৃত)। এইসব ক্ষেত্রে অর্থবিভ্রাটের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আকাদেমি উভয় শব্দের ক্ষেত্রেই ত-বর্ণ ব্যহারের নির্দেশ দিচ্ছে। ব্যতিক্রমীভাবে কেবল দু'ধরনের অ-তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ৎ ব্যবহারের সুপারিশ করা হচ্ছে—

১। আকাদেমির মতে ধন্যাত্মক শব্দে ৎ ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, পৎপৎ, কপাৎ, কিৎকিৎ ইত্যাদি।

২। কয়েকটি বিদেশি শব্দেও ৎ ব্যবহারকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে। যেমন, জুজুৎসু, নাৎসি, পিৎসিকাতো, মিৎসুবিশি (সুপারিশ ২.৪১ এবং ২.৪২ দ্রষ্টব্য)।

উচ্চারণ বোঝানোর আত্যন্তিক তাগিদ থেকে ধ্বন্যাত্মক শব্দে ৎ ব্যবহারের নির্দেশ, তা বোঝা যায়। কিন্তু বিদেশি শব্দে ত-বর্ণ ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও হঠাৎ চারটি ব্যতিক্রমের উল্লেখ করার সার্থকতা কী? আকাদেমি এর কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি। আমরা এর কারণ অনুমান করার চেষ্টা করছি মাত্র। লক্ষণীয়, চারটি ব্যতিক্রমী শব্দের কোনোটিই ইংরেজি নয়। জুজুৎসু এবং মিৎসুবিশি জাপানি শব্দ। নাৎসি জার্মান শব্দ। পিৎসিকাতো ইতালীয় শব্দ। চারটি শব্দই গড়পরতা বাঙালির কাছে ইংরেজি অপেক্ষা অপরিচিত। তাই হয়তো উচ্চারণ ভুলের সম্ভাবনা একেবারে নিকেশ করতে ব্যতিক্রমীভাবে ৎ ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপের আরও কিছু নিদর্শন এই সুপারিশপত্রে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। ১০ সংখ্যক নিয়মে 'অতৎসম শব্দে ঈ-কারকে যথাসম্ভব বর্জন করাই সংগত' ঘোষণার পরেও প্রচলনের কারণে চীনা, নীলা, হীরে ইত্যাদি বানানকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। এই সুপারিশপত্রের পরবর্তী সংস্করণগুলিতে অবশ্য আকাদেমি এই দ্বিধা কাটিয়ে উঠে ব্যতিক্রমের তালিকা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করবে। ই এবং ন ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কলিকাতা

---

[৯] (সম্পাদক বা লেখকের নাম অনুল্লিখিত): *বাংলা বানানের সমতাবিধান এবং লিখনরীতি ও লিপির সরলীকরণ*। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি: কলকাতা। প্রথম প্রকাশ: ১৫ নভেম্বর, ১৯৯৫। সুপারিশ ১.৪০ থেকে ১.৪৪ দ্রষ্টব্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিতে যতটুকু দ্বিধা ছিল, আকাদেমির সুপারিশে তা কাটিয়ে ওঠা গেছে। বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে ণত্ব এবং ষত্ব বিধান কার্যকর হবে না; আর এক্ষেত্রে সর্বত্র ই ব্যবহার করতেও কোনো দ্বিধা নেই।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধির সঙ্গে প্রভূত সাদৃশ্য রয়েছে ঢাকার বাংলা একাডেমি নির্দেশিত বানানবিধির। আলাদাভাবে সেই বানানবিধি সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব না। তবে অন্তত দুটি অসংগতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে—

১। 'হস্-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে' বলে জানাচ্ছে ঢাকার একাডেমি। ধ্বন্যাত্মক শব্দেও হস্-চিহ্নের ব্যবহার সাধারণত করা হচ্ছে না। যেমন, কলকল, ঝরঝর, ফটফট ইত্যাদি। কিন্তু আবারও ভুল উচ্চারণের আশঙ্কায় কিছু ব্যতিক্রমকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে। যেমন, উহ্, বাহ্, যাহ্ *(বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* ২২)। উহো, আহো, যাহো উচ্চারণের কোনো বাংলা শব্দ হয় না। তাই ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা এখানে নিতান্ত কম। তার থেকে বরং অনেক বেশি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা ছিল হসন্ত-প্রবণ সংগত বা তাত উচ্চারণের ক্ষেত্রে। কারণ, সেক্ষেত্রে একই বানানের ভিন্নার্থক ও-কারান্ত উচ্চারণের শব্দ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি তা সত্ত্বেও যদি ওইসব শব্দের ক্ষেত্রে হস্-চিহ্ন ব্যবহার উপেক্ষা করতে পারে; ঢাকার বাংলা একাডেমিও এই তিনটে ব্যতিক্রম অন্তর্ভুক্ত না করলেই ভালো হত।

২। ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি বিদেশি শব্দে বিকল্পে য-বর্ণ ব্যবহারকে মান্যতা দিচ্ছে একাডেমি। যেমন, আযান, ওযু, নামায, রমযান ইত্যাদি। ধর্মের ভিত্তিতে শব্দের বানান পালটানোর প্রস্তাব কতদূর সংগত তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা যায়[১০] (*বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* ২০)।

সামগ্রিকভাবে বাংলা একাডেমির বানানবিধিতে অল্পবিস্তর সংশোধনের সুযোগ থাকলেও আধুনিক যুগের সাপেক্ষে ব্যবহার্য বানানবিধি হিসাবে এর গ্রহণযোগ্যতা স্বীকার্য।

২.৫ *আনন্দবাজার পত্রিকা*-তে বিদেশি বানান

ভাষার মান্যায়ন বা প্রমিতকরণ নামক প্রক্রিয়াটি কেবল সরকারি তথা রাষ্ট্রিক পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান দ্বারাই যে নিয়ন্ত্রিত হয়, এমন নয়। ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও মান্যায়নকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে পারে। যেমন, গণতন্ত্রে সংবাদপত্রের গুরুত্ব প্রশ্নাতীত। লক্ষ লক্ষ পাঠক প্রত্যেকদিন সকালে সংবাদপত্রের বানান চোখের সামনে দেখেন। প্রভাবিত হন সেই বানান দ্বারা। প্রচার-সংখ্যার নিরিখে সীমান্তের এপার-ওপার থেকে দুটি সংবাদপত্র আমরা বানান বিষয়ক আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছি। *আনন্দবাজার*

---

[১০] ক্রিয়াপদের বানানের ক্ষেত্রেও একাডেমি কখনও কখনও এইরকম ব্যতিক্রমকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। ৫.১০ সংখ্যক নিয়মে হ ধাতুর ক্ষেত্রে বানান প্রস্তাব করা হচ্ছে 'হলো'। অথচ, ৫.২ সংখ্যক নিয়মে কর্ ধাতুর ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বানান 'করল'। আরও দেখানো যায় – কাট্ ধাতুর ক্ষেত্রে 'কাটল' (নিয়ম ৫.৩), কিন্তু খা ধাতুর ক্ষেত্রে 'খেলো' (নিয়ম ৫.৪), দি ধাতু ক্ষেত্রে 'দিলো' (নিয়ম ৫.৫), দৌড়া ধাতুর ক্ষেত্রে 'দৌড়াল' (নিয়ম ৫.৬) ইত্যাদি। অনুমান করা যায়, যেখানে একই বানানের অন্য কোনো শব্দ রয়েছে (খেল=খ্যাল, দিল=হৃদয়, হল= লাঙল ইত্যাদি), সেইসব ক্ষেত্রে ক্রিয়ারূপে ও-কার ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে, আমাদের মতে, এই পরিমাণে ব্যতিক্রমকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রবণতা বিধি তৈরির উদ্দেশ্যকেই নষ্ট করে। কোনো একটি বাক্যে ব্যবহৃত 'হল' বানান 'হইল' বোঝাচ্ছে নাকি 'লাঙল'; তা নিয়ে সত্যিই কখনও বিভ্রান্তি তৈরি হবে বলে মনে হয় না। সেইরকম বিরল কোনো পরিস্থিতির আশঙ্কায় অকারণ মান্য বানানবিধিকে জটিল না করাই শ্রেয়।

পত্রিকা এবং *প্রথম আলো*। বস্তুত, 'সংবাদপত্র' শব্দটি ব্যবহার করলেও দুটিই আসলে বৃহৎ সংবাদপত্র-গোষ্ঠী। আমাদের জ্ঞানমতে, বাংলা ভাষায় কেবল এই দুটি সংবাদপত্র-গোষ্ঠীরই নিজস্ব বানানবিধি লিখিত পুস্তকরূপে পাওয়া যায়।

প্রথমে বলা যাক *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র বানানবিধির কথা। এক্ষেত্রে আমাদের মূল অবলম্বন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত *বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন* এবং সুভাষ ভট্টাচার্য লিখিত *বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান* নামক বইদুটি। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, সংবাদপত্রের বানান নির্ধারিত হয় তাৎক্ষণিকতার ভিত্তিতে। দ্রুত এবং নির্ভুল সংবাদ পরিবেশনই সেখানে মূল লক্ষ্য। অভিধানের চেয়েও কার্যকালে বানান নির্ধারণে সাংবাদিকের বড়ো সহায় হয়ে ওঠেন অভিজ্ঞ সহকর্মীরা। বানানবিধির সংস্করণ হতে বছরের পর বছর সময় লেগে যায়। সংবাদপত্রের বানান কিন্তু তার থেকে অনেক দ্রুতগতিতে পালটে যায়। ফলে এই দুটি বইয়ের সঙ্গে ২০১৮ সালের *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র বানান হুবহু না মেলাই স্বাভাবিক। তারই সঙ্গে উল্লেখ্য, একটি সংবাদপত্রগোষ্ঠীর মালিকানাভুক্ত বিভিন্ন প্রকাশনীর মধ্যেও বানানের অল্পবিস্তর ফারাক লক্ষ করা যায়। যেমন, আলোচ্য সংবাদপত্রগোষ্ঠীর অন্তর্গত *দেশ* পত্রিকা আর *এবেলা* সংবাদপত্র একই বানানবিধি অনুসরণ করে না। সংবাদপত্রের সাধারণ পাঠককুল, সংবাদ শিরোনামের দৃষ্টিগত নান্দনিকতা ইত্যাদি কারণেই বোধহয় *এবেলা* সংবাদপত্র z-এর উচ্চারণ বোঝাতে জ় বর্ণটি প্রায় ব্যবহার করে না। অন্যদিকে বিদগ্ধসমাজ যার উদ্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠী, সেই *দেশ* পত্রিকা যে অত্যন্ত নিষ্ঠভাবে জ়-বর্ণটি ব্যবহার করবে, সেটাই প্রত্যাশিত। এছাড়াও অ-বাংলা শব্দের ক্ষেত্রে *আনন্দবাজার* গোষ্ঠীর যে-সব মৌলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, তা নীচে উল্লেখ করা হল—

১। অ-বাংলা উত্তর ভারতীয় স্থান নাম ও ব্যক্তি নামের ক্ষেত্রে নাগরী লিপিতে সেইসব নাম যেভাবে লিখিত হয়, তদনুযায়ী বাংলা অক্ষরে লিপ্যন্তর করা হবে।

২। দক্ষিণ ভারতীয় নামের ক্ষেত্রে লিপ্যন্তরের প্রস্তাবটি কিঞ্চিৎ মজাদার— "সে-ক্ষেত্রে সমস্যার নিরাকরণের জন্য দক্ষিণ-ভারতীয় সহকর্মীদের সাহায্য গ্রহণ সংগত হবে" (চক্রবর্তী ১৯)।

৩। ভারতীয় নানা প্রতিষ্ঠানের নাম বাংলা লিপিতে পাওয়া না গেলে নাগরী লিপিতে লভ্য বানান অনুযায়ী বাংলায় লিপ্যন্তর করা হবে।

৪। চিনা নামের লিপ্যন্তরের ক্ষেত্রে পাইনিয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে (চক্রবর্তী ১০৮)।

বস্তুতই উপর্যুক্ত চারটি বিধির প্রথম দুটি নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। নাগরী লিপির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পক্ষপাত দর্শাতে গিয়ে বাংলা লিপির নিজস্ব ধর্ম ক্ষুণ্ণ করা কতদূর সংগত? যেমন ধরা যাক, *আনন্দবাজার*-কর্তৃপক্ষ লিখে থাকেন গাঁধী। কিন্তু নাগরী লিপিতে বিন্দুচিহ্ন আর বাংলায় চন্দ্রবিন্দু তো সর্বদা সমান নয়। নাগরীতে স্পর্শবর্ণগুলির পঞ্চম বর্ণের যে কোনো একটিকে বোঝাতে পারে বিন্দুচিহ্ন। তার পরিবেশ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে কোন্ বর্ণটিকে বোঝানো হচ্ছে। নাগরী লিপিতে ত-বর্গের অন্তর্গত ধ-এর মাথায় বিন্দুচিহ্ন ব্যবহার করলে বাংলা লিপ্যন্তরের সময় বিন্দুচিহ্নের জায়গায় ত-বর্গের অন্তিম বর্ণ ন-এর ব্যবহার হওয়াই স্বাভাবিক। গাঁধী বা মাঁকড় গোত্রের বানান (গান্ধী বা মানকড়ের বদলে) অতিরিক্ত নাগরী নির্ভরতার শোচনীয় পরিণাম।[১১]

স্থাননামের ক্ষেত্রেও নাগরী অনুযায়ী 'বিশুদ্ধ' বানান লেখার প্রবণতা বাঙালির স্বাভাবিক উচ্চারণ প্রবৃত্তির বিপরীত এক যাত্রা শুরু করেছে। যেমন, গ্বালিয়র বানানটি হয়তো নাগরী লিপির সাপেক্ষে 'বিশুদ্ধ' হল, কিন্তু এর

---

[১১] সরকার, পবিত্র: *তবে তো শশীবাবুতেও ই-কার দেওয়া দরকার*। *আনন্দবাজার পত্রিকা*। ২২ এপ্রিল, ২০১৭। https://www.google.co.in/amp/s/www.anandabazar.com/amp/editorial/bengali-spelling-now-and-then-1.601198

উচ্চারণ কীরকম? শব্দের শুরুতে ব-ফলা বাঙালি জিহ্বা উচ্চারণ করতে অভ্যস্ত নয়। যেমন, স্বরবর্ণ, ত্বরান্বিত। তাহলে গ্বালিয়রের স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণ /galiɔr/বদলে চেনা উচ্চারণ-দ্যোতক বানান গোয়ালিয়র রাখাই সংগত মনে বলে মনে হয়। অধ্যাপক পবিত্র সরকার জানাচ্ছেন, আনন্দবাজার-ব্যবহৃত অজিণ্ঠা বা পটনাও বাঙালির দীর্ঘকালের উচ্চারণ অভ্যাসের সঙ্গে মানানসই নয় (৩৩ সংখ্যক তথ্যসূত্র)। তার বদলে অজন্তা বা পাটনা বানানগুলিকে বাংলা শব্দ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

২.৬ *প্রথম আলো* সংবাদপত্রগোষ্ঠীর বিদেশি বানাননীতি

বাংলাদেশের *প্রথম আলো* সংবাদপত্রগোষ্ঠীর বানাননীতি অবশ্য *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র মতো এতটা নাগরী-নির্ভরতা দেখায়নি। বরং বানাননীতির দিক থেকে ঢাকার বাংলা একাডেমির সঙ্গে তাদের নৈকট্য বেশি। মূল বানান-প্রবণতা হরেদরে এক হলেও *প্রথম আলো*-র স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি কেবল নীচে উল্লেখ করা হল—

১। 'বিদেশি শব্দে বা নামে যুক্তাক্ষর যথাসম্ভব ভেঙে লেখার চেষ্টা করতে হবে। তবে লক্ষ রাখতে হবে, তা যেন দৃষ্টিকটু না হয়' (*প্রথম আলো ভাষারীতি* ১৬)। দৃষ্টিগত নান্দনিকতা কোনো ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ধারণা নয়। বানানবিধিতে এরকম বিমূর্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি না হওয়াই শ্রেয় বলে আমাদের মনে হয়। *প্রথম আলো*-র কাছে 'পেনশন' গ্রহণযোগ্য, অথচ 'লনডন' গ্রহণযোগ্য নয়। এই দৃষ্টি-নান্দনিকতার ধারণা নিতান্ত আপতিক এবং তা শেষপর্যন্ত বানানবিধিকে অস্পষ্ট করে তোলে মাত্র।

২। আর্টিক্যাল হিসাবে ব্যবহৃত হলে a-কে 'আ' লেখা হবে। এই বক্তব্যটি নিঃসন্দেহে অভিনব। আর কোনো বানানবিধিতেই আমরা a-এর মান্য উচ্চারণ অন্তর্ভুক্ত হতে দেখিনি। অথচ, ইংরেজি থেকে লিপ্যন্তরের সময় এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

৩। ইংরেজি বানানে যেখানে শব্দান্তে cs রয়েছে, সেখানে বাংলায় 'কস'; আর যেখানে x রয়েছে সেখানে 'ক্স' লিখতে হবে। যেমন, ইলেকট্রনিকস; কিন্তু সিক্স (*প্রথম আলো ভাষারীতি* ১৭)। বাংলায় বিদেশি শব্দ লেখার সময় মূল উচ্চারণের ভিত্তিতে যথাসম্ভব কাছাকাছি বানান লেখা হয়। অর্থাৎ, পদ্ধতিটি ধ্বনিগত। দৃশ্যগত নয়। ধ্বনিকে উপেক্ষা করে রোমক লিপি থেকে বঙ্গাক্ষরে লিপ্যন্তরের নিয়ম বানিয়ে জটিলতা বৃদ্ধির কোনো প্রয়োজন নেই।

দেখা যাচ্ছে, *প্রথম আলো*-র বানানরীতি খুব বেশি উচ্চাশী নয়। লোকসমাজের অভ্যাসের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েই তাঁরা এগোতে চান। ফলে খুব বেশি মৌলিক কোনো প্রস্তাব এই বিধিতে সংযোজন করা হয়নি।

২.৭ সাহিত্য সংসদের বিদেশি বানাননীতি

অ-সরকারি সংস্থাগুলির মধ্যে সর্বশেষে আমরা যে সংস্থার কথা আলোচনা করব, সেটি অবশ্য কোনো সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান নয়। নিছকই একটি প্রকাশনী সংস্থা। কিন্তু মান্য অভিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁদের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত *সংসদ বিদেশি নামের উচ্চারণ* অবশ্য ভবিষ্যতে ততটা মান্যতা পাবে কি না সন্দেহ রয়েছে। সংক্ষেপে এই বইয়ের বানাননীতির ওপর আলোকপাত করা হল –

১। লাতিন f এবং v-এর উচ্চারণ বোঝানোর জন্য যথাক্রমে ফ় এবং ভ় লেখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ফরাসি, ইতালীয়, স্পেনীয় ভাষায় ব্যবহৃত f এবং v-এর জন্যও একই নিয়ম প্রযোজ্য। আমাদের মতে, উচ্চারণের যাথার্থ্যের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে গিয়ে নতুন বর্ণের সমাবেশ এত সহজে সাধারণ্যে মান্যতা পাবে না। এসব ক্ষেত্রে আপসরফা করে ফ এবং ভ লেখাই সংগত ছিল। এত পরিশ্রমের পরেও কিন্তু বিদেশি উচ্চারণ

কখনোই বাংলা লিপিতে যথাযথভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি স্বনিমের অসংখ্য মুক্ত বৈচিত্র্য (free variation) লিপির মাধ্যমে প্রকাশ করা কার্যত অসম্ভব।

২। ইতোপূর্বে আমরা দেখিয়েছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধিতে হস্-চিহ্ন ব্যবহারের অতিরিক্ত প্রবণতা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এবং ঢাকার বাংলা একাডেমির বানানবিধিতে অনেকাংশেই কমে এসেছিল। উচ্চারণের দিকে অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়ার ফলে অতিরিক্ত হস্-চিহ্নের প্রকোপ আবার ফিরে এল আলোচ্য বইটিতে। শুধুমাত্র ফরাসি উচ্চারণের ক্ষেত্রেই দেখছি হস্-চিহ্নের অত্যধিক বাহুল্য। যেমন, ভি্ল্ (ville), জ়িদ্ (Gide), লাফ্র্গ্ (Laforgue) ইত্যাদি। অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা লক্ষণীয়।

৩। এত জটিলতা মেনে বানান লেখা প্রায় অসম্ভব। এমনকি স্বয়ং অভিধানকারের পক্ষেও তা সহজ কাজ নয়! সেই আত্যন্তিক পরিশ্রমজনিত জটিলতার দুয়েকটি নিদর্শন এরপর আমরা উল্লেখ করব। *একত্রিশ* পাতায় Freud বানান লেখা হচ্ছে ফ্রয়ড্। একই শব্দ যখন অভিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল, তখন ফ-এর জায়গায় চলে এল ফ্র আর হস্-চিহ্ন লুপ্ত হল। লেখা হল: ফ্রয়ড (ভট্টাচার্য, সুভাষ, *সংসদ বিদেশি নামের উচ্চারণ* ৬৩)। বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক Jean-Luc Godard-এর নামের বানান আলোচ্য বইটি বলছে জাঁ-লুক গদার। আবার সুভাষ ভট্টাচার্য লিখিত *বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান* মতে Jean Arthur Rimbaud-এর প্রথম নামের বানান: ঝাঁ (ভট্টাচার্য, সুভাষ, *বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান* ১৬৪)। *সংসদ বিদেশি নামের অভিধান* জার্মান শব্দ Donner-এর লিপ্যন্তর করছে ডন্ন্যর্ অথবা ডন্নর! হরফের এই জটিলতা জনসমাজে প্রচলন ঘটানোর ক্ষেত্রে খুব বাস্তব-সংগত নয়।

সংসদ বিদেশি নামের উচ্চারণ লেখকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও বহুভাষিক মেধার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু বাস্তবে ব্যবহার্য[১২] হিসাবে এইসব বানানের গ্রহণযোগ্যতা কম।

২.৮ সিদ্ধান্ত

এতক্ষণ পর্যন্ত বিদেশি শব্দের বানান সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নীতি আলোচনা করার পর আমাদের মূল সিদ্ধান্তগুলি নীচে লিপিবদ্ধ করা হল—

১। অ-ভারতীয় শব্দের ক্ষেত্রে লিপ্যন্তরের প্রবণতা ত্যাগ করে ধ্বনিগত রূপান্তর করাই শ্রেয়।

২। মূলানুগ উচ্চারণের দিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে বাংলার স্বাভাবিক লিখনরীতিকে ব্যাহত করা চলবে না। মূল উচ্চারণ বোঝানোর তাগিদে বাংলা লিপিতে অতিরিক্ত কোনো বর্ণের আমদানি করাও কাম্য নয়।

৩। বিদেশি শব্দের লিখনরীতির ক্ষেত্রে যুক্তাক্ষরকে বর্জন করা সম্ভব নয়। তবে যুক্তাক্ষর ব্যবহারের সময় তা যেন বাংলা উচ্চারণের দলবিভাগের সঙ্গে মানানসই হয় (বর্তমান নিবন্ধের দ্বিতীয় অংশ দ্রষ্টব্য), সেদিকে নজর রাখতে হবে।

৪। যে সব অ-ইংরেজি ভাষার শব্দের বিকৃত রূপ ইংরেজির মাধ্যমে বাঙালি প্রথমে চিনেছে, তাদের বিকৃত রূপটিকেই প্রচলনের খাতিরে মান্যতা দেওয়া যেতে পারে। যেমন, অ্যারিস্টটল, বুলেভার্ড ইত্যাদি।

৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ বিশ্বভারতীয় রক্ষণশীলতা কিংবা সাহিত্য সংসদ/ আনন্দবাজারীয় নিরীক্ষা-প্রবণতা – কোনোটাই কাম্য নয়। বানানের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থাই শ্রেয়।

---

[১২] বাস্তবে ব্যবহার্য বিদেশি শব্দের বানাননীতির জন্য দ্রষ্টব্য – (সরকার ৯৪-১১০)

আমাদের আলোচনা শুরু হয়েছিল একজন ফরাসি কবির নামের বানানকে কেন্দ্র করে। এতক্ষণ পর্যন্ত নানা বানানবিধি পর্যালোচনার পর র‍্যাঁবো নাকি হ্যাঁবো – কোন্ বানানটি গ্রহণযোগ্য; তা বোধহয় আর বলে না দিলেও চলে। সামগ্রিক আলোচনায় বিভিন্ন রকমের প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে অ-তৎসম অ-তদ্ভব শব্দের বানান লেখার ক্ষেত্রে কী ধরনের নির্দেশ সাধারণত দেওয়া হয়, তার ঝলকদর্শন সম্ভব হল। আমরা লক্ষ করলাম, বাংলা ব্যতিরেকে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে নাগরী থেকে লিপ্যন্তর এবং অ-ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে ধ্বনিগত রূপান্তরের প্রবণতা বেশি। স্পষ্টতই, বানান এখানে ব্যাকরণকে যত না গুরুত্ব দিচ্ছে, ভারতীয় ভাষা নামক রাষ্ট্রিক পরিচয় তার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। তারই পাশাপাশি জনরুচির কথাও মাথায় রাখতে হচ্ছে। শুধুমাত্র সেই কারণেই 'গ্বালিয়র' সংবাদপত্রে স্থান পায়; কিন্তু 'পারি' (Paris) বা 'বেলজিক' (Belgique) লেখা হয় না। ভবিষ্যতে কোনো সংস্থা যখন বিদেশি শব্দের বানানবিধি নির্মাণ করবেন, ভাষাতত্ত্ব ব্যতিরেকেও বানান-নির্ণায়ক এইসব উপাদানগুলি তাৎকালিক প্রেক্ষিতে তাঁদের বিবেচনা করতে হবে।

তথ্যসূত্র

চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ. *বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন.* দ্বিতীয় সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০.

পাল, পলাশ বরন. *ধ্বনিমালা বর্ণমালা.* দ্বিতীয় সংস্করণ, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১৫.

প্রথম আলো ভাষারীতি. পঞ্চম সংস্করণ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭.

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ. "তক্ত." *বঙ্গীয় শব্দকোষ.* দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমী.

বসু, রাজশেখর. "তক্ত." *চলন্তিকা,* এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪২১ বঙ্গাব্দ.

বানান ও বিন্যাস-বিধি. প্রথম প্রকাশ, বিশ্বভারতী, ১৪২২ বঙ্গাব্দ (২০১৫ খ্রিস্টাব্দ).

বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম. পরিমার্জিত সংস্করণের প্রথম মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৫.

বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র, সম্পা. "তকত." *সংসদ বাংলা অভিধান,* ত্রয়োবিংশতিতম মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, জুলাই, ২০১৬,

ভট্টাচার্য, মিতালী. *বাংলা বানানচিন্তার বিবর্তন.* প্রথম সংস্করণ, পারুল প্রকাশনী, ২০০৭.

ভট্টাচার্য, সুভাষ. *বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান.* চতুর্থ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩.

— *সংসদ বিদেশি নামের উচ্চারণ.* চতুর্থ মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, ২০১৭.

মজুমদার, পরেশচন্দ্র. *বাঙলা বানান বিধি.* দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪.

মুরশিদ, গোলাম. *বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান.* প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ২০১৩.

সরকার, পবিত্র. *বাংলা বানান সংস্কার: সমস্যা ও সম্ভাবনা.* দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪.

সেনগুপ্ত, সমীর, এবং বসু, সমীর, সম্পা. "বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম, প্রথম সংস্করণ ১৯৯২."

বাংলা বানান: বিতর্ক ও সমাধান, প্রথম প্রকাশ, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৭.

হক, কাজী রফিকুল. *বাংলা ভাষায় আরবী ফার্‌সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান.* প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ২০০৭.

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলা ক্রিয়াপদের বানান নির্ধারণে সামাজিক প্রভাব

৩.১ ক্রিয়াপদের বানান : ব্যাকরণে উপেক্ষিত

বাংলা বানান-সংক্রান্ত প্রতর্কে ক্রিয়াপদের বানান অনেক সময়তেই উপেক্ষিত থেকে যায়। একেকটি শব্দের ব্যাকরণগত ব্যাখ্যা, ব্যুৎপত্তি, প্রয়োগবৈচিত্র্য ইত্যাদি নিয়ে যত শব্দ ব্যয় করা হয়, ক্রিয়াপদের বানান সম্পর্কে সেরকম বিস্তারিত আলোচনা নজরে পড়ে না। এই বক্তব্যের সপক্ষে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে।

১৩৩২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের[১] 'চ'ল্‌তি ভাষার বানান' প্রবন্ধে বানান-সংক্রান্ত সর্বমোট ৩৭টি নিয়ম লিপিবদ্ধ হয়েছে। এদের মধ্যে ক্রিয়াপদের বানান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ১৫টি নিয়মে। অর্থাৎ, আনুমানিক ৪১%। ক্রিয়াপদের গুরুত্বসূচক এই শতাংশের হার পরবর্তীকালে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। আলোচ্য প্রবন্ধের শুরুতে লেখক ঘোষণা করছেন, বাংলা বানান বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কথা আর নতুন কিছু বলার নেই—

> ভাষাতত্ত্বের দিক্ থেকে বানান-সমস্যা আলোচনা কর্‌বার ইচ্ছা বা সামর্থ্য আমার নেই। তা নিয়ে অনেক আলোচনাও হ'য়ে গিয়েছে। সে সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বল্‌বারও বোধ হয় বাকী নেই। (চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ ১৮২)

বাংলা ভাষার প্রাতিষ্ঠানিক বানানবিধির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হতে তখনও ১১ বছর বাকি। তার আগেই প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ভাবছেন, বানান সংক্রান্ত আলোচনা ঢের হয়েছে! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধিতে (তৃতীয় সংস্করণ: ১৯৩৭) ২২টি নিয়মের মধ্যে ক্রিয়াপদের বানানের জন্য বরাদ্দ হয়েছে মাত্র একটি নিয়ম।[২] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বানান প্রস্তাবে (১৯৭৯) ১৫টি নিয়মের মধ্যে ক্রিয়াপদের বানান আলোচিত হয়েছে তিনটি মাত্র নিয়মে (ভট্টাচার্য, মিতালী চিত্রের পৃষ্ঠাসংখ্যা অনুল্লিখিত)। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধিতে ৬৮টি নিয়মের[৩] মধ্যে ক্রিয়াপদের বানান আলোচনা করা হয়েছে ৫টি নিয়মে *(পশ্চিমবঙ্গ*

---

[১] এই বানানবিধি প্রশান্তচন্দ্রের নামে প্রচলিত হলেও আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল বলে মনে করা হয়। পবিত্র সরকার জানাচ্ছেন, "... ১৯১৪ সালে প্রমথ চৌধুরীর *সবুজ পত্র* পত্রিকার জন্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটা বানাননীতি করেছিলেন। ... সেটাই আবার ১৯২৫-এ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের নামে নতুন বানান হিসেবে প্রচারিত হল" (সরকার, *বাংলা লিখুন: নির্ভুল, নির্ভয়ে* ২৬)। তবে আমাদের অভিমত, এই প্রবন্ধের শুরুতে লেখক যে-ভাবে ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতার কথা স্বীকার করছেন, তাকে বিনয়বচন বলে মনে না-করে প্রশান্তচন্দ্রের সত্যভাষণ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। সম্পূর্ণ না-হলেও এই প্রবন্ধ রচনায় প্রশান্তচন্দ্রের কৃতিত্ব একেবারে শূন্য বলে গণ্য করা যায় না।

[২] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির (১৯৩৭) এই গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত রূপ ব্যবহার করা হয়েছে —(মজুমদার, বাঙলা বানান বিধি ১০২-০৭)

[৩] গোনার সময় উপনিয়মগুলিকে আলাদা নিয়ম হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি। অর্থাৎ, ৫.১, ৫.২, ৬.১ ইত্যাদিকে একেকটি আলাদা নিয়ম বলে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু, ৫.২১, ৬.২১ ইত্যাদি উপনিয়ম আলাদাভাবে গোনা হয়নি। ক্রিয়াপদের বানান পাওয়া যাবে ১৪.৩ থেকে ১৪.৭ অংশে।

বাংলা আকাদেমি গৃহীত বাংলা বানানবিধি ২০-২১)। অর্থাৎ, ৭ শতাংশের সামান্য বেশি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বানানবিধিতে নামপদের তুলনায় ক্রিয়াপদের বানান কিছুটা যেন উপেক্ষিত। ক্রিয়াপদের বানান বিষয়ে বৈয়াকরণদের এবম্বিধ অমনোযোগের কতিপয় কারণ অনুমান করা যায়—

প্রথমত, বাংলা ক্রিয়াপদের— বিশেষত, চলিত ক্রিয়াপদের— বানান সম্পর্কে আলোচনার সময় সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিনাটি নিয়ম নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিতর্কের সুযোগ কম।

দ্বিতীয়ত, ক্রিয়াপদের বানান শব্দের মতো বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করা যায় না। হ'ক, হোক নাকি হোক্— কোন্ বানান যুক্তিসংগত, তা বোঝার জন্য সামগ্রিকভাবে অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের বানাননীতি নির্ধারণ করা জরুরি। প্রত্যেকটি ক্রিয়াপদ যেন একটি বৃহৎ শ্রেণির অন্তর্গত। নামপদের মতো স্বতন্ত্র চারিত্র্য না-থাকায় আলোচকদের মনোযোগ টানতে ক্রিয়াপদ ব্যর্থ হয়েছে।

তৃতীয়ত, শব্দের বানান সাধারণত ব্যুৎপত্তি এবং ব্যবহারযোগ্যতা (যেমন: হস্-চিহ্ন বা ঊর্ধ্বকমা বারবার ব্যবহার করা মুশকিল) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্যতিক্রমী কতিপয় ক্ষেত্র ছাড়া (যেমন: মত/মতো, কোন্/ কোনো ইত্যাদি) অর্থ বানানের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক নয়। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই বানান নিয়ন্ত্রক উপাদানগুলির তালিকা বেশ দীর্ঘ। ব্যুৎপত্তি এবং ব্যবহারযোগ্যতার পাশাপাশি অর্থ, অধিধ্বনি (তুলনীয়: বিবৃতিবাচক 'চিঠি লিখিস' এবং অনুজ্ঞাবাচক 'চিঠি লিখিস'), অন্য কাল এবং পুরুষের ক্রিয়াপদের সঙ্গে সামঞ্জস্য ইত্যাদি রূপতত্ত্ব-বহির্ভূত বিষয়ও সেখানে প্রভাব বিস্তার করে। এই জটিলতা ক্রিয়াপদের সুসংহত বানানবিধি নির্মাণের পক্ষে বড়ো অন্তরায়।

কোনো বাক্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তার ক্রিয়াপদ। ইংরেজিতে একে 'heart of the sentence' বলা হয়—

> We often think of the verb as being the "heart"of the sentence... Verbs are complex elements that not only provide crucial sentence meaning but also provide support for other verbs, determine what kinds of sentence elements can come after them, combine with prepositions and adverbs to make special verbs known as phrasal verbs, and show time references. (DeCapua 119)

ক্রিয়াপদে বাক্যের সবচেয়ে বেশি ব্যাকরণগত তথ্য নিহিত থাকে। বাক্যে ক্রিয়ার কাল (tense), প্রকার (aspect), ভাব (mood), পক্ষ[৪] বা পুরুষের (person) সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে তৈরি হয় প্রত্যেকটি ক্রিয়াপদ। বাংলা ভাষায় প্রত্যেকটি ক্রিয়াপদ নির্মাণের সময় কর্তা-ক্রিয়া সামঞ্জস্য কাজ করে। বাক্যতত্ত্বের আলোচনায় একে 'সংগতি' নামে অভিহিত করা হয় (আজাদ ২২২)। ব্যাকরণগতভাবে ক্রিয়াপদ মুক্ত রূপ (free morph) বলে পরিগণিত হলেও বাক্যের আন্বয়িক স্তরের (syntactic level) সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বর্তমান অধ্যায়ের উদ্দেশ্য: ক্রিয়াপদের এই ব্যাপ্ত চরিত্রের কথা মাথায় রেখে বাংলা ক্রিয়াপদ-সম্পর্কিত সুসংহত একটি বিধি প্রণয়ন করা। একইসঙ্গে, এতদিন পর্যন্ত ক্রিয়াপদের বানান নির্মাণে সামাজিক ধারণা কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, তাও আমরা খতিয়ে দেখতে চাইব।

---

[৪] অধ্যাপক পবিত্র সরকার প্রস্তাবিত পরিভাষা। দ্র. (সরকার, *বাংলা বানান সংস্কার: সমস্যা ও সম্ভাবনা* ৭৩-৯৩)

৩.২ বাংলা ক্রিয়াপদের গঠন: একটি প্রস্তাব

বাংলা ক্রিয়াপদের বানান নির্ধারণ করতে হলে, তার উপাদানগুলিকে আগে গঠনগত দৃষ্টিকোণ থেকে চিনে নেওয়া দরকার। তারপরে বিচার করতে হবে, প্রত্যেকটি গাঠনিক উপাদানের বানান ঐতিহাসিক এবং সমকালিক যুক্তি অনুসারে কী হওয়া উচিত।

প্রথমে দুটি বিভ্রান্তিকর পরিভাষা স্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়া যাক— প্রকার (aspect) ও ভাব (mood)। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* গ্রন্থে ক্রিয়ার ভাব এবং প্রকার আলাদা করে নির্দেশ করেননি। mood-এর বাংলা পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার করেছেন 'ভাব-প্রদর্শক প্রকার'—

> যে উপায়ে ক্রিয়া-পদের বর্ণিত কার্য্য ঘটিবার প্রকার অথবা রীতির বোধ বা দ্যোতনা হয়, তাহাকে ভাব-প্রদর্শক প্রকার (mood) বলে। (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার ২৯৯)

এই পরিভাষা সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে গৃহীত নয় বলে তিনি জানাচ্ছেন। রাজা রামমোহন রায় 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থে mood-এর বাংলা হিসাবে 'প্রকার' ব্যবহার করেছেন। পক্ষান্তরে, আচার্য সুকুমার সেন mood-এর বাংলা হিসাবে 'ভাব' শব্দটি ব্যবহার করেছেন (সেন ২২৫)। তাঁর পরিভাষাটিই আমাদের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। প্রকার এবং ভাব এই দুই পরিভাষা স্পষ্টত আলাদা রাখার প্রয়োজন রয়েছে। নীচের সারণিতে কয়েকটি বাক্য দেখানো হল—

বাক্য	কাল	প্রকার	ভাব
রামকে বুঝিয়ে বোলো	ভবিষ্যৎ	সাধারণ	অনুজ্ঞা
রামকে বুঝিয়ে বলো	বর্তমান	সাধারণ	অনুজ্ঞা
রামকে বুঝিয়ে বলেছি	বর্তমান	পুরাঘটিত	বিবৃতিবাচক[৫]
রামকে বুঝিয়ে বলছি	বর্তমান	ঘটমান	বিবৃতিবাচক

সারণি ৩.১: ক্রিয়ার প্রকার এবং ভাবের প্রভেদ

ভাব এবং প্রকার পরিভাষা কেন পৃথক রাখার প্রয়োজন, এই বাক্যগুলি থেকে সহজে বোঝা যাচ্ছে। এবার এই উপাদানগুলি সম্মিলিত হয়ে কীভাবে একটি ক্রিয়াপদ গঠন করে, তা দেখে নেওয়া যাক। তারপর প্রত্যেকটি অংশের বানান নির্ধারণ করা যাবে। অধ্যাপক পবিত্র সরকারের মতে *(সরকার, বাংলা বানান সংস্কার: সমস্যা ও সম্ভাবনা* ৭৯), চলিত মান্য বাংলা সমাপিকা ক্রিয়াপদের গঠন নিম্নরূপ—

সিদ্ধ ধাতু + সাধিত বিভক্তি + প্রকার বিভক্তি + কাল বিভক্তি + পক্ষ বিভক্তি

[৫] বর্তমান সন্দর্ভে indicative mood–এর বাংলা পরিভাষা হিসাবে 'বিবৃতিবাচক' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'অবধারক বা নির্দেশক' শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার ৩০০)। আচার্য সুকুমার সেনের লেখাতেও indicative-অর্থে নির্দেশক শব্দটি পাওয়া যায়: "অতএব বাঙ্গালায় সমাপিকা ক্রিয়াপদের ভাব দুইটি— নির্দেশক ও অনুজ্ঞা" (সেন ২২৫)। আমাদের মতে, 'নির্দেশ' শব্দটি যেহেতু অনুজ্ঞার্থে ব্যবহৃত হয় (উদা: চিকিৎসকের নির্দেশ পালন করব), indicatice-অর্থে এর প্রয়োগ বিভ্রান্তিকর। একে 'উক্তিমূলক' বলাও সংগত নয়। কারণ, উক্তি তো অনুজ্ঞাবাচকও হতে পারে (রাজা বললেন, "চুপ করো!")।

অধ্যাপক সরকার প্রস্তাবিত গঠন কিয়দংশে সরলীকৃত। উল্লিখিত গঠনে মৌলিক এবং যৌগিক কাল[৬] আলাদাভাবে বোঝানোর কোনো উপায় নেই। -এছ্ প্রকার বিভক্তিরূপে বিবেচিত হলে, এর মধ্যে যে-আসলে যৌগিক কালের সহায়ক ধাতু আছ্ নিহিত রয়েছে, সেই তথ্য অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে। ক্রিয়াপদের গঠনে কোন্ উপাদানগুলি ঐচ্ছিক আর কোন্গুলি আবশ্যিক, তাও এখান থেকে বোঝার উপায় নেই।

অন্যদিকে, পলাশ বরন পালের মতে (পাল, কাজের কথা ১৩৫) ক্রিয়াপদের গঠন—

ক্রিয়াপদ= (মূলরূপ – বিশেষ্যবাচক প্রত্যয়) X [প্রতিস্বর] + রূপবাচক বিভক্তি + পক্ষবাচক বিভক্তি

অধ্যাপক পাল ছ্-কে রূপবাচক বিভক্তি বলে গণ্য করছেন। যৌগিক ক্রিয়া হিসাবে তাকে আলাদা ক্রিয়াপদের অংশ হিসাবে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করছেন না। এইসব সমস্যার নিরাকরণে আমাদের বিকল্প প্রস্তাব, বাংলা ক্রিয়াপদের গঠন একটিমাত্র সূত্রের[৭] সাহায্যে প্রকাশ করতে হলে এইভাবে লেখা যেতে পারে —

ক্রিয়াপদ= ধাতু (+ সাধিত বিভক্তি) + কাল-বিভক্তি$_১$ + পুরুষ-বিভক্তি$_১$ (+ স্বার্থিক বিভক্তি) (+ প্রকার-বিভক্তি + কাল-বিভক্তি$_২$ + পুরুষ-বিভক্তি$_২$)

বন্ধনীভুক্ত উপাদানগুলি ঐচ্ছিক। বাকি উপাদানগুলি আবশ্যিক। তবে ক্ষেত্রবিশেষে শূন্য উপাদান ব্যবহৃত হতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক—

---

[৬] যৌগিক কাল হল সেই ধরনের দ্বৈত ক্রিয়াপদ (compound verb), যার দুই অংশের মধ্যে কোনো ফাঁক (juncture) অনুভূত নয়। এর প্রথমাংশে থাকে: ই(য়া), ই(ল)-যুক্ত অতীত অথবা ই(তে)-যুক্ত বর্তমান। শেষাংশে থাকে: √আছ্ নিষ্পন্ন সমাপিকা পদ। উদা: করিয়াছে- (√কর্+ ইয়া) + (√আছ্+এ) > করিয়া + আছে > করিয়াছে, করিতেছে- (√কর্+ইতে) + (√আছ্+এ)> করিতে + আছে > করিতেছে (সেন ২৪০)। 'যুক্ত ক্রিয়া' এবং 'যৌগিক ক্রিয়া'-কে 'বহুশাব্দিক ক্রিয়া' বলে অভিহিত করেছেন অধ্যাপক পবিত্র সরকার। বস্তুত, তাঁর যৌগিক ক্রিয়ার সংজ্ঞা পূর্বোল্লিখিত সুকুমার সেনের সংজ্ঞার তুলনায় কিছুটা আলাদা (ইসলাম এবং সরকার ২৭৬-৯৭)। বানানের আলোচনায় রূপতাত্ত্বিক বিতর্ক অপ্রাসঙ্গিক বলে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হল না। তবে উল্লেখ থাক, বর্তমান অভিসন্দর্ভে আচার্য সুকুমার সেনের সংজ্ঞাই মেনে নেওয়া হয়েছে।

[৭] সুনীতিবাবু -ইল্, -ইব্ ইত্যাদি উপাদানকে কাল-বাচক প্রত্যয় বলছেন (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার ১২৬)। সুকুমার সেনও এদের প্রত্যয় বলছেন (সেন ২৩৪)। পক্ষান্তরে, আধুনিক বৈয়াকরণগণ কাল-বাচক উপাদানকে বিভক্তি বলছেন। পবিত্রবাবু লিখছেন, "... অতীত ও ভবিষ্যতের -ল, -ব বিভক্তিগুচ্ছকে ও-কার দেবার সুপারিশ হয়নি" (তথ্যসূত্র ৭, পৃ. ৮৬)। অন্যত্রও -ইল্ উপাদানটিকে 'কাল বিভক্তি'-রূপে চিহ্নিত করছেন (পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯)। বাংলা একাডেমীর 'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' কাল-বাচক উপাদানকে বিভক্তি বলছেন — "... ইল্ অতীত বিভক্তি যুক্ত হয়..." (প্রথম খণ্ড, ২০১২, পৃ. ২৬৫)। সংস্কৃতে কাল-বাচক তিঙ্ প্রত্যয় বিভক্তিরূপেও স্বীকৃত ("বিভক্তিশ্চ", অষ্টাধ্যায়ী, ১।৪।১০৪)। বাংলাতেও তাই এদের বিভক্তি বলা যেতে পারে। পূর্বোক্ত পাণিনীয় সূত্রের ব্যাখ্যার জন্য দ্র. (Vasu 210)।

ক্রমিক সংখ্যা	ক্রিয়াপদ	সিদ্ধ ধাতু	সাধিত বিভক্তি	কাল-বিভক্তি$_১$	পুরুষ-বিভক্তি$_১$	স্বার্থিক বিভক্তি	প্রকার-বিভক্তি[৮]	কাল-বিভক্তি$_২$	পুরুষ-বিভক্তি$_২$
১	খা	খা	অনু.	শূন্য	শূন্য	অনু.	অনু.	অনু.	অনু.
২	খায়	খা	অনু.	শূন্য	এ (য়)	অনু.	অনু.	অনু.	অনু.
৩	খাইতাম	খা	অনু.	ইত্	আম	অনু.	অনু.	অনু.	অনু.
৪	খাওয়াইলাম	খা	আ	ইল	আম	অনু.	অনু.	অনু.	অনু.
৫	খাইতেছি	খা	অনু.	ইত্	এ	অনু.	ছ্	শূন্য	ই
৬	খাওয়াইতেছি	খা	আ	ইত্	এ	অনু.	ছ্	শূন্য	ই
৭	খাওয়াইলে	খা	আ	ইল্	এ	অনু.	অনু.	অনু.	অনু.
৮	খাইতেছিলাম	খা	অনু.	ইত্	এ	অনু.	ছ্	ইল্	আম
৯	খাওয়াইতেছিলাম	খা	আ	ইত্	এ	অনু.	ছ্	ইল্	আম
১০	খাওয়াইয়াছিলাম	খা	আ	ই	শূন্য	আ	ছ্	ইল্	আম
১১	খাইবেক	খা	অনু.	ইব্	এ	ক	অনু.	অনু.	অনু.
১২	খাওয়াইবেক	খা	আ	ইব্	এ	ক	অনু.	অনু.	অনু.

অনু. = অনুপস্থিত

সারণি ৩.২: ধাতু এবং বিভক্তিসহ ক্রিয়াপদের গঠন বিশ্লেষণ

মৌলিক কালের ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে ঐচ্ছিক উপাদানগুলি অনুপস্থিত থাকতে পারে। পক্ষান্তরে, যৌগিক কাল প্রকার-বিভক্তির উপস্থিতি ব্যতিরেকে তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। প্রকার-বিভক্তি উপস্থিত থাকলে কাল-বিভক্তি$_২$ এবং পুরুষ-বিভক্তি$_২$ অনুপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। তবে তাদের উপস্থিতি স্বীকার করে নিয়ে শূন্য বিভক্তি যোগ হতে পারে। একটি বিভক্তির অনুপস্থিত থাকা এবং শূন্য বিভক্তি যোগ হওয়ার মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখা জরুরি। এর ফলে, ক্রিয়াপদ মৌলিক ধাতু থেকে সঞ্জাত নাকি সাধিত ধাতু থেকে, ক্রিয়াপদটির মধ্যে একটিমাত্র ধাতু রয়েছে নাকি এটি আসলে দুটি ক্রিয়াপদের সমষ্টি (তথা যৌগিক কাল) ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর সহজে পাওয়া যায়।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, অসমাপিকা ক্রিয়াপদের জন্য কোনো আলাদা বিভক্তি নির্ধারণ করা হয়নি। অসমাপিকা ক্রিয়ার বিভক্তিকে দুটি বিভক্তির সমষ্টি হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ, -ইতে, -ইলে বা -ইয়া বিভক্তিকে পৃথক অসমাপিকা বিভক্তি হিসাবে গণ্য করার পরিবর্তে কাল-বিভক্তি$_১$ এবং পুরুষ-বিভক্তি$_১$ / স্বার্থিক বিভক্তির সমষ্টি হিসাবে এদের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পূর্বোক্ত সূত্রের সাহায্যে ঠিক সমাপিকা ক্রিয়াপদের মতোই অসমাপিকা ক্রিয়ার গঠন ব্যাখ্যা করা যায়। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় -ইল্ বিভক্তির পরের এ বিভক্তিকে অধিকরণের বিভক্তি বলে চিহ্নিত করেছেন— "<<il- ē>> is a locative form, and as a locative it has an absolutive or conditional force" (Chatterji 1004)। -ইতে বিভক্তির ব্যুৎপত্তি সম্পর্কেও তাঁর অভিমত অনুরূপ— "The <<itē>> of Bengali is best explaied as the old verbal noun in <<i>>,

[৮] এটি বস্তুতপক্ষে যৌগিক কালের দ্বিতীয় ক্রিয়াপদের আছ্ ধাতুর ভগ্নাংশ। যৌগিক কালের দুটি অংশ সংযুক্ত হওয়ার সময় আছ্ ধাতুর আদিস্বর লোপ পায়।

plus the locative affix <<tē>>, <<t>> as in Chittagong" (Chatterji 1014)। তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ— "সে গেলে আমি যাইব এইরূপ বাক্যে "গেলে" সংস্কৃত ব্যাকরণে ভাবে সপ্তমী — তস্মিন্ গতে অহং যাস্যামি। বাঙ্গালায় -লে, সংস্কৃতের ন্যায় অতীতের রূপে অধিকরণে 'এ' বিভক্তিযোগে নিষ্পন্ন" (শহীদুল্লাহ্ ১৩৮)। -ইতে বিভক্তি সম্পর্কে ড. শহীদুল্লাহ্ অভিমত জ্ঞাপন করেছেন: "ইহা সংস্কৃত ব্যাকরণের শতৃ (=অন্ত) প্রত্যয়ান্ত পদে অধিকরণের 'এ' বিভক্তি।"

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁদের বক্তব্যের যাথার্থ্য স্বীকার্য। তবে বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সমকালিক বিশ্লেষণের সময় কাল-বিভক্তির পরে স্থিত -এ বিভক্তিকে পুরুষ-বিভক্তি হিসাবে গণ্য করা শ্রেয় বলে আমাদের মনে হয়। সকর্মক সমাপিকা ক্রিয়ার রূপ অসমাপিকার সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে। উদা:

	-ইলে	**-ইতে**	**-ই**[৯]
সমাপিকা সকর্মক	সে গাইলে ভুবনভোলানো এক গান	তুমি জ্যোৎস্নারাতে গান গাইতে	আমি জল ভরি।
অসমাপিকা	সে গাইলে আমি শুনব	গুপি গান গাইতে শুরু করল।	সোনার ধানে গিয়েছে ভরি'। তা দেখি কাহ্ন (চর্যা ৭)

সারণি ৩.৩: সমাপিকা এবং অসমাপিকা ক্রিয়াপদের রূপতাত্ত্বিক সাদৃশ্য

সমাপিকা ক্রিয়ায় -ইলে এবং -ইতে সংযুক্ত-বিভক্তির ক্ষেত্রে এ-বিভক্তি সুনিশ্চিতভাবেই পুরুষ-বাচক। অসমাপিকা ক্রিয়াপদের তথাকথিত -ইলে বা -ইতে বিভক্তি বিশ্লেষণ করে কাল- এবং পুরুষ-বিভক্তির সমষ্টিরূপে ব্যাখ্যা করা যায়। অসমাপিকার ক্ষেত্রে -এ বিভক্তি যে-কোনো পুরুষে প্রযুক্ত হচ্ছে বলে তার তির্যক-ধর্ম স্বীকার্য। -ইয়া বিভক্তি সামান্য ব্যতিক্রম। এখানে পুরুষ বিভক্তি শূন্য। পরিবর্তে আসছে স্বার্থিক -আ।

বাংলা ক্রিয়াপদের গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে বানানের আলোচনায় স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রথাগত ব্যাকরণ থেকে আলাদা কিছু প্রস্তাব আমরা পেশ করেছি–

১। আমরা একটি সর্বার্থসাধক সূত্র পেশ করার চেষ্টা করেছি, যা বাংলা সমাপিকা এবং অসমাপিকা ক্রিয়াপদের গঠন সহজে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২। ভাব এবং প্রকার– এই দুই পরিভাষার পৃথগীকরণ।

[৯] সমাপিকা ক্রিয়াপদে -ই পুরুষ-বিভক্তি, অসমাপিকা ক্রিয়াপদে -ই কাল-বিভক্তি। সারণি ৩.২-এর ১০ সংখ্যক ক্রিয়াপদ দ্র.। এই -ই কাল-বিভক্তির ব্যুৎপত্তি বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। -আ প্রযুক্ত হলেও অর্থ পালটাচ্ছে না বলে, তা স্বার্থিক বিভক্তি বলে বিবেচ্য। ড. অলিভা দাক্ষীর মতে, " -ই, -ইঅ/ -ইআ < সং -ইত< -ক্ত + স্বার্থিক প্রত্যয়" (দাক্ষী ১৭৬) ।

৩। প্রকার-বিভক্তির উপস্থিতির মাধ্যমে যৌগিক কালের ক্রিয়াপদ চিহ্নিতকরণ।

৪। মৌলিক এবং সাধিত ধাতু, মৌলিক এবং যৌগিক কালের ক্রিয়াপদ ইত্যাদির পার্থক্য বজায় রাখার জন্য বিভক্তির অনুপস্থিতি এবং শূন্য বিভক্তির পৃথগীকরণ।

৫। অসমাপিকা ক্রিয়াপদের গঠন, রূপতত্ত্বের দিক থেকে, সমাপিকা ক্রিয়ার মতোই। উভয়ের পার্থক্য বাগর্থের স্তরে। অসমাপিকা বিভক্তি বস্তুত কাল- এবং পুরুষ/ স্বার্থিক-বিভক্তির সমষ্টি।

এতক্ষণ পর্যন্ত বাংলা ক্রিয়াপদের গঠন সম্পর্কিত প্রাথমিক আলোচনার পর, ক্রিয়াপদের বানান-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিকে সূচিমুখ করে তোলা সহজ হবে। আমাদের আলোচ্য মূল কিছু বিষয় নীচে সাজিয়ে দেওয়া হল—

- ধাতুর বানান কি উচ্চ কাণ্ডের ক্ষেত্রে বদলানো হবে? উচ্চ কাণ্ড[১০] বলতে বোঝানো হচ্ছে, স্বরোচ্চতা-সাম্যের ফলে একটি ধাতুর ধ্বনিগতভাবে পরিবর্তিত রূপ। যেমন:
  √দ্যাখ্ (নিম্ন কাণ্ড) + আ= দ্যাখা/ দেখা
  √দেখ্ (উচ্চ কাণ্ড) + ই= দেখি
- নিম্ন-কাণ্ডের ধাতুর বানান বজায় রেখে দ্যাখা লেখা হবে, নাকি দেখা? অতীতের বিভক্তি -ইত্ এবং -ইল্ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বরান্তরূপে লেখা উচিত।[১১] কিন্তু ব্যঞ্জনান্তরূপে না-লিখলে এদের পরে পুরুষ-বিভক্তি যোগ করার সময় সন্ধির নিয়ম লঙ্ঘিত হয়। কোন্ পন্থা অবলম্বনীয়?
- পুরুষ-বিভক্তির বানানের ওপর সামগ্রিক ক্রিয়াপদটির বানান নির্ভরশীল। উচ্চারণে যে-সকল বিভক্তি ব্যঞ্জনান্ত (-আম্, -উম্, -এন্, -ইস্), তাদের বানান কি উচ্চারণ অনুযায়ী লেখা হবে?
- মধ্যম পুরুষে স্বরান্ত-বিভক্তির বানান শ্রমের সাশ্রয়ের দিকে লক্ষ রেখে অ লেখা হবে, নাকি উচ্চারণগতভাবে ও লেখা হবে? অর্থাৎ, করব নাকি করবো?
- বিবৃতিবাচক এবং অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের বানানে পার্থক্য বজায় রাখা হবে কীভাবে? "তুমি খাও", "তুমি বলো", "আপনি যান" – এই ধরনের দ্ব্যর্থক বাক্যের ভাব (mood) নির্ধারণে বানান কীভাবে সাহায্য করতে পারে?

আগামী পরিচ্ছেদে কেবল বিবৃতিবাচক ভাবের ক্রিয়াপদের বানান সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের বানান তার পরের পরিচ্ছেদের আলোচ্য।

৩.৩ বিবৃতিবাচক ভাবের ক্রিয়াপদের বানান

সংস্কৃতানুগ প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে ধাতুর উচ্চ এবং নিম্ন কাণ্ড বিভাজন করা হয় না। প্রধানত বিদেশি বৈয়াকরণদের অনুসরণে বাংলায় এই প্রভেদ প্রবেশ করেছে। পবিত্র সরকার জানিয়েছেন *(সরকার, বাংলা বানান*

---

[১০] "The stem of a verb is the fragment we are left with when the verb endings are dropped... If we take the form আমি লিখি I write with its verbal noun লেখা and and drop off the endings we are left with two stems: high লিখ, low লেখ." (Thompson 143)

[১১] ক্ত, ক্তবতু নিষ্ঠা প্রত্যয় থেকে সেট ধাতুর ক্ষেত্রে -ইত আগত।

সংস্কার: সমস্যা ও সম্ভাবনা ১৯২), চার্লস এ. ফার্গুসন ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম এই প্রভেদের বিষয়টি প্রস্তাব করেন। পরবর্তীকালে এডোয়ার্ড সি. ডিমক (জুনিয়র), সোমদেব ভট্টাচার্য এবং সুহাস চট্টোপাধ্যায় বিদেশিদের বাংলা শেখানোর ক্ষেত্রে এই বিভাজন স্বীকার করে নেন—

> Many Bengali nouns, pronouns, and verbs have two alternative stems. The two alternavive verb stems will hereafter be distinguished as "high" and "low" stems, the term referring to the height of the stem-vowel... (Dimmock (Junior) et al. 76)

হানে-রুথ থম্পসনের বইতেও (Thompson 143) এই তত্ত্ব স্বীকৃতি পেয়েছে। বিদেশিদের সুবিধা হলেও এই তত্ত্ব বাংলাভাষীদের কাছে বানানের বিষয়টি বেশ জটিল করে তোলে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে সহস্বনিম (allophone), সহরূপ (allomorph), সহলেখ (allograph) ইত্যাদি ধারণা প্রভাব ধাতুমূলের দুটি রূপভেদ প্রস্তাব করার সময় বিদেশি ভাষাবিজ্ঞানীদের প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। বানানচর্চার ক্ষেত্রে এই প্রভেদ অনাবশ্যক বলে আমরা মনে করি। কারণ—

১। বাংলা ধাতুর তালিকায় কিংবা অভিধানে উচ্চ এবং নিম্ন কাণ্ডের মধ্যে কোন্‌টি মূল ধাতুরূপে স্বীকৃত হবে? ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণের সময় কোন্ রূপকে অবলম্বন করে ইতিহাসে পিছিয়ে যাওয়া হবে? এডোয়ার্ড সি. ডিমক (জুনিয়র) এবং অন্যান্যরা পূর্বোক্ত গ্রন্থে ধাতুমূলের তালিকায় নিম্ন কাণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করছেন— কেন্, ওঠ্, বস্, খ্যাল্ ইত্যাদি। কিন্তু ব্যুৎপত্তি অনুসারে সংস্কৃতে যদি উচ্চ কাণ্ডের ধাতুটি পাওয়া যায় (যেমন: √খেল্, √লিখ্); সেক্ষেত্রে সংস্কৃতানুসারী রূপটিকেই বাংলা ধাতুর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা সংগত বলে মনে হয়।

২। অ-সংস্কৃত দ্বি-কাণ্ডবিশিষ্ট ধাতুর ক্ষেত্রে প্রশ্নটি আরও জটিল হয়ে ওঠে। যেমন, *সংসদ বাংলা অভিধান* মতে, গ্যাঁড়ানো, ক্যালানো দেশি শব্দ। উভয়ই অশিষ্ট প্রয়োগ। তবে ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় এদের বানান আমাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে। এর উচ্চ এবং নিম্ন কাণ্ডের উচ্চারণ পাওয়া যায়। উদা: গেঁড়িয়ে, গ্যাঁড়ানো; কেলিয়ে, ক্যালানো ইত্যাদি। এখন, মূল ধাতুটির উচ্চারণ কী ছিল — /gæɽ/ নাকি /gẽɽ/, /kæl/ নাকি /kel/ — তা নির্ণয় করা মুশকিল।

৩। ধাতুমূলকে যদি স্বরোচ্চতাসাম্যের নিরিখে দুটি আলাদা রূপে দেখাতে হয়, সমতাবিধানের স্বার্থে নামপদের ক্ষেত্রেও একই দাবি উঠবে। বেষ্টন অর্থে 'বেড়' এবং গাছের চারপাশে 'বেড়া দেওয়া' — এই দুটি শব্দের মধ্যে যে ব্যুৎপত্তিগত সম্পর্ক রয়েছে, নিম্ন কাণ্ডকে গুরুত্ব দিয়ে 'ব্যাড়া দেওয়া' বানান লিখলে সেই তত্ত্বটি অস্পষ্ট হয়ে যায়। একইভাবে আপাতদৃষ্টিতে 'প্যাঁচা' বানানের নিকটাত্মীয় হয়ে যায় প্যাঁচ, পেচক নয়। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে 'দ্যাখা' স্বীকৃতি পেলে, নামপদের ক্ষেত্রে 'খ্যালাধুলো' বা 'ম্যালা' (fair অর্থে) বানানকে স্বীকৃতি দিতে হয়! উচ্চারণ-নির্ভর এই ধরনের বানান বাংলা ভাষাকে ঐতিহ্যবিচ্যুত করে।

৪। ফার্গুসন, ডিমক প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ স্বরোচ্চতাসাম্যের ওপর ভিত্তি করে একটি ধাতুর দু'রকম মাত্র রূপভেদের কথা বলেছেন। বস্তুত, আঞ্চলিক উচ্চারণকে গণ্য করলে রূপভেদের সংখ্যা দুইয়ের বেশি হতে পারে। উদা:

দিলাম- দেব- দ্যালাম – দালাম[১২] – দোবো[১৩]

ধাতুর রূপভেদগুলিকে (√দি - √দে- √দ্যা- √দা- √দো) কেবল উচ্চ এবং নিম্ন কাণ্ডে ভাগ করা যথেষ্ট নয়। একেকটি বাংলা ধাতুর বৈচিত্র্য তার চেয়ে অনেক বেশি হতে পারে।

৪। ধাতুর উচ্চারণ বোঝানো নিতান্ত প্রয়োজন যদি হয়, ধাতুকে দ্বি-কাণ্ডে বিভক্ত করার বদলে লিপি-সংস্কারের কথা ভাবা যেতে পারে। /æ/ উচ্চারণ বোঝানোর জন্য পলাশ বরন পাল প্রস্তাবিত[১৪] 'পেট-কাটা এ' গ্রহণযোগ্য সমাধান হতে পারে। তাতে ধাতুর দুই রূপের ব্যুৎপত্তি, অভিধানে অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি বিভ্রান্তি থাকে না, আবার উচ্চারণও স্পষ্টীকৃত হয়।

অ-বাংলাভাষীরা— বিশেষত বিদেশিরা— বাংলা শেখার সময় স্বরোচ্চতাসাম্যের কারণে ধাতুর উচ্চারণ পরিবর্তন ঘটলে বিভ্রান্ত বোধ করেন। 'পেশা' এবং 'খেলা' একইরকম দেখতে হলেও এদের আদ্য-স্বরধ্বনির উচ্চারণ যে আলাদা, তা বাংলাভাষীরা স্বজ্ঞা (intuition) এবং আজন্মলালিত অভ্যাস থেকে সহজে বুঝতে পারেন। বিদেশিদের বুঝতে সমস্যা হয়। কিন্তু শুধুমাত্র তাঁদের সুবিধার কথা ভেবে বাংলা ভাষায় দু'রকম ধাতুকে স্বীকৃতি দেওয়া অপ্রয়োজনীয়। ধাতুর উচ্চ- এবং নিম্ন-কাণ্ডের তত্ত্ব বিদেশিদের ভাষা শেখানোর প্রয়োজনে বিদেশিদের দ্বারা পরিপোষিত তত্ত্ব। বাংলার নিজস্ব ব্যাকরণ এবং বানানের আলোচনায় ধাতুর বানান পরিবর্তন পরিত্যাজ্য।

ধাতুমূলের উচ্চারণে বাংলায় বেশ কয়েক রকমের ধ্বনি পরিবর্তন লক্ষ করা যায় –

ক. অ - ও: /kɔre/ - /kori/, /hɔe̯ / - /hotam/

খ. এ - অ্যা: /dek^{h}tam/ - /dæk^{h}e/

গ. এ -ই- অ্যা: /lek^{h}e/ - /lik^{h}i/ - /læk^{h}e/ (আঞ্চলিক প্রয়োগ)

ঘ. ও- উ: /ʃone/ - /ʃuni/

ঙ. ই- এ- ও- অ্যা- আ: /dilam/ - /debo/ -/dobo/ - /dæe̯ /- /dalam/

উপরে, সচেতনভাবেই, অনুজ্ঞাভাবের ক্রিয়াপদ উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়নি। সেগুলির বানান পরে আলোচিত হয়েছে। খ-ঙ উদাহরণ তথা ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ধাতুমূলে ব্যবহৃত স্বরস্বনিম পালটে যাওয়া অনিবার্য। 'শোনে' এবং 'শুনি' আলাদা স্বনিম এবং আলাদা বানান। কিন্তু প্রথম উদাহরণের ক্ষেত্রে 'হয়' এবং 'হতাম' ক্রিয়াপদের আদ্য স্বরস্বনিম আলাদা হলেও 'হোতাম', 'হোলো', 'কোরি' ইত্যাদি বানান পরিত্যাজ্য। এই সিদ্ধান্তের পিছনের যুক্তি ব্যাকরণগত নয়, সামাজিক।

---

[১২] পূর্ববঙ্গের উচ্চারণ (দাস ১০৬৬)।

[১৩] রাঢ়বঙ্গের আঞ্চলিক উচ্চারণ।

[১৪] এই প্রস্তাব সম্পর্কে বিস্তাতির আলোচনা এখানে পাওয়া যাবে— (পাল, *আ মরি বাংলা ভাষা* ২৪-২৭)

বাংলা ভাষায় ৭টি স্বরস্বনিম (ই, উ, এ, অ, অ্যা, অ, আ) এবং ৪টি অর্ধস্বর (ই̯, উ̯, এ̯, ও̯) রয়েছে (ইসলাম এবং সরকার ৬৭-৭৫)। এরা পরে থাকলে অ-ধ্বনিযুক্ত ধাতুর উচ্চারণ কীভাবে পালটে যায়, তা নীচের সারণিতে দেখানো হল:

ক্রমিক সংখ্যা	পরে অবস্থিত স্বরধ্বনি/ অর্ধস্বর	ক্রিয়াপদের উচ্চারণ
১	i	/kori/
২	u	/korun/
৩	e	/kɔre/
৪	o	/korbo/
৫	æ	/kɔræ/[১৫]
৬	ɔ	অনুপস্থিত
৭	a	/kɔrabo/
৮	i̯	/koi̯ /
৯	u̯	অনুপস্থিত
১০	e̯	/ kɔe̯ /
১১	o̯	/kɔo̯/

সারণি ৩.৪: অ-কার যুক্ত ধাতুর বিভিন্ন উচ্চারণ

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, আলোচ্য ১১টি ক্ষেত্রের মধ্যে চারটি ক্ষেত্রে মাত্র ধাতুমূলের অ-ধ্বনির উচ্চারণ হচ্ছে ও। অর্থাৎ, পূর্বোক্ত 'ক'-চিহ্নিত উদাহরণে সামাজিক যুক্তি দেখিয়ে আমরা যে-ব্যতিক্রমের প্রস্তাব দিয়েছি, তা মাত্র ৩৬% ক্ষেত্রের বানানকে উচ্চারণ-অনুগ হতে বাধা দিচ্ছে। বাস্তবে এই পরিসংখ্যান আরেকটু সংশোধনের অপেক্ষা রাখে। বাংলাভাষীর স্বাভাবিক বোধে ই/উ পরে থাকলে স্বরোচ্চতাসাম্যের কারণে অ-ধ্বনি ও-ধ্বনিতে পরিণত হওয়া নতুন কোনো ঘটনা নয়। ঘড়ি, সরু ইত্যাদি অতৎসম শব্দ হলেও এদের আদি স্বরধ্বনি নিশ্চয়ই কেউ 'অ' উচ্চারণ করেন না। আলোচ্য সারণিতে ক্রিয়াপদের দ্বিতীয় স্বরধ্বনি হিসাবে ই, উ (পূর্ণ বা অর্ধস্বররূপে) রয়েছে তিনটি ক্ষেত্রে। এই সংশয়াতীত ও-উচ্চারণের ক্ষেত্রগুলিকে বাদ দিলে বিভ্রান্তির অবকাশ থেকে যায় কেবল একটি ক্ষেত্রে: অ - ও (করব)। এখানে উচ্চারণকে প্রাধান্য দিয়ে ধাতুর বানান 'কোর্' লিখলে,

[১৫] "লাউসেনে এখনি খালাস **কর্য্যা** দেও। এত শুনি পোতা- মাজী করিল গমন।" -ধর্মমঙ্গল (নরসিংহ)-১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দ, বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান থেকে পুনরুদ্ধৃত। https://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/app_test/dasa_query.py?page=1386, দেখা হয়েছে: ১৫/০৩/২০২১

"দূতী লো গিরে **চল্যা** যাও।"-পূর্ববঙ্গ-গীতিকা, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান থেকে পুনরুদ্ধৃত https://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/app_test/dasa_query.py?page=674, দেখা হয়েছে: ১৫/০৩/২০২১

সমতাবিধানের স্বার্থে পুরুষ-বিভক্তিকেও অ-এর বদলে ও-রূপে চিহ্নিত করতে হয়। ফলে ক্রিয়াপদের বানান হয়ে যাবে 'কোরবো', 'হোলো', 'হোতাম' ইত্যাদি। এতে দু'ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হবে—

প্রথমত, বিবৃতিবাচক ক্রিয়াপদের পুরুষ-বিভক্তি ও-এর বদলে অ বিবেচনা করলে লেখার ক্ষেত্রে শ্রমের সুরাহা হয়। শব্দান্তে অ-উচ্চারণ সাধারণত বাংলা ভাষায় নেই। এই স্বাভাবিকতাকে স্বীকৃতি দিয়ে ও-কার বর্জন করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, পুরুষ-বিভক্তির ক্ষেত্রে -অ এবং -ও যথাক্রমে বিবৃতিবাচক এবং অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়া দরকার। নচেৎ 'তুমি কর' (বিবৃতি) এবং 'তুমি করো' (অনুজ্ঞা) বাক্যের ফারাক বোঝা যাবে না।

সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, ফার্গুসন এবং অন্যান্যরা অ-ব্যাকরণগত কারণে বাংলা ধাতুর দ্বি-কাণ্ড বিভাজনের প্রস্তাব করেছিলেন। সেই প্রস্তাব কেন গ্রহণযোগ্য নয়, তা ইতোপূর্বে আমরা ব্যাখ্যা করেছি। উচ্চারণ অনুযায়ী ধাতুর বানান পালটে যাওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। তবে কেবল একটিমাত্র ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের বিপক্ষে আমরা অভিমত জ্ঞাপন করেছি — সেটিও সামাজিক স্তরে ভাষা ব্যবহারের সময় শ্রমের সুরাহার কারণে।

৩.৪ অতীতবাচক বিভক্তির বানান প্রসঙ্গে

বাংলায় অতীতকালের বিভক্তি -ত, -ইত এসেছে সংস্কৃত নিষ্ঠা প্রত্যয় থেকে (সেন ২৩২)। এই যুক্তিতে কাল-বাচক বিভক্তি -ত, -ইত স্বরান্ত হওয়া উচিত। -ল, -ইল বিভক্তির মূলেও রয়েছে নিষ্ঠা প্রত্যয় (মজুমদার, *বাঙলা ভাষা পরিক্রমা* ৩৬১)—

-ই (ত) (সং)> -ই (অ) + -ইল/ -অল [< -ল (প্রা ভা আ)] > *-ই (অ) + -ইল্ল/ -এল্ল/ -অল্ল (ম ভা আ, অন্ত্যপর্ব)> -ইল (ন ভা আ)

উদা: চলিত (সং)> চলিঅ (প্রা) > *চলিল্ল (=*চলিঅ+ -ইল্ল, মাগধী অপ.)> চলিল (বাং)

সংস্কৃতে -লচ্ (ল) তদ্ধিতপ্রত্যয়। এর মূল কাজ ছিল ক্ষুদ্রতাদ্যোতক (উদা: মক্ষিকালঃ= মৌচাক) এবং বিশেষণাত্মক (উদা: শীতলঃ, বাতুলঃ)। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'diminutive or adjectival affix' (Chatterji 940–41)। এই -ল প্রত্যয় মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার আদিপর্বে এসে -(ই)ত প্রত্যয়জাত -ই(অ) প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। কেন এই সংযোগ ঘটল? পরেশবাবুর ব্যাখ্যা— মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রথম স্তরেই অতীতকালের তিঙন্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার কমে এসেছিল। পরিবর্তে, অতীতের পদগুলি হল নিষ্ঠান্ত (যেমন: গত, চলিত)। এই নিষ্ঠান্ত পদগুলি বিশেষণের মতো ব্যবহার করা যায়। যেমন: গত জন্ম, চলিত বাংলা। তাই নিষ্ঠান্ত বিশেষণের সঙ্গে বিশেষণাত্মক লচ্-প্রত্যয় সহজেই যুক্ত হতে পেরেছিল। এই ব্যাখ্যা মেনে নিয়ে সুকুমার সেনও -ল/ইল প্রত্যয়কে 'ক্রিয়াপদে বিশেষণস্থানীয়' বলে অভিহিত করছেন (সেন ২৩৪) ।

বাংলায় অতীত কালের মূল প্রত্যয় -ত/-ইত। -ত নিষ্ঠা প্রত্যয় তথা কৃৎ প্রত্যয়। -ল/-ইল ব্যুৎপত্তিগতভাবে তদ্ধিত প্রত্যয় হওয়া সত্ত্বেও বাংলায় ধাতুর পর যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠন করে। ব্যুৎপত্তির দিক থেকে –(ই)ত/-(ই)ল বিভক্তির স্বরান্ত বানান হওয়া উচিত। কিন্তু বাংলা ক্রিয়াপদের গঠনে সন্ধির নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হলে কাল-বিভক্তির বানান ব্যঞ্জনান্ত না-লিখে উপায় নেই। একই যুক্তিতে, প্রকার-বিভক্তির বানানও ব্যঞ্জনান্ত হবে। কিন্তু পুরুষ-বিভক্তির বানান স্বরান্ত লেখা শ্রেয়। তাতে প্রত্যেকটি রুদ্ধদলান্ত উচ্চারণের

ক্রিয়াপদের (যেমন: করলাম, দিলেন) শেষে হস্-চিহ্ন দেওয়ার সমস্যার মীমাংসা ঘটবে। এই নিয়ম কেবল বিবৃতিবাচক রুদ্ধদলান্ত ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অনুজ্ঞার ক্ষেত্রে কখনও কখনও হস্-চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

স্বরান্ত ক্রিয়াপদের বানানে মধ্যম পুরুষের বিভক্তির কথা আলাদাভাবে বিবেচ্য। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে, অ-কারান্ত ধাতুর উচ্চারণ পালটে গেলেও বানানে ও-কার পরিত্যাজ্য। বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণের কথা মাথায় রেখে মধ্যম পুরুষের বিভক্তিও অ-লেখা উচিত। তাই, 'করব', 'গেল'; 'করবো', 'গেলো' নয়।

৩.৫ অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের বানান

পূর্ববর্তী অংশে বিবৃতিবাচক ক্রিয়াপদের বানান সম্পর্কে আলোচনার পর এবার অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের বানান সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। এই প্রস্তাব প্রণয়নের সময় নজরে রাখতে হবে, বানানের মাধ্যমেই বাগর্থের অনুধাবন যেন ঘটে। অর্থাৎ, বানান দেখেই বিবৃতিবাচক এবং অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের ফারাক চেনা যাবে। বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক বিবর্তনের সঙ্গে প্রস্তাবিত বানানের সংগতি থাকতে হবে। তা ছাড়া, বানানের নিয়মে জটিলতা যথাসাধ্য পরিহার করতে হবে, যাতে তা সাধারণ্যে ব্যবহার্য হিসাবে গৃহীত হতে পারে। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা মূলত যে-সংশয়গুলির মীমাংসা করতে চাইছি —

- অনুজ্ঞার ক্রিয়াপদে হস্-চিহ্ন কীভাবে ব্যবহৃত হবে?
- ধাতুমূলের বানান পরিবর্তন কোন্ নিয়মানুসারে হবে?
- অনুজ্ঞার ক্রিয়াপদের অন্তর্গত শ্রুতিধ্বনির বানান কীভাবে লেখা হবে?

প্রথমেই বুঝে নেওয়া দরকার, অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের বানান নির্ণয় কোনো বিচ্ছিন্ন শব্দের মতো ব্যাকরণগত প্রতর্কের বিষয় নয়। বরং অন্যান্য অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এর বানান নির্ণয় করতে হবে। অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের বানান সম্পর্কে আমাদের প্রস্তাব পেশ করার আগে এই বানান প্রথাসিদ্ধভাবে এতদিন কী লেখা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা দরকার। তারপরেই একমাত্র ব্যাকরণগতভাবে এই বানান কী হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেতে পারে।

অনুজ্ঞা ভাবে (imperative mood) আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ ইত্যাদি বোঝায়। বাংলায় অনুজ্ঞা ক্রিয়াপদ কেবল বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালে হতে পারে। অতীতে কাউকে আদেশ করা সম্ভব নয়। উত্তম পুরুষেও অনুজ্ঞা ভাব হয় না। কারণ, নিজেকে নিজে কেউ আদেশ করতে পারে না। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা দুটি ধাতুর অনুজ্ঞাবাচক ভাবের সম্ভাব্য বানানগুলি দেখাব। একটি ধাতু স্বরান্ত, অন্যটি ব্যঞ্জনান্ত। এদের বিভিন্ন ক্রিয়ারূপের মাধ্যমে অনুজ্ঞার বানানে জটিলতার স্বরূপ উন্মোচন করা যেতে পারে। মধ্যম এবং প্রথম পুরুষের অনুজ্ঞা ভাবের ক্রিয়ারূপগুলি বর্তমান কালে নিম্নরূপ—

	√যা	√কর্
মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছার্থে)	(তুই) যা	কর/ কর্
মধ্যম পুরুষ (সাধারণার্থে)	(তুমি) যাও	কর/ করো
মধ্যম পুরুষ (সম্মানার্থে)	(আপনি) যান/ যান্	করুন/ করুন্
প্রথম পুরুষ (সাধারণার্থে)	(সে) যাক/ যাক্	করুক/ করুক্
প্রথম পুরুষ (সম্মানার্থে)	(তিনি) যান/ যান্	করুন/ করুন্

সারণি ৩.৫: বিভিন্ন পুরুষে অনুজ্ঞাভাবের ক্রিয়াপদের সম্ভাব্য বানান

লক্ষণীয়, ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর (কর্) ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বিকল্প বানান বিষয়ে সংশয় হতে পারে। স্বরান্ত ধাতুর (√যা) ক্ষেত্রে অবশ্য মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থে এবং সাধারণার্থে কোনো জটিলতা বা সংশয় নেই। বিকল্প বানানগুলির মধ্যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার আগে, অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের বানান প্রথাগতভাবে এতদিন কী প্রচলিত ছিল, তা দেখে নেওয়া দরকার—

১। রবীন্দ্রনাথ অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের বানানে কখনও কখনও হস্-চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। যেমন, 'বাংলাভাষা পরিচয়' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে 'দেখা যাক্' বানান পাওয়া যায় (চিত্র ৩.১ দ্রষ্টব্য)[১৬]।

[১৬] Rabindra-Bhavana Archives, Visva-Bharati. Rabindranath Tagore's manuscript. Accession No: Ms 176(ii), Title: বাংলা ভাষা পরিচয়। বিচিত্রা ওয়েবসাইটে চিত্র ৩৩/৭৪ http://bichitra.jdvu.ac.in/manuscript/manuscript_viewer.php?manid=219&mname=RBVBMS_176%28i%29 , দেখা হয়েছে ১৯/০৩/২০২১, পাণ্ডুলিপি-চিত্রে চিহ্নিতকরণ বর্তমান নিবন্ধকার-কৃত।

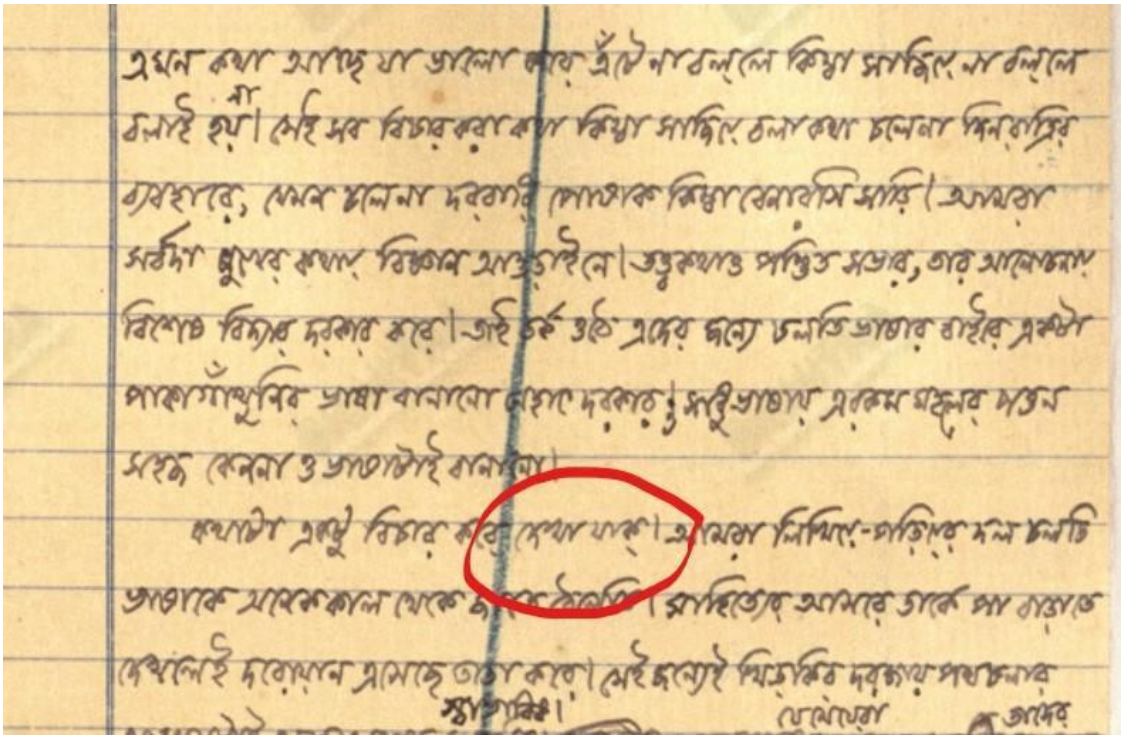

চিত্র ৩.১: রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদে হস্-চিহ্নের দৃষ্টান্ত

আবার একই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ অনুজ্ঞাবাচক শব্দের হস্-চিহ্নহীন বানানও লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন উঠুক, করুক; অথচ নিক্, ফেলুক্। আবার লিখছেন যাক্, থাক্; অথচ হোক, দিক (চিত্র ৩.২ দ্রষ্টব্য)[১৭]--

[১৭] Rabindra-Bhavana Archives, Visva-Bharati. Rabindranath Tagore's manuscript. Accession No: 176(iii), Title: বাংলা ভাষা পরিচয়, মুক্তির উপায়। বিচিত্রা ওয়েবসাইটে চিত্র ৫/৭০ http://bichitra.jdvu.ac.in/manuscript/manuscript_viewer.php?manid=221&mname=RBVBMS_176%28iii%29, দেখা হয়েছে: ১৯/০৩/২০২১

(পাদটীকা ১৬ এবং ১৭-এর পাণ্ডুলিপি-চিত্র সংগৃহীত হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈদ্যুতিন রবীন্দ্র-রচনাসম্ভার 'প্রোজেক্ট বিচিত্রা' থেকে)

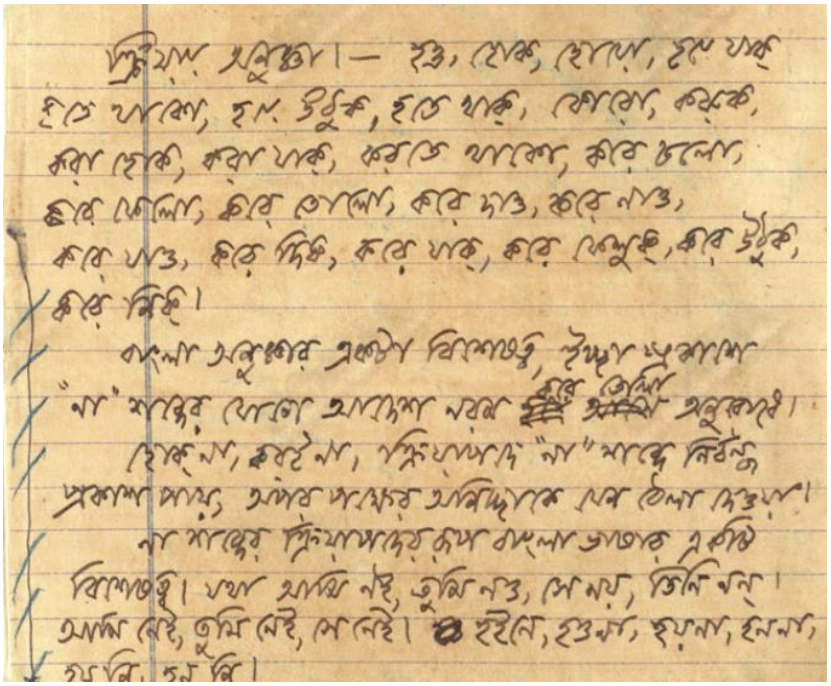

চিত্র ৩.২: রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে অনুজ্ঞার বানানে অসাম্য

সামগ্রিকভাবে তিনি অনুজ্ঞাবাচক শব্দের বানানে হস্-চিহ্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলেননি। এমনকি, পাণ্ডুলিপির একই পৃষ্ঠায় কখনও হস্-চিহ্নযুক্ত, কখনও বা হস্-চিহ্নহীন অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদ দেখা যাচ্ছে।

২। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকেও অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের বানান সম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* গ্রন্থে পাই (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার ৩২৭)—

ক. মধ্যম পুরুষে ব্যবহার্য 'প্রত্যয়' সারণিতে -উন (আপনি করুন) হস্-চিহ্নহীন বানান পাওয়া যাচ্ছে।

খ. একই পৃষ্ঠায় সারণির নীচে প্রত্যয়ের আলোচনার সময় -উন্ হস্-চিহ্নযুক্ত।

গ. উদাহরণ ব্যাখ্যার সময় 'বসুন' শব্দে কিন্তু হস্-চিহ্ন দেওয়া হচ্ছে না।

ঘ. একই পৃষ্ঠায় আলোচিত মধ্যম পুরুষের প্রত্যয় -ইস্ (তুই করিস্) হস্-চিহ্নযুক্ত। প্রথম পুরুষের প্রত্যয় -উক্ (সে যাউক্ >সে যাক্, সে করুক্) হস্-চিহ্নযুক্ত।

ODBL-এ কিন্তু আবার -উক প্রত্যয়বিশিষ্ট শব্দগুলি হস্-চিহ্ন না-দিয়েই লেখা হচ্ছে (Chatterji 907)। উদা: জাউক, পাউক, হউক, দেউক। একই পৃষ্ঠায় ক্রিয়াপদের চলিত রূপগুলিতে কিন্তু হস্-চিহ্ন দেওয়া হচ্ছে: যাক্, খাক্, নিক্, দিক্।

ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ গ্রন্থে লেখা হয়েছিল, -ইস্। অথচ ODBL-এ লেখা হচ্ছে 'চলিস' (Chatterji 908)। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের বানানে, ঠিক রবীন্দ্রনাথের মতোই, কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলেননি। একই বইয়ের একই পৃষ্ঠার মধ্যেও কখনও হস্-চিহ্ন ব্যবহৃত হচ্ছে, কখনও-বা বর্জিত হচ্ছে।

৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধিতে অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে কেবল মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থে বর্তমান কালে হস্-চিহ্ন ব্যবহার করা হচ্ছে (মজুমদার, *বাঙলা বানান বিধি* ১০২-০৭)। যেমন: কর্, কাট্, লেখ্। কিন্তু মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থে ভবিষ্যৎ কালে হস্ ব্যবহৃত হচ্ছে না। যেমন: করিস, কাটিস। প্রথম পুরুষেও হস্ ব্যবহৃত হচ্ছে না। যেমন: উঠুক, উঠুন, কাটুন, লিখুন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত নিয়ম অপেক্ষাকৃত সুসংহত। এই বানানবিধির সমস্যা হল— ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞায় হস্-চিহ্ন ব্যবহার না-করায় এই দুটি বাক্যের অর্থের পার্থক্য বোঝা যাবে না:

বিবৃতিবাচক: তুই সকালে পড়তে বসিস।

অনুজ্ঞাবাচক: তুই সকালে পড়তে বসিস্!

এখানে মনে হতে পারে, বিস্ময়বোধক চিহ্ন অনুজ্ঞাবাচক বাক্যকে চিনতে সাহায্য করছে। কথাটি আংশিক সত্য। ক্রিয়াপদের বানান থেকে বিবৃতিবাচক নাকি অনুজ্ঞা বোঝার কোনো উপায় না-থাকলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। নমুনা হিসাবে নীচের বাক্যটি দেখা যেতে পারে—

তুই সকালে পড়তে বসিস, আমি দুপুরে তোর বাড়ি আসব।

এখানে নিম্নরেখ অংশটির দু'রকম অর্থ হতে পারে—

ক. তুই প্রত্যহ সকালে পড়তে বসিস, তাই আমি দুপুরে আসব।

খ. বক্তা আদেশ করছেন সকালে পড়তে বসতে এবং জানাচ্ছেন যে দুপুরে আসবেন। অর্থাৎ, মিশ্র বাক্যের প্রথম অংশটি অনুজ্ঞাবাচক, দ্বিতীয় অংশটি বিবৃতিবাচক।

যতিচিহ্ন থেকে এখানে ক এবং খ-এর মধ্যে অর্থের পার্থক্য করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে বাক্যের প্রথমাংশ বিবৃতিবাচক হলে সংযোগকারী উপাদান হিসাবে "সেক্ষেত্রে" বা "তাহলে" ব্যবহার করা উচিত। এই ধরনের বিরল প্রয়োগ বানাননীতি নির্মাণের সময় বিবেচ্য নয়।

৪। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থে বর্তমান কালে এবং ভবিষ্যৎ কালে হস্-চিহ্ন ব্যবহারের পক্ষপাতী— "তুচ্ছার্থক বর্তমান অনুজ্ঞা বোঝাতে ক্রিয়ার শেষ ব্যঞ্জনে হস্ চিহ্ন: তুই পড়্। ... ক্রিয়াটি তুচ্ছার্থ হলে, পড়িস্" (সরকার প্রমুখ ৫৫৫-৫৬)।

অর্থাৎ, বর্তমান: তুই পড়্। ভবিষ্যৎ: তুই পড়িস্।

মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থ ব্যতিরেকে অন্যত্র অনুজ্ঞায় আকাদেমি হস্-চিহ্ন ব্যবহার করছেন না। উদা: হোন, বসুন।

৫। অধ্যাপক পবিত্র সরকার যাক এবং যাক্ উভয় বানানকেই স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষপাতী। তাঁর যুক্তি[১৮], "যাকো" বলে যেহেতু কোনো শব্দ নেই, তাই হস্-চিহ্ন না-দিলেও উচ্চারণ ভুলের সম্ভাবনা নেই।

[১৮] বর্তমান নিবন্ধকারকে অধ্যাপক সরকার টেলিফোন-আলাপে এই যুক্তি জানিয়েছিলেন। এই বক্তব্য বিভিন্ন গ্রন্থে প্রস্তাবিত তাঁর ন্যূনতামূলক (minimalist) বানাননীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের বানানের ক্ষেত্রে বাংলায় এতদিন পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট বিধি প্রণীত হয়নি। এই পরিস্থিতিতে বাংলা অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের বানান কেমন হওয়া উচিত, সে বিষয়ে আমাদের ব্যক্তিগত কিছু প্রস্তাব নীচে পেশ করা হল। প্রত্যেকটি প্রস্তাবের সঙ্গে সম্ভাব্য যুক্তি-প্রতিযুক্তিও ব্যাখ্যা করা হয়েছে —

১। মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থে বর্তমান কালে অনুজ্ঞায় হস্-চিহ্ন দিতে হবে। উদা: তুই পড়্। চিঠি লেখ্।

যুক্তি: এই হস্-চিহ্ন না দিলে মধ্যম পুরুষ সাধারণার্থে বর্তমান কালে বিবৃতিবাচক ভাবের ক্রিয়াপদের সঙ্গে বানানের পার্থক্য করা যাবে না। যেমন:

চিঠি লেখ = (তুমি) চিঠি লেখ (নিয়মিত অভ্যাস, বিবৃতিবাচক বাক্য)

চিঠি লেখো = সাধারণার্থে অনুজ্ঞা

চিঠি লেখ্ = তুচ্ছার্থে অনুজ্ঞা

২। মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থে ভবিষ্যৎ কালে অনুজ্ঞায় হস্-চিহ্ন দেওয়ার দরকার নেই। উদা: তুই পড়িস! চিঠি লিখিস!

যুক্তি: এখানে হস্-বিহীন "চিঠি লিখিস" নিয়মিত অভ্যাস বোঝাচ্ছে (বিবৃতিবাচক ভাব) নাকি আদেশ করা হচ্ছে, তা ক্রিয়াপদের বানান থেকে বোঝা যাচ্ছে না। তবু আমরা এখানে হস্-বর্জন করে বিস্ময়বোধক যতিচিহ্ন ব্যবহারের পক্ষপাতী। নীচে তার পাঁচ দফা যুক্তি দেখানো হল —

ক. লিখিস (বিবৃতিবাচক) এবং লিখিস্ (অনুজ্ঞাবাচক)— দুটি ক্রিয়াপদের বানান আলাদা লিখলে এদের ব্যুৎপত্তিও আলাদা হয়ে যাবে। লিখিস= √লিখ্ + ইস। এখন অনুজ্ঞা বোঝাতে লিখিস্ বানানকে স্বীকৃতি দিলে -ইস্ বিভক্তিকেও মেনে নিতে হয়। -ইস এবং -ইস্ কি আলাদা বিভক্তি? একই উচ্চারণ— অথচ এদের ভিন্ন রূপকে স্বীকৃতি দিতে হচ্ছে। এখানে হস্-বর্জন করলে বিভক্তিগত এই সমস্যা তৈরি হয় না।

খ. জনগণের অভ্যাসে বানান সর্বদা বাহুল্য বর্জন করে সরল হওয়ার পথে এগোয়। পৃথক্, সম্রাট্, বণিক্ ইত্যাদি শব্দে সংস্কৃত ব্যাকরণমতে হস্-চিহ্ন থাকলেও বাঙালির লিখন-অভ্যাসকে স্বীকৃতি দিতে সেই হস্ বর্জিত হয়েছে। করব, করল বানানের অন্ত্য-ব্যঞ্জনে ও-কার বর্জিত হয় একই কারণে— বানানের গতিপথ সারল্যের দিকে। এই সামাজিক অভ্যাসের কথা মাথায় রাখলে হস্-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করাই শ্রেয়।

গ. যদি তর্কের খাতিরে হস্-চিহ্ন ব্যবহার মেনেও নেওয়া হয়, তবু কিন্তু মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থে ভবিষ্যৎ কালে অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের বানান থেকে যাবতীয় বিভ্রান্তি দূর হয়ে যায় না। যেমন:

আগামীকাল ওডিবিএল পড়বি!

"পড়বি" ক্রিয়াপদ এখানে যে অনুজ্ঞা বোঝাচ্ছে, তা হস্-চিহ্ন ব্যবহার করে বোঝানোর কোনো উপায় নেই। বিবৃতিবাচক ভাবের থেকে আলাদা করার জন্য এখানে বিস্ময়বোধক চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। অনুজ্ঞা বোঝানোর জন্য যখন সেই বিস্ময়বোধক চিহ্নের শরণাপন্ন হতেই হচ্ছে, তখন হস্-বর্জন করা সংগত।

ঘ. বিস্ময়বোধক চিহ্ন ব্যবহার করলেও এই সমস্যা সম্পূর্ণ মেটে না। নীচের বাক্যটি লক্ষণীয়:

আপনি কাজটি করবেন!

এই বাক্যের মানে দু'রকম হতে পারে —

- আপনাকে ভবিষ্যতে কাজটি করতে আদেশ করা হচ্ছে। অনুজ্ঞাবাচক অর্থে বিস্ময়বোধক চিহ্ন।
- বক্তা বিস্মিত যে, আপনি কাজটি করবেন। এটি বিস্ময়বোধক বিবৃতিবাচক বাক্য।

তবু আমরা হস্-চিহ্নের বদলে বিস্ময়বোধক চিহ্ন ব্যবহার করে অনুজ্ঞা বোঝানোর পক্ষপাতী। তাতে অন্তত নতুন বিভক্তি তৈরির সমস্যা থাকে না। তা ছাড়া, আরেকটু গভীরে গিয়ে বিবেচনা করলে, "আপনি কাজটি করবেন" — এটি বিবৃতিবাচক বাক্য হবে নাকি অনুজ্ঞাবাচক, তা নির্ভর করছে বক্তার কণ্ঠভঙ্গির ওপর। ঠিক যেমন "তুমি খাবে।" আর "তুমি খাবে?" আলাদা হয়ে যায় কণ্ঠভঙ্গির ভিত্তিতে। এই উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য (ভাষাবিজ্ঞানে যাকে বলে অধিধ্বনি বা supra-segmental feature), বোঝানো হয় কীভাবে? প্রশ্নবাচক কণ্ঠভঙ্গি বোঝাচ্ছে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। "খাবে" বানান পালটে যায়নি। একইভাবে, "আপনি কাজটি করবেন"— এই বাক্য কণ্ঠভঙ্গির ওপর নির্ভর করে বোঝা যাবে বিবৃতিবাচক নাকি অনুজ্ঞা এবং সেই কণ্ঠভঙ্গি বানান দিয়ে না-বুঝিয়ে, বিস্ময়বোধক চিহ্ন ব্যবহার করে বোঝানোই সংগত।

ঙ. হস্-চিহ্ন বাংলা এবং নাগরী লিপিতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাংলা ভাষা যদি অন্য কোনো লিপিতে লেখা হয়, তাহলে ক্রিয়াপদে হস্-চিহ্ন ব্যবহার করে অনুজ্ঞা ভাব বোঝানো সেই লিপিতে সম্ভব হবে না। যেমন রোমক লিপিতে যদি লেখা হয় "Chithi likhis", তাহলে "likhis" বলতে বিবৃতিবাচক "লিখিস" বা অনুজ্ঞাবাচক "লিখিস্" উভয়ই বোঝাতে পারে। তার চেয়ে "Chithi likhis!" লিখলে অনুজ্ঞাবাচক ভাব নিঃসংশয়ে বোঝা যায়।

বিস্ময়বোধক চিহ্ন শুধুই বিস্ময় বোঝাতে ব্যবহৃত হয় না। এর অন্য একাধিক কাজও রয়েছে — সম্বোধন বোঝানো, ইচ্ছা বা কামনা প্রকাশ, তিরস্কার, প্রার্থনা ইত্যাদি ব্যক্ত করা (ভট্টাচার্য, সুভাষ ৬২-৬৪)। আমাদের প্রস্তাবে বিস্ময়বোধক চিহ্নকে আরেকটি নতুন দায়িত্ব অর্পণ করা হচ্ছে— অনুজ্ঞাবাচক ভাব প্রকাশ করা।

৩। মধ্যম পুরুষ সাধারণার্থে বর্তমান কালে অনুজ্ঞায় ও-কার দিতে হবে।

উদা: তুমি পড়ো। চিঠি লেখো।

মধ্যম পুরুষ সাধারণার্থে বিবৃতিবাচক ভাবের ক্রিয়াপদের উচ্চারণ ও-কারান্ত (তুমি পড়, তুমি লেখ) হলেও বানানে ও-কার দেওয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ, বাক্যের ভাব অনুযায়ী মধ্যম পুরুষে দু'ধরনের বিভক্তি ব্যবহারের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। বিবৃতিবাচক হলে -অ বিভক্তি, অনুজ্ঞাবাচক হলে -ও বিভক্তি।

যুক্তি: তুমি নিয়মিত পড় (বিবৃতিবাচক) নাকি পড়তে আদেশ করা হচ্ছে (পড়ো)— তা বানান থেকে স্পষ্ট হওয়া দরকার।

৪। মধ্যম পুরুষ সাধারণার্থে ভবিষ্যৎ কালে অনুজ্ঞায় রুদ্ধদলান্ত ধাতুর (√কর্, √চল্) উভয় দলেই ও-কার দিতে হবে। এক্ষেত্রে ধাতুর বানান পালটে যাবে। তবে এর ভিত্তিতে দ্বি-কাণ্ড ধাতুর তত্ত্ব উত্থাপন না-করাই শ্রেয়। ৩.৩ উপ-অধ্যায়ে তার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

উদা: তুমি আগামীকাল পোড়ো। তুমি আগামীকাল কাজটি কোরো।

যুক্তি: ক্রিয়াপদের উভয় দলেই ও-কার না-দিলে বর্তমান কালের অনুজ্ঞার সঙ্গে ফারাক থাকবে না। যেমন: তুমি এক্ষুনি বইটি পড়ো। তুমি আগামীকাল বইটি পোড়ো।

মধ্যম পুরুষ সাধারণার্থে ভবিষ্যৎ কালে অনুজ্ঞা আরেকভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। যেমন: "তুমি আগামীকাল পড়বে"— এখানে বিবৃতিবাচক ভাবে "পড়বে" ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করা হচ্ছে নাকি পড়তে আদেশ দেওয়া হচ্ছে, তা ক্রিয়াপদের বানান দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই। এইসব ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি এড়াতে অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে বিস্ময়বোধক চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে।

৫। মধ্যম পুরুষ সম্ভ্রমার্থে বর্তমান কালে অনুজ্ঞায় হস্-চিহ্ন ব্যবহার করা হবে না। উদা: আপনি লিখুন/ পড়ুন/ যান/ খান!

যুক্তি: ধাতু রুদ্ধদলান্ত হলে বিভ্রান্তির কোনো অবকাশ নেই। আপনি লেখেন/ পড়েন (বিবৃতিবাচক বর্তমান) এবং আপনি লিখুন/পড়ুন (অনুজ্ঞাবাচক বর্তমান) সম্পূর্ণ আলাদা বাক্য। স্বরান্ত ধাতুর ক্রিয়াপদে কিন্তু বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে। যেমন: আপনি যান— এর মানে কী? আপনি নিয়মিত যান (বিবৃতিবাচক) নাকি আপনাকে যেতে বলা হচ্ছে (অনুজ্ঞাবাচক)? এই বিভ্রান্তি নিরসন করবে বিস্ময়বোধক চিহ্ন। হস্ ব্যবহার করলে কী সমস্যা, তা ইতোমধ্যে আলোচিত (প্রস্তাব ২-এর যুক্তি ক-ঙ)।

৬। মধ্যম পুরুষ সম্ভ্রমার্থে ভবিষ্যৎ কালে অনুজ্ঞায় হস্-চিহ্ন ব্যবহার করা হবে না।

যুক্তি: "আপনি কাজটি করবেন/ করবেন্" — দু'রকম বানান লিখলে দুটি বিভক্তি আনতে হয়: এন/এন্।

মধ্যম পুরুষ সম্ভ্রমার্থে ভবিষ্যৎ কালে বঙ্গালি উপভাষায় আলাদা কিছু ক্রিয়াপদ পাওয়া যায়। উদা: আপনি যেয়েন/ দিয়েন। এখানেও সমতাবিধানের স্বার্থে হস্-চিহ্ন পরিত্যাজ্য ।

৭। প্রথম পুরুষ সম্ভ্রমার্থে বর্তমান কালে অনুজ্ঞায় হস্-চিহ্ন বর্জনীয়। উদা: করুন, যান, খান।

যুক্তি: প্রস্তাব ৫ দ্রষ্টব্য। রুদ্ধদলান্ত ধাতুগুলির ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে বিবৃতিবাচক (তিনি করেন/ বসেন/ হাঁটেন) এবং অনুজ্ঞার রূপ (করুন/ বসুন/ হাঁটুন) সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু স্বরান্ত ধাতুগুলির ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। নীচের বাক্যটি লক্ষণীয়—

গ্রিন টি আমি কেন খেতে যাব, ডাক্তারবাবু খান।

"ডাক্তারবাবু খান" — এই বাক্যের মানে হতে পারে:

ক. আমি গ্রিন টি খেতে অনিচ্ছুক, অথচ ডাক্তারবাবু তা খান। (বিবৃতিবাচক)

খ. ডাক্তারবাবুকে আমি গ্রিন টি খেতে অনুরোধ করছি। (অনুজ্ঞাবাচক)

এই বাক্য অনুজ্ঞা অর্থ বোঝালে বিস্ময়বোধক চিহ্ন দিতে হবে।

৮। প্রথম পুরুষ সম্ভ্রমার্থে ভবিষ্যৎ কালের রূপ বাংলায় নেই।

৯। প্রথম পুরুষ সাধারণার্থে বর্তমান কালে অনুজ্ঞায় হস্-চিহ্ন বর্জনীয়। উদা: যাক, করুক।

যুক্তি: ক. হস্-চিহ্ন না-দিলে এক্ষেত্রে বিভ্রান্তির কোনো অবকাশ নেই। সে যাক (অনুজ্ঞা) এবং সে যায় (বিবৃতিবাচক) সম্পূর্ণ আলাদা বাক্য।

খ. যাউক> যাক। এখানে -উক বিভক্তি প্রাচীন বাংলায় ছিল -উ। এর সঙ্গে পরবর্তীকালে স্বার্থিক প্রত্যয় -ক যুক্ত হয়েছে। সংক্ষেপে এই বিবর্তনের ইতিহাস দেখানো হল—

- প্রাচীন বাংলায় পাওয়া যায়— সো করউ (চর্যাগীতি ২২, অর্থ: সে করুক, অনুজ্ঞাবাচক)। বিভক্তি -অউ/-উ এসেছে সংস্কৃত লোট্ প্রথম পুরুষ একবচনের বিভক্তি -তু থেকে (দাক্ষী ১৭১)।
- আদি-মধ্য বাংলায় -ক অন্ত্যাগম ঘটেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তেজুক, থাকু (<*থাউক) ইত্যাদি -উক বিভক্তিযুক্ত অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদ পাওয়া যায় (Chatterji 903)।
- আধুনিক বাংলায় -উক বিভক্তির বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এখন যাক্ বানান লিখলে তার আগের ধাপেও লিখতে হয় যাউক্। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণে স্বার্থিক প্রত্যয় -ক। তাকে পালটে -ক্ লেখা সংগত নয়।

১০। প্রথম পুরুষ সাধারণার্থে ভবিষ্যৎ কালের রূপ বাংলায় নেই।

১১। মধ্যম পুরুষ সাধারণার্থে শ্রুতিধ্বনির উচ্চারণ বোঝানোর জন্য ও-ব্যবহার করা উচিত।

যুক্তি:

ক. য় ব্যবহার না-করলে অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের ও-বিভক্তির উপস্থিতি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। বস্তুত, বিবৃতিবাচক ক্রিয়াপদে যেহেতু অ-বিভক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে, ও-বিভক্তি থেকে সহজেই ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞাভাব চিনে নেওয়া যায়। উদা:

খেও= খে (<√খা) + ও (পুরুষ-বিভক্তি)

খ. বাংলায় নিম্নগামী দ্বিস্বরধ্বনি অনুপস্থিত (ইসলাম এবং সরকার ৭৬-৮৪)। ফলে দিও, নিও ইত্যাদি বানানে ও-বর্ণটি অর্ধস্বররূপে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। 'এও'-স্বরসমন্বয় অবশ্য দুটি পূর্ণস্বর (/eo/) অথবা একটি পূর্ণস্বর এবং একটি অর্ধস্বরের সমন্বয়রূপে (/eo̯/) উচ্চারিত হতে পারে। তবে কল্পিত বিভ্রান্তি নিরসনের স্বার্থে সহসা য়-এর আগমনের বদলে ও-বিভক্তির পরিচ্ছন্ন রূপ বজায় রাখাই সংগত।

একঝলকে বোঝার সুবিধার জন্য নীচের সারণি দেখা যেতে পারে —

ক্রমিক সংখ্যা	পুরুষ ও কাল	√যা	√কর্
১	মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থ বর্তমান	যা	কর্
২	মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থ ভবিষ্যৎ	যাস অথবা যাবি	করিস অথবা করবি
৩	মধ্যম পুরুষ সাধারণার্থ বর্তমান	যাও	করো
৪	মধ্যম পুরুষ সাধারণার্থ ভবিষ্যৎ	যেও অথবা যাবে	কোরো অথবা করবে
৫	মধ্যম পুরুষ সম্ভ্রমার্থ বর্তমান	(আপনি) যান	(আপনি) করুন
৬	মধ্যম পুরুষ সম্ভ্রমার্থ ভবিষ্যৎ	(আপনি) যাবেন, যেয়েন (উপভাষা)	(আপনি) করবেন
৭	প্রথম পুরুষ সম্ভ্রমার্থ বর্তমান	(তিনি) যান	(তিনি) করুন
৮	প্রথম পুরুষ সম্ভ্রমার্থ ভবিষ্যৎ	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত
৯	প্রথম পুরুষ সাধারণার্থ বর্তমান	যাক	করুক
১০	প্রথম পুরুষ সাধারণার্থ ভবিষ্যৎ	অনুপস্থিত	অনুপস্থিত

সারণি ৩.৬: অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের বানান সম্পর্কিত প্রস্তাব

৩.৬ সিদ্ধান্ত

সামগ্রিকভাবে, বাংলা ক্রিয়াপদের বানান নিম্নলিখিত নীতি মেনে লেখা যেতে পারে—

১। বিভ্রান্তি এড়াতে কেবল মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থে বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় হস্-চিহ্ন ব্যবহৃত হবে (তুই চল্/ কর্)। এখানে কাল- এবং পুরুষ-বিভক্তি শূন্য বিভক্তি বলে বিবেচ্য। অন্য সর্বত্র হস্ বর্জনীয়।

২। অনুজ্ঞাবাচক বাক্য সাধারণত পূর্ণচ্ছেদ দিয়েই শেষ হবে। উদা: তুমি খেও। তবে কোথাও নিতান্ত বিভ্রান্তির অবকাশ থাকলে অনুজ্ঞাবাচক কণ্ঠভঙ্গি বোঝাতে বিস্ময়বোধক চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। উদা: তুই কাল আমার সঙ্গে বাজার যাবি!

৩। মধ্যম পুরুষের বিভক্তি অনুজ্ঞার ক্রিয়াপদের স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। অর্থাৎ, যেয়ো নয়, যেও।

উল্লিখিত প্রস্তাবে যথাসাধ্য হস্-চিহ্ন বর্জন করায়— অধ্যাপক পবিত্র সরকারের ভাষায়— লেখার ক্ষেত্রে 'শ্রমের সুরাহা' হবে। বাংলা বানানের গতি ক্রমশ সারল্যের দিকে বলে অতিরিক্ত চিহ্ন বর্জনের প্রস্তাব সাধারণ্যে

স্বীকৃতি পাবে বলে আশা করা যায়। আবার, কখনও বিভ্রান্তি ঘটলে বিস্ময়বোধক চিহ্নের মাধ্যমে তা নিরসনের উপায়ও বলা থাকল।

বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন বানানবিধিতে স্বল্পালোচিত ক্রিয়াপদের বানানের ওপর আলোকপাত করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা প্রথমে ক্রিয়াপদের রূপতাত্ত্বিক গঠন ব্যাখ্যার জন্য একটি সর্বার্থসাধক (অর্থাৎ, যা সমাপিকা এবং অসমাপিকা উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য) সূত্র পেশ করেছি। তারপর বিবৃতিবাচক ক্রিয়াপদের বানানে দ্বি-কাণ্ড ধাতুর তত্ত্ব মূলত যে বিদেশিদের অসুবিধার কারণে প্রস্তাবিত হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করেছি। এই তত্ত্ব বাতিলের কারণটিও ব্যাকরণগত নয়, সামজিক। 'কোরবো'-জাতীয় বানান না-লেখার মূল যুক্তি: ব্যাবহারিক অসুবিধা। অনুজ্ঞার ক্রিয়াপদের বানানের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করে আমরা সুনির্দিষ্ট বিধির অভাব লক্ষ করেছি। এই সমস্যা দূরীকরণে বর্তমান অধ্যায়ের শেষে সামাজিক দিক থেকে ব্যবহার্য কিছু বিকল্প বানানের প্রস্তাবও পেশ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে বোঝা যাচ্ছে, নামপদের মতো ক্রিয়াপদের বানানও ব্যাকরণের সঙ্গে বিবিধ সামাজিক উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

তথ্যসূত্র

Chatterji, Suniti Kumar. *The Origin And Development Of the Bengali Language.* Rupa, 2017.

DeCapua, Andrea. "Overview of Verbs and Verb Phrases: The Heart of the Sentence." *Grammar for Teachers: A Guide to American English for Native and Non-Native Speakers*, edited by Andrea DeCapua, Springer International Publishing, 2017, pp. 119–62, https://doi.org/10.1007/978-3-319-33916-0_5

Dimmock (Junior), Edward C., et al. *Introduction to Bengali.* 1964th ed., vol. 1, University of Chicago, https://eric.ed.gov/?q=bengali&pg=2&id=ED012811

Thompson, Hanne-Ruth. *Bengali: A Comprehensive Grammar.* Routledge, 2010.

Vasu, S. C. *The Aṣṭādhyāyī Of Pāṇini.* 8th Reprint, vol. 1, Motilal Banarsidass, 2017.

আজাদ, হুমায়ুন. *বাক্যতত্ত্ব.* আগামী প্রকাশনী, ২০১৯.

ইসলাম, রফিকুল, এবং সরকার, পবিত্র, সম্পা. *বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ.* বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০১২.

চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ, সম্পা. *প্রবাসী.* দ্বিতীয় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩২ বঙ্গাব্দ. *DOI.org (Datacite)*, https://doi.org/10.11588/XAREP.00000982

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার. *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ.* ২০১৭, রূপা, ২০১৭.

দাক্ষী, অলিভা. *চর্যা-গীতি ভাষা ও শব্দকোষ.* প্রথম সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১১.

দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন. *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান.* ১৯৩৭, ইণ্ডিয়ান প্রেস, ১৯৩৭.

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গৃহীত বাংলা বানানবিধি. সংশোধিত সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট, ২০০৩.

পাল, পলাশ বরন. *আ মরি বাংলা ভাষা.* প্রথম প্রকাশ, অনুষ্টুপ, ২০১১.

— *কাজের কথা.* প্রথম প্রকাশ, অনুষ্টুপ, ২০২২.

ভট্টাচার্য, মিতালী. *বাংলা বানানচিন্তার বিবর্তন.* প্রথম সংস্করণ, পারুল প্রকাশনী, ২০০৭.

ভট্টাচার্য, সুভাষ. *তিষ্ঠ ক্ষণকাল: বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ.* পঞ্চম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩.

মজুমদার, পরেশচন্দ্র. *বাঙলা বানান বিধি.* দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪.

— *বাঙ্‌লা ভাষা পরিক্রমা.* ২০১৫, খণ্ড. ২, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫.

শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ. *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত.* মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৯.

সরকার, পবিত্র, প্রমুখ. *আকাদেমি বানান অভিধান.* চতুর্থ সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, নভেম্বর, ২০০৩.

— *বাংলা বানান সংস্কার: সমস্যা ও সম্ভাবনা.* দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪.

— *বাংলা লিখুন: নির্ভুল, নির্ভয়ে.* কথাপ্রকাশ, ২০১৯.

সেন, সুকুমার. *ভাষার ইতিবৃত্ত.* ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১.

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলা লিপি এবং বানানের আন্তঃসম্পর্ক

৪.১ সূচনা

বাংলা লিপির ইতিহাস, বাংলা ভাষার ইতিহাসের থেকেও প্রাচীন। চর্যাগীতির লিখনকাল ধরলে বাংলা ভাষার বয়স আনুমানিক হাজার-বারোশ' বছর। পক্ষান্তরে, বাংলা লিপির উল্লেখ খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক থেকে পাওয়া যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে, তখনও পূর্ণ বিকশিত বাংলা বর্ণমালার বিকাশ হয়নি। কিন্তু বঙ্গদেশের লিপিছাঁদ তৎকালীন আমল থেকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে আলাদা হয়ে যেতে শুরু করেছে। সমগ্র মধ্যযুগে প্রধানত বঙ্গাক্ষরে বাংলা ভাষা লেখা হয়েছে। কিছু বিক্ষিপ্ত ব্যতিক্রম অবশ্য রয়েছে। নেওয়ারি, আরবি, ওড়িয়া, সিলেটি-নাগরী ইত্যাদি লিপিতে স্বল্পসংখ্যক বাংলা পুথির সন্ধান পাওয়া যায় (বিশ্বাস ১০৭-১১৩)। তবু পরিসংখ্যানের নিরিখে বঙ্গাক্ষর আর বাংলা ভাষা আধুনিক যুগের আগে পর্যন্ত প্রায় অবিচ্ছেদ্য ছিল।

উনিশ শতক থেকে এই পরিস্থিতি কিছুটা পালটে যেতে থাকে। প্রথমে আরবি অক্ষরে বাংলা লেখার প্রস্তাব আসে। বিশ শতকের মাঝামাঝি রোমক লিপিকে ভারতের 'জাতীয় লিপি' করার প্রস্তাব পেশ করেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। একুশ শতকে এসে রাজনৈতিক কারণে নাগরী লিপিতে ভারতের সমস্ত ভাষা লেখার প্রস্তাব শোনা যাচ্ছে (Nair)। এমতাবস্থায় আমাদের বিচার্য, ভাষা ও লিপির সম্পর্ক কি বিচ্ছেদ্য না অবিচ্ছেদ্য? বাংলা ভাষার লিপি পরিবর্তনের কী কী প্রস্তাব ইতোপূর্বে দেখা গেছে? কী হয়েছে সেইসব প্রস্তাবের পরিণতি? লিপি পালটালে বানানও কি বদলে যায়? ভাষার সামগ্রিক গঠনে লিপি পরিবর্তন কীভাবে প্রভাব ফেলে? নিরপেক্ষ ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরবর্তী অংশে এইসব প্রশ্নের সদুত্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হল।

৪.২ 'সর্বভারতীয় লিপি'-র অভিমুখে বিবিধ প্রয়াস

আপাতদৃষ্টিতে, লিপি এবং বানান পরস্পর-নিরপেক্ষ। বানান হল শব্দে বর্ণগুলির বিন্যাস। সেই বর্ণগুলি যে-কোনো লিপি ব্যবহার করে প্রকাশ করা যেতে পারে। যেমন: বাংলা লিপিতে 'অমল', রোমক লিপিতে 'amal', নাগরীতে 'अमल'। তিনটি ক্ষেত্রে বানান অপরিবর্তিত থাকলেও লিপি পালটে গেল।

ভাষা এবং লিপির পরস্পর-নিরপেক্ষতার তত্ত্ব যুক্তিসম্মত কি না, তা এই অধ্যায়ে পরে আলোচিত হয়েছে। প্রথমে দেখে নেওয়া যাক, এই বিচ্ছিন্নতা প্রচার কারা করে থাকেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্য কী। বিশ শতকের প্রথমার্ধ ছিল সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার কাল। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ লিপি সকল ভারতীয় ভাষার ঐক্যবোধক হয়ে প্রতিষ্ঠিত হলে সুবিধা হয়— এই ধারণা ভাষাতাত্ত্বিকদের প্রভাবিত করেছিল। তার ফলে কোনো কোনো ভাষাতাত্ত্বিক চাইলেন, ভাষা এবং লিপির বিচ্ছিন্নতা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে রোমক বা নাগরী লিপির প্রচার করতে। অর্থাৎ, বাঙালি জাতিকে তার সহস্র বছরের অধিক[১] লেখ্য ঐতিহ্য পরিত্যাগ করে সর্বভারতীয় হয়ে উঠতে হবে— এমনটাই ছিল দাবি। স্বাধীনতা-উত্তর কালে জাতীয়তার ধারণায়

[১] বাংলা লিপির বয়স সম্পর্কে ৪.৪ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটে। ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে রাজ্যের সীমানা। এইসব রাজ্যগুলিতে সর্বভারতীয় সাধারণ লিপির প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না। তখনও কিন্তু ভাষা এবং লিপির বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। তখন অবশ্য এই তত্ত্বের পিছনে প্রণোদনা ছিল বানান-সংস্কার। জনগণের মনে চিরাচরিত লিপির প্রতি আনুগত্য হ্রাস পেলে তার কিছু প্রায়োগিক সুবিধা আছে। লাইনোটাইপের উপযোগী করে যুক্তাক্ষর ভেঙে লেখা, নতুন কিছু হরফ প্রবর্তন ইত্যাদি কাজ সহজসাধ্য হয়ে ওঠে লিপিগত ঐতিহ্যের প্রতি গুরুত্ব কমলে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তীর 'বাংলা বানান সংস্কার প্রস্তাব' প্রবন্ধ এই দ্বিতীয় ধরনের উদ্দেশ্য থেকে রচিত। এই প্রবন্ধের শুরুতে অধ্যাপক চক্রবর্তী প্রায় তিন পৃষ্ঠা ব্যয় করেন কেবল এই তথ্যটি বোঝাতে যে, লিপি ও ভাষার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য নয় —

> বর্ণমালা ব্যবহারের তারতম্যে একটি ভাষা অন্য ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে যায় না। ...স্টেশনের গায়ে 'কানপুর' বা KANPUR যাই লেখা থাকুক না কেন, জায়গাটি একই থাকছে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ বর্ণমালার সাহায্যে একে 'কানপুর'ই বলছেন। (চক্রবর্তী ২৬০)

এই বক্তব্যের বিরুদ্ধ-যুক্তি বর্তমান নিবন্ধের পরবর্তী অংশে পেশ করা হয়েছে। আপাতত জিজ্ঞাস্য, বানান-বিষয়ক একটি প্রবন্ধ শুরুতেই ভাষার সঙ্গে লিপির সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকরণে এত উৎসাহী কেন? আসলে বানান কিয়দংশে লিপির ওপরে নির্ভরশীল। নচেৎ বানান-সংস্কারের আলোচনায় লিপির প্রসঙ্গ উত্থাপন প্রত্যাশিত নয়।

তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায়, বাংলা ভাষা বাংলা ব্যতিরেকে অন্য কোনো লিপিতে লিখলে বানান-সংস্কারে সুবিধা হবে, সেই লিপি কী হতে পারে? যে-লিপি সবচেয়ে 'বিজ্ঞানসম্মত', তা ব্যবহার করেই বাংলা লেখা উচিত। অথবা, বাংলা ভাষার ইতিহাস এবং উচ্চারণপ্রকৃতির সঙ্গে মানানসইভাবে কোনো পূর্ব-প্রচলিত লিপিকে স্বল্প পরিবর্তন করে বাংলা লেখার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একাধিকবার রোমক অথবা নাগরী লিপিতে বাংলা লেখার প্রস্তাব পেশ করেন। আচার্য সুনীতিকুমারের (Chatterji, *A Roman Alphabet for India* 3–9)[২] যুক্তি ছিল ভাষাবৈজ্ঞানিক—

১। রোমক লিপি বাংলা বা অন্যান্য ভারতীয় লিপিগুলির তুলনায় লেখা সহজ।

২। রোমক লিপি প্রকৃত বর্ণলিপি (alphabetic script) হওয়ায় স্বরবর্ণগুলি যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে বাংলা দললিপি (syllabic script) বলে প্রত্যেক বর্ণকে আলাদাভাবে প্রকাশ করে না। বরং সংযুক্ত একটি ধ্বনিকে প্রকাশ করে। যেমন: ম = ম্ + অ।

৩। শিক্ষণ এবং মুদ্রণে রোমক লিপি বাংলার তুলনায় বেশি সহজ।

৪। রোমক লিপি ব্যবহার করলে বহির্বিশ্বে বাংলার প্রসার সহজ হবে।

৫। ভারতীয় ভাষাগুলি একই লিপি ব্যবহার করে লেখা হলে জাতীয় ঐক্যের সহায়ক হবে।

---

[২] এই বইটির ডিজিটাল প্রতিলিপি ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের 'ইন্ডিয়ান কালচার' ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

নিতান্ত যদি রোমক লিপি ব্যবহার করা সম্ভব না হয়, আচার্য সুনীতিকুমার সেক্ষেত্রে নাগরী লিপিকে 'জাতীয় লিপি' হিসাবে গ্রহণের পক্ষপাতী—

> I remain a believer in the Roman alphabet for all Indian languages... abandoning the Roman alphabet as an impracticable thing for India at the present moment, I would strongly advocate the unity of our country in the matter of script through that truly national script of all India – the Deva-nagari, as the next best thing." (Chatterji, *The Origin And Development Of the Bengali Language* 235)

তাঁর এই নীতি থেকে স্পষ্ট, বাংলা ভাষা এবং বাংলা লিপির অবিচ্ছেদ্য আন্তঃসম্পর্কে তিনি বিশ্বাসী নন। সুনীতিবাবুর এই পরিকল্পনা সফল হয়নি। তবে প্রবাসী বাঙালি শিশুদের সুবিধার কথা চিন্তা করে সাম্প্রতিককালে এক প্রকাশন সংস্থা রোমক লিপিতে বাংলা বই প্রকাশ করেছেন। নীচে তার নমুনা দেখানো হল:

> Kal korechhen ajob rakom Chondeedaser khurro —
> Sabai shuney sabash baley parrar chheley burro.
> Khurror jakhon alpo bayes – bachhor khanek habe —
> Uthlo kendey "gunga" boley bheeshon attorabey.[৩]

সুনীতিকুমারের রোমক লিপির নীতির সঙ্গে একটি শিশুপাঠ্য গ্রন্থের লিপি-সম্পর্কিত নীতির অনেকটাই ফারাক। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ভাষাকে নির্দিষ্ট লিপির সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। প্রকাশক অবশ্য একে ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেননি। বরং, বাণিজ্যক উদ্দেশ্য তাঁর কাছে গুরুত্ব পেয়েছে—

> "We have a defined clientele - those who can speak Bengali but cannot read the language. Printing Bengali texts in Roman script gives them a chance to read Bengali books," says Indrani Roy of Mitra & Ghosh. (Banerjee)

রোমক লিপিতে বাংলা লেখা নিছক ভাষাতাত্ত্বিক নিরীক্ষা নয়। এর পিছনে সুগভীর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে—

> Today, there is a new trend of writing Arabic expressions, as suggested by the internet. People all too often correct you on how to write an Arabic word in English. Many of our Bangla words are losing their usage with the advent of the new media lingo. Typing Bangla in English (Latin script) is not an innocent act; it has its own politics. It has its own economy. (Mortuza)

তথাকথিত জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে সর্বভারতীয় লিপি নির্মাণের উদ্যোগ সুনীতিকুমারের পরেও আমরা লক্ষ করি। ড. শ্রীনিবাস চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে এবং আইআইটি মাদ্রাসের গবেষকদের সহায়তায় ভারতী লিপি নামে এক 'সর্বভারতীয় লিপি' তৈরি করা হয়েছে *(Bharati)*। বাংলা, ওড়িয়া, নাগরী, তামিল, তেলুগু, মালায়লাম, কন্নড় ইত্যাদি ন'টি ভারতীয় লিপির বদলে ভারতী লিপি ব্যবহার করা সম্ভব। উত্তরবঙ্গের ভাষা-গবেষক কৃষ্ণকুমার সিন্‌হা 'ভারতী' লিপি নামে এক 'পৃথিবীর একমাত্র ধ্বনিভিত্তিক বর্ণমালা'-র প্রস্তাব করেছেন (সিন্‌হা ১২৭)।

---

[৩] এখান থেকে পুনরুদ্ধৃত (Akkas)

ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় কিংবা অভিধানে যথাযথ উচ্চারণ বোঝানোর সময় আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা (International Phonetic Alphabet) ব্যবহার করা হয়। তবে দৈনন্দিন জীবনে এর প্রয়োগ নেই বললেই চলে। এই ধরনের সর্বভারতীয় বা বৈশ্বিক কৃত্রিম লিপির প্রয়োজন আদৌ রয়েছে কি না, তা বর্তমানে আমাদের আলোচ্য নয়। ভাষার প্রসার বা বোধগম্যতার সুবিধার্থে লিপি পরিবর্তনের এই ধরনের প্রস্তাব বানানকে কীভাবে প্রভাবিত করে, এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা মূলত যে প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে পেতে চাইছি—

১। ভাষা এবং লিপির আন্তঃসম্পর্ক বিচ্ছেদ্য নাকি অবিচ্ছেদ্য?

২। লিপির পরিবর্তনের সঙ্গে বানান কি কোনোভাবে সম্পর্কিত?

৩। প্রযুক্তির সঙ্গে লিপির সম্পর্ক কি? মুদ্রণ-প্রযুক্তি কি বানানকে প্রভাবিত করে?

৪। যদি বাংলা ব্যতিরেকে অন্য কোনো লিপিতে এই ভাষা লেখা হয়, তাহলে কোন্ লিপি হবে সবচেয়ে উপযুক্ত?

৪.৩ প্রমিত বানানের দ্বি-উপাদান গঠন

প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, বানান একটি সামাজিক অভ্যাস। বানানকে বস্তুত সামাজিক চিহ্নবিজ্ঞান (social semiotics) বলা যেতে পারে। নিছক ব্যাকরণের নিয়ম দ্বারা বানান নিয়ন্ত্রিত হয় না। ইতোপূর্বে আমরা দেখিয়েছি, কখনও কখনও অত্যন্ত যুক্তিসংগত বানানও সামাজিকভাবে স্বীকৃতি পায় না। এক্ষেত্রে জয়ী হয় ভাষার সঙ্গে জড়িত সামাজিক আবেগ। এক ধরনের মানসিক জাড্যের বিরুদ্ধে লড়তে হয় বানান-সংস্কারকদের। এ তো গেল বানানের ব্যাকরণগত অংশ। এরই সঙ্গে বানানের আরেকটি উপাদান রয়েছে— তার দৃশ্যগত রূপ। এই দৃশ্যগত রূপকে গুরুত্ব দিয়েই আমরা সামাজিক চিহ্নবিজ্ঞানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছি। এই লিপিনির্ভর চিহ্নের নির্মাতা হলেন বানানটির লেখক। এক্ষেত্রে কোড-নির্মাতা (encoder) এবং স্রষ্টা (originator) সমার্থক শব্দ নয়। নির্মাতা বানান নামক চিহ্নসমূহ পেয়েছেন ভাষিক উত্তরাধিকারসূত্রে। এই নির্মিত চিহ্নের পাঠোদ্ধার (decode) করেন পাঠক। নির্মাতা-স্রষ্টা-পাঠকের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার নাম লিপিচিহ্ন। বানান কেবল কতিপয় ব্যাকরণগত নিয়মের সমষ্টি নয়। বানানের লেখ্যরূপ সমান গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাকরণ এবং লেখ্যরূপের সমন্বয়ে তৈরি হয় বানান। একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি প্রকাশ করা যেতে পারে —

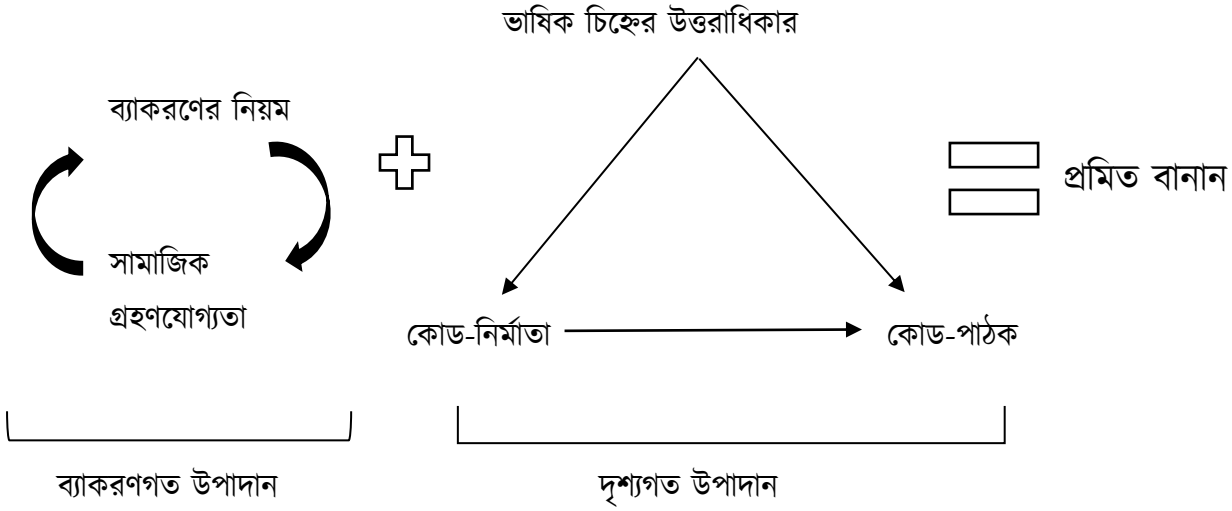

রেখাচিত্র ৪.১: প্রমিত বানানের দ্বি-উপাদান গঠন

উপরের রেখাচিত্র অনুযায়ী, যে-কোনো শব্দের বানানকে দুটি উপাদানের সমষ্টি বলে ব্যাখ্যা করা যায়। এর প্রথমাংশে রয়েছে ব্যাকরণগত যুক্তি। এখনও পর্যন্ত বাংলা বানানের আলোচনা প্রধানত এই অংশকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। ব্যাকরণের নিয়ম বিজ্ঞানের নিয়মের মতো সমাজ-বিবিক্ত নয়। বরং বিবিধ সামাজিক উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত। এই নিয়ম ব্যবহারকারীদের সুবিধামতো অল্পবিস্তর পরিবর্তন করা যায়। তাই ব্যাকরণের নিয়ম এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার পরস্পর-নির্ভর সম্পর্ককে উভমুখী চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভাষা ব্যবহারকারীর সম্পর্ক, সাক্ষরতা, বহুভাষিকতা, ধর্ম ইত্যাদি বিবিধ সামাজিক উপাদান কীভাবে ব্যাকরণকে প্রভাবিত করে, তা প্রথম অধ্যায়ে (উপ-অধ্যায় ১.৬) উদাহরণসহ সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

ব্যাকরণ ব্যতিরেকে বানানের নিছক দৃশ্যগত রূপ ভাষা ব্যবহারকারীর কাছে সমান গুরত্বপূর্ণ। উপরের রেখাচিত্রে এই সম্পর্ককে আমরা একটি ত্রিভুজের সাহায্যে প্রকাশ করেছি। কোড-নির্মাতা এবং কোড-পাঠককে জুড়ে রেখেছে ভাষিক উত্তরাধিকার। ভাষিক চিহ্ন তথা লিপি কোড-নির্মাতার মৌলিক উদ্ভাবন নয়। ভাষা ব্যবহারকারী হিসাবে ঐতিহ্য থেকে তিনি বর্ণমালার উত্তরাধিকার পেয়েছেন। তাই তিরের অভিমুখ ভাষিক চিহ্নের উত্তরাধিকার থেকে কোড-নির্মাতার দিকে। এই চলমান ঐতিহ্যে কোড-নির্মাতার অল্পবিস্তর অবদান থাকতে পারে। যেমন, পলাশ বরন পালের 'পেট-কাটা এ' লেখার প্রবণতা কিংবা বুদ্ধদেব বসুর জ-এর নীচে দ্বিবিন্দুচিহ্ন দেওয়ার প্রবণতা। কোড-পাঠক একই উত্তরাধিকারের অংশীদার। তাই আরেকটি তির ভাষিক চিহ্নের উত্তরাধিকার থেকে কোড-পাঠকের অভিমুখে ধাবিত। তৃতীয় তিরের অভিমুখ কোড-নির্মাতা থেকে কোড-পাঠকের দিকে। এই হল বানানের দৃশ্যগত উপাদানের প্রাথমিক কাঠামো।

বানানের পূর্বোক্ত দুই উপাদানের মধ্যে দৃশ্যরূপ অধিকতর রক্ষণশীল। 'কার্তিক'-র বদলে 'কার্ত্তিক' লিখলে বানানের ব্যাকরণগত উপাদানের পরিবর্তন ঘটছে। আর কারতিক/ কার্‌তিক/ kartik ইত্যাদি যে-কোনো একটি লিখলে বানানের দৃশ্যরূপ পরিবর্তিত হচ্ছে। বৈয়াকরণদের আলোচনায় দৃশ্যরূপের গুরুত্ব অনেক সময়

স্বীকৃতি পায় না। দৈনন্দিন ব্যবহারে কিন্তু দৃশ্যগত রূপ দেখেই একজন সাধারণ ভাষা ব্যবহারকারী বানানের শুদ্ধতা বা অশুদ্ধতা নির্ধারণ করে থাকেন। বানানের অন্তর্নিহিত ব্যাকরণ সাধারণের অধিগম্য নয়। ব্যাকরণ নিয়ে বিভ্রান্ত কেউ কেউ সম্ভাব্য দুটি বানান লিখে শুদ্ধ বানানটি বেছে নিতে চান— এই ঘটনা থেকে আমাদের প্রস্তাবিত প্রমিত বানানের গঠনে (রেখাচিত্র ৪.১) দৃশ্যরূপের গুরুত্ব বোঝা যায়।

আগের উদাহরণে বিভ্রান্ত ব্যক্তিটি আসলে ব্যাকরণের হালে পানি না পেয়ে স্মৃতি থেকে বানানের দৃশ্যরূপ পুনরুদ্ধার করতে চান। প্রশ্ন উঠতে পারে, অন্য কোনো লিপিতে যদি তিনি বাল্যকাল থেকে বাংলা লিখতে অভ্যস্ত হতেন, তাহলে সেই লিপির দৃশ্যগত রূপই কি তাঁর কাছে অনিবার্য বোধ হত? বাংলা ভাষা ও লিপির সম্পর্ক কি নিতান্ত আপতিক তথা বিচ্ছেদ্য? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আগে বাংলা লিপি ও ভাষার আন্তঃসম্পর্কের ইতিহাস সংক্ষেপে বুঝে নিতে হবে।

৪.৪ বাংলা লিপির ঐতিহাসিক পরম্পরা

বাংলা ভাষার তুলনায় বাংলা লিপির ইতিহাস প্রাচীনতর। এই ঘটনা স্বাভাবিক। আনুমানিক অষ্টম-দশম শতকের আগে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। বাংলা লিপির উল্লেখ তার অন্তত ৭০০ বছর আগে থেকে পাওয়া যাচ্ছে। বৌদ্ধ গ্রন্থ 'ললিতবিস্তর'-এ বাংলা লিপির উল্লেখ রয়েছে— "ব্রাহ্মী খরোষ্ঠী পুষ্করসারিং অঙ্গলিপিং বঙ্গলিপিং মগধলিপিং মঙ্গল্যলিপিং... আসা ভো উপাধ্যায় চতুঃ-ষষ্ঠী লিপীনা কতমা ত্ব শিষ্যাপয়িষ্যসি" (Vaidya 88)। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের করা অনুবাদ—

> Is it the Brâhmí writing; or the Kharoshṭí; or the Pushkarasárí; or the writing of Aṅga; or that of Baṅga; or that of Magadha; or Máṅgalya writing... Out of these sixty-four kinds which is it, sir, that you wish to teach me? (Mitra 183)[8]

'ললিতবিস্তর' আনুমানিক খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের আগে রচিত। অর্থাৎ, তখন থেকেই বঙ্গদেশের লিপি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পেতে অবশ্য আরও একশ বছর অপেক্ষা করতে হবে। রাজা চন্দ্রবর্মণের শুশুনিয়া লিপি খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে খোদিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাঁকুড়া জেলার ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য:

> A rock inscription that is considered to be the 'oldest' rock inscription of West Bengal. According to historical views, Raja Chandravarman built his fort in this place but there is no trace of that fort at present. The rock inscriptions of 4-th century AD was kept in the place named Pushkarana. ("Susunia")

বাংলার প্রাচীনতম এই শিলালেখের ভাষা সংস্কৃত, লিপি ব্রাহ্মীর পূর্বী রূপ। তবে প, ম, হ, র ইত্যাদি অক্ষরে আধুনিক বাংলা অক্ষরের সাদৃশ্য রয়েছে (মুখোপাধ্যায়, জয়দীপ)। এরপর আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের দুটি শিলালিপিতে বাংলা অক্ষরের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। আসামে আবিষ্কৃত উমাচল শিলালেখ এবং

[8] উদ্ধৃতিতে লিপ্যন্তরণের চিহ্ন (diacritic mark) পরিবর্তন করা হয়নি।

নগাজরী-খনিকরগাঁও শিলালেখের ভাষা সংস্কৃত। সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করা যায়নি। তবে বাংলা লিপির বৈশিষ্ট্য দুই শিলালেখতে খুঁজে পাওয়া যায়। এই দুই শিলালেখ প্রাচীন আসামে বঙ্গীয় সংস্কৃতির উপস্থিতির স্মারক। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকে বাংলা লিপির গঠন আরও স্পষ্ট রূপ ধারণ করতে থাকে। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, "খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মগধের রাজা আদিত্যসেনের সাহপুর ও আফসড় অনুশাসন হইতে আরম্ভ করিয়া পালরাজগণের লেখমালায় এই প্রাচ্যলিপির ক্রমোন্নতির ইতিহাস খোদিত আছে" (সেনদীনেশচন্দ্র ২১২)। আচার্য সেনের এই অভিমতকে সমর্থন করেছেন অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস —

> সপ্তম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ দেবখড়্গের আশরফপুর তাম্রশাসনের বর্ণগুলির রূপ বাংলা লিপির আধুনিক রূপক স্মরণ করায়। বিশেষত জ, ত, ন, ফ এবং স-অক্ষরগুলি তো প্রায় বঙ্গাক্ষর। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে সব হরফগুলির বিবর্তন তখনও সম্পূর্ণ হয়নি... (বিশ্বাস ৮৪)

পরবর্তীকালে অষ্টম শতাব্দীতে ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন, নবম শতাব্দীতে নারায়ণপালের বাদাল স্তম্ভলিপি, দশম শতাব্দীতে প্রথম মহীপালের বাণগড় তাম্রশাসন ইত্যাদিতে বঙ্গাক্ষর ক্রমশ স্পষ্ট রূপ ধারণ করেছে। মধ্যবর্তী পর্যায়ে লিপির বিকাশের ধারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণায় (Banerji 37–86) পাওয়া যাবে। দ্বাদশ শতক থেকে বাংলা লিপি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে (বিশ্বাস ৮৫)। এর পরে বাংলা লিপির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বলতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লিপি-সংস্কার প্রয়াস। ৎ, ড়, ঢ়, য় — এই চারটি বর্ণের বাংলা বর্ণমালায় প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তি বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব। তারও পরবর্তীকালে কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগ (যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, পলাশ বরন পাল প্রমুখ) এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা-পরিকল্পনার (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ঢাকা বাংলা একাডেমী ইত্যাদি) মাধ্যমে বাংলা লিপির সংস্কার সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। বানানের আলোচনায় বাংলা লিপির বিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাস আমরা নথিভুক্ত করব না। 'ললিতবিস্তর' থেকে শুরু করে প্রায় ১৮০০ বছরের দীর্ঘ যাত্রাপথে বাংলা লিপির ক্রমিক বিকাশের ঝলকদর্শন এখানে প্রদত্ত হল মাত্র। বাংলা লিপির এই সুপ্রাচীন ইতিহাসের দিকে নজর ফেরালে সহজে বোঝা যায়, মুদ্রণের সুবিধার্থে বা তথাকথিত সর্বজনীন/ সর্বভারতীয় হয়ে-ওঠার তাগিদে অন্য কোনো লিপিতে বাংলা লিখলে বাঙালি জাতিকে তার ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত করা হয়। লিপি নিছক মৌখিক ভাষাকে স্থায়ী করার জন্য ব্যবহৃত আপতিক কিছু চিহ্নসমষ্টি নয়। একটি জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করে তার লিপি। বিশেষত, বাঙালি জাতির ক্ষেত্রে ভাষার চেয়েও লিপির পরম্পরা প্রাচীনতর। সেই লিপি স্বেচ্ছায় বর্জন বা বিকৃত করা হঠকারী সিদ্ধান্ত।

৪.৫ লিপি-সংস্কারের যাথার্থ্য নির্ধারণ

ভাষা-পরিকল্পনার নামে একাধিকবার এই ধরনের ঐতিহ্যবিরোধী উদ্যোগ করা হয়েছে। বাংলার ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা সফল হয়নি। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় লিপি-সংস্কারের পূর্ব-দৃষ্টান্ত রয়েছে। কোনো ক্ষেত্রেই কেবল লিপি-সংস্কারে বিষয়টি থেমে থাকেনি। এটি সামগ্রিক ভাষা-পরিকল্পনার একটি অংশ মাত্র। এর সবচেয়ে বিখ্যাত দৃষ্টান্ত ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কামাল আতাতুর্কের নির্দেশে তুর্কি ভাষা রোমক লিপিতে লেখা শুরু হয়। তুর্কি ভাষাকে তথাকথিত সর্বজনীন করে তোলার কারণে কিন্তু এই পরিবর্তন করা হয়নি। ইতোপূর্বে তুর্কি ভাষা লেখা হত আরবি-ফারসি বর্ণমালার একটি বিশেষ রূপের সাহায্যে। এই লিপি স্বরধ্বনিপ্রধান তুর্কি ভাষাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে অক্ষম ছিল। Erik J. Zürcher জানাচ্ছেন —

> ... it (Arabic/ Persian alphabet) was highly unsuitable for expressing the sounds of the Turkish part of the vocabulary, Arabic being rich in consonants but very poor in vowels while Turkish is exactly the opposite. The result was that Ottoman Turkish sometimes had four different signs for one single sound, while it could not express other sounds at all. (Zürcher 188)

পরবর্তীকালে বাঙালি ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে কেউ কেউ কামাল আতাতুর্কের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা লিপির খোলনলচে পালটে দিতে চাইবেন। প্রায়শ যে তথ্যটি তাঁদের নজর এড়িয়ে যায় তা হল, তুর্কি ভাষা এবং আরবি-ফারসি লিপির অসামঞ্জস্য আতাতুর্কের সংস্কারের আগে থেকেই সমস্যা সৃষ্টি করছিল। এই সংস্কারের পিছনে আদর্শগত প্রেরণা ছাড়াও ব্যাকরণগত যুক্তি ছিল যথেষ্ট। কিন্তু বাংলা ভাষা এবং বাংলা লিপির সম্পর্ক তো তুর্কি ভাষা এবং আরবি-ফারসি লিপির মতো অসমঞ্জস নয়। ব্যাকরণগত যুক্তি ছাড়াই নিছক 'সর্বজনীন' হয়ে ওঠার তাগিদে সহস্রাধিক বছরের লিপি পরিবর্তন সংগত নয়।

৪.৫.১ আচার্য সুনীতিকুমারের লিপি-সংস্কার প্রস্তাব

জাপানে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে 'মেইজি সংস্কার'-এর পরে জাপানি ভাবলিপির আধুনিকীকরণ ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে চৈনিক ভাবলিপি সরলীকৃত হয়। তুর্কি, চৈনিক, জাপানি ইত্যাদি ভাষার লিপি সংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতেও একসময় লিপি সংস্কারের প্রয়াস করা হয়েছিল।

ভারত সরকারের ভাষা কমিশনের ১৯৫৬ সালের প্রতিবেদনে সমস্ত ভারতীয় ভাষা নাগরী (প্রতিবেদনে 'দেবনাগরী' বলে লিখিত) লিপিতে লেখার প্রস্তাব দেওয়া হয়। একইসঙ্গে হিন্দিকে তথাকথিত রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবও পেশ করা হয়—

> ... we would advocate the adoption of the Devanagari script, optionally, for use for the writing of the other Indian languages besides the Union language ... every student in the secondary school will have to learn Hindi as the Union language in the Devanagari script, which is prescribed for it by the Constitution. (*Report of the Official Language Commission (1956)* 228)

এই প্রস্তাবের যাথার্থ্য যাচাই করা আমাদের বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক নয়। এই প্রতিবেদনেই অবশ্য আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভিন্নমত ("Note on the Report of the Official Language Commission as a Minority Report") লিপিবদ্ধ রয়েছে। সেখানে তিনি রোমক লিপির পরিবর্তিত রূপের মাধ্যমে সমস্ত ভারতীয় ভাষা লেখার পক্ষে সওয়াল করছেন—

> I remain a confirmed advocate of the Roman script for all Indian languages, and I feel certain that in our own interest sooner or later we shall do what I consider to be most sensible thing— viz., adopt a modified Roman alphabet for all our Indian languages. (*Report of the Official Language Commission (1956)* 278)

উল্লিখিত ভিন্নমত জ্ঞাপন করা হচ্ছে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে। তার প্রায় ২০ বছর আগে থেকে অবশ্য আচার্য সুনীতিকুমার রোমক লিপি প্রচলনের পক্ষপাতী। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে লিখিত একটি প্রবন্ধে (চট্টোপাধ্যায় ৩৪৯-৩৬৫) ভারতীয় ভাষাগুলি রোমক লিপিতে কেমনভাবে লেখা হবে, সেই প্রস্তাব তিনি পেশ করছেন। ভাষাতাত্ত্বিকদের একাংশ যতই লিপি ও ভাষার সম্পর্কবিচ্ছেদের সপক্ষে সওয়াল করুন না কেন, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে আচার্য সুনীতিকুমারের প্রস্তাবে লিপির সঙ্গে বাংলা বানানও কিয়দংশে পালটে যাচ্ছে। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেখানো হল—

১। দীর্ঘ স্বরধ্বনি বোঝানোর জন্য ‘মিনিট চিহ্ন’ (´) ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন: অ= a; আ= á বা â; ই= i; ঈ = í বা î ইত্যাদি। এই ‘মিনিট চিহ্ন’ সাধারণত প্রস্বর (accent) বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। ফরাসিতেও ´ চিহ্ন (acute accent) এবং ^ চিহ্ন (circumflex accent) প্রস্বরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। রোমক লিপিতে তাই প্রস্বর এবং স্বরধ্বনির দীর্ঘতা নিয়ে বিভ্রান্তির অবকাশ থেকে যায়। যেমন—

bŕs’t’i par’e t’ápur t’upur nade elo bán

এর সঙ্গে ছন্দ-বিশ্লেষণের প্রয়োজনে যদি প্রস্বর-চিহ্ন যুক্ত করা হয়, তাহলে এই পঙ্‌ক্তির রূপ হবে —

b́ŕs’t’i par’e/ t́’ápur t’upur/ ńade elo/ b́án[৫]

একই ‘মিনিট চিহ্ন’ কখনও স্বরের দীর্ঘতা বোঝাচ্ছে, কখনও বা প্রস্বরের উপস্থিতি বোঝাচ্ছে। আপাতভাবে মনে হতে পারে, এটি বিশেষ একটি ক্ষেত্রের সমস্যা মাত্র। প্রস্বর দেখানোর প্রয়োজন না থাকলে রোমক লিপি ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই। বস্তুত বাংলা বানানের জটিল ক্ষেত্রটিকে এই লিপি আরও জটিল করে তোলে।

২। বাংলা লিপির ব্যঞ্জনবর্ণগুলি দললিপি। একে রোমক লিপিতে লেখা মানে অক্ষরলিপিতে পরিবর্তন করা হচ্ছে। আচার্য সুনীতিকুমারের প্রস্তাব, এক্ষেত্রে বাংলা অক্ষর থেকে লিপ্যন্তরণ না করে উচ্চারণ অনুযায়ী ধ্বনিতাত্ত্বিক বানান লিখতে হবে। অর্থাৎ, তাহার রোমক লিপিতে হবে táhár; táhára নয়। এই নীতির সমস্যা হল— বাংলায় যদি সত্যিই কোনোদিন রোমক লিপির প্রচলন ঘটে, তখন শব্দের বর্ণ বিশ্লেষণ করা হবে কীভাবে? জল সংস্কৃত শব্দ। তার বানান বাংলা ভাষায় ‘jal’ লিখলে উচ্চারণ বোঝানো গেল বটে, কিন্তু বর্ণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নতুন জটিলতার সূচনা ঘটল। বাংলা ‘জল’ (জ্ + অ+ ল্) শব্দটি তখন সংস্কৃতের ‘জল’ (জ্+ অ+ ল্+ অ) থেকে আলাদা বলে বিবেচনা করতে হবে। পরিস্থিতি যদি তা-ই হয়, তখন তৎসম শব্দ বলে বাংলায় আর কিছু থাকবে না! তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সংস্কৃত বানানের নিয়মও না থাকাই উচিত। একটিমাত্র উদাহরণ দেওয়া যাক। বাংলায় অন্তঃস্থ ব এবং ণ -এর উচ্চারণ নেই। তাই সংস্কৃতের বাণ (ব্ + আ+ ণ্+ অ) বাঙালির উচ্চারণ অনুযায়ী লিখলে রোমক লিপিতে হবে bán, বাংলা অক্ষরে ‘বান’। অথচ আচার্য সুনীতিকুমার ‘তরী’, ‘সুন্দরী’ ইত্যাদি শব্দের বানান রোমক লিপিতে লিখছেন ‘tarî’, ‘sundarî’। এখানে স্পষ্টত বাংলা অক্ষর রোমকে লিপ্যন্তর করা হচ্ছে। উচ্চারণ ‘তোরি’ হওয়া সত্ত্বেও tori বানান লেখা হচ্ছে না। আবার, ‘তাহার’ শব্দের ‘tahar’

[৫] বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুযায়ী পর্বের প্রথম দলে (syllable) প্রস্বর দেওয়া হয়েছে

বানানের ক্ষেত্রে লিপ্যন্তরের বদলে উচ্চারণ গুরুত্ব পাচ্ছে। এই দ্বিবিধ নীতির মিশ্রণের ফলে সুনীতিবাবুর রোমক লিপির প্রস্তাব বাংলা বানানের সমস্যাটিকে জটিলতর করে তুলেছে।

৩। বাংলা ক্রিয়াপদের বানানও রোমক লিপিতে লেখা যথেষ্ট সমস্যাজনক। বিশেষত, বিবৃতিবাচক এবং অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদের[৬] বানান অনেকসময় একটিমাত্র হস্-চিহ্নের ওপর নির্ভর করে আলাদা হয়ে যায়। যেমন: তুই করিস্ (অনুজ্ঞাবাচক) এবং তুই করিস (বিবৃতিবাচক)— উভয় ক্রিয়াপদের বানানই রোমক লিপিতে লেখা হবে karis (লিপ্যন্তরকে গুরুত্ব দিলে) অথবা koris (উচ্চারণকে গুরুত্ব দিলে)। একইভাবে, তুমি কর (বিবৃতিবাচক) এবং তুমি করো (অনুজ্ঞাবাচক) রোমক লিপিতে উচ্চারণ অনুযায়ী হবে karo। হস্-চিহ্ন বর্জনের ফলে ক্রিয়াপদের বানান বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠবে।

৪। অন্য কিছু বিশেষ ক্ষেত্রেও বিভ্রান্তি দেখা যাবে। সুনিশ্চয়বাচক (emphatic) ই বা ও-এর অস্তিত্ব আলাদাভাবে বোঝানো হবে কীভাবে? ধরা যাক, এই বাক্যটি রোমানে লেখা হবে—

"যাবিই যদি, সাবধানে যাস।"

লিপ্যন্তর করার পর পাওয়া যাবে —

"jâbii jadi, sâbdhâne jâs"

এই বাক্যের দ্বিতীয় শব্দে পরপর দুটি i রয়েছে। এদের মধ্যে প্রথমটি পূর্ণস্বর, দ্বিতীয়টি খণ্ডস্বর। বাংলা অক্ষরে পূর্ণস্বর হ্রস্ব ই-কার রূপে লিখিত হওয়ায় উচ্চারণে সমস্যা হয় না। কিন্তু রোমক লিপিতে দুটির দৃশ্যগত রূপ এক হয়ে যাওয়ায় উচ্চারণ বোঝা কঠিন হয়ে যায়।

৫। ভারতে যদি সত্যিই কোনোদিন সর্বজনীন রোমক লিপি প্রচলিত হয়, প্রাদেশিক ভাষাগুলির ক্ষেত্রে ঐতিহ্য সংরক্ষণ বৃহৎ সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। হাজার বছরের বাংলা অক্ষরে লিখিত বাংলা সাহিত্য তখন কি রোমকে লিপ্যন্তর করা হবে সরকারি উদ্যোগে? না-হলে মধ্যযুগের পুথিসাহিত্য, প্রথাগত বঙ্গাক্ষরে অদ্যাবধি মুদ্রিত বাংলা সাহিত্যের রসগ্রহণ করতে নবীন প্রজন্ম সক্ষম হবে না। বাংলা, পঞ্জাবি, তামিলের মতো কিছু ভাষা বিদেশিরাও বলে থাকেন। পাকিস্তানে পঞ্জাবি, সিঙ্গাপুর এবং শ্রীলঙ্কায় তামিল, সমগ্র বাংলাদেশে বাংলা কথিত হয়। ভারতীয় ভাষাগুলি যদি সর্বজনীন হওয়ার তাগিদে রোমক লিপিতে লেখা হতে থাকে, তখন বহির্বিশ্বের ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা কঠিন হবে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বাংলা, শ্রীলঙ্কা ও তামিলনাড়ুর তামিল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

৬। বাস্তবে এই লিপি প্রয়োগের জন্য যে বিপুল শ্রম এবং অর্থ ব্যয় হবে, তা কতটা আদৌ জরুরি ছিল? শিশুরা প্রস্বর-চিহ্ন ব্যবহার করে রোমক অক্ষরে বাংলা ভাষা লিখবে— এতটা নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করা যায় না। বিশেষত, ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে লিপি পরিবর্তন সাক্ষরতা প্রসারে সহসা অবাঞ্ছিত বাধার সূচনা করবে।

---

[৬] উপ-অধ্যায় ৩.৫ দ্রষ্টব্য।

৭। ১৯৩৪ সালে লিখিত বাংলা প্রবন্ধের (চট্টোপাধ্যায় ৩৪৯-৩৬৫) বক্তব্য কিয়দংশে পালটে গেল ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত *A Roman Alphabet for India* নামক গ্রন্থে। একটি দুটি উদাহরণ দেওয়া যাক। প্রবন্ধে অ এবং আ অক্ষরের জন্য প্রস্তাবিত হয়েছিল যথাক্রমে a এবং á/ â। পরের বছর আচার্য সুনীতিকুমার সর্বভারতীয়ত্বের খাতিরে বাঙালিকে হ্রস্ব অ পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিচ্ছেন:

> For Standard Bengali, the Indo-Roman alphabet as for Hindi can be employed, but as the Bengali pronunciation of is অ= অ not [ʌ], but [ɔ], this may be used in place of [ʌ]; ঐ= ঐ and ঔ= ঔ will then have to be written [ɔi, ɔu], or, better, [oi, ou]. But it would be better to follow the All-India system of transliteration, and equate Beugali অ with [ʌ], it being understood that in Bengali [ʌ] has the value of a more rounded sound, of [ɔ]. (Chatterji, *A Roman Alphabet for India* 41)

প্রস্তাবিত রোমক লিপির বিবিধ অসুবিধা সম্পর্কে আচার্য সুনীতিকুমার যে একেবারে অনবহিত ছিলেন, তা নয়। রোমক লিপি সম্পর্কিত তাঁর প্রস্তাব ভাষাতাত্ত্বিক সম্ভাবনার খেলা হিসাবে বিবেচনা করাই শ্রেয়। তিনি ব্যক্তিগত বাংলা লেখা কখনোই রোমক লিপিতে লেখেননি। ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, তথাকথিত 'সর্বজনীন' নাগরী লিপি অহিন্দিভাষীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধিতা করেছেন। রোমক লিপি প্রচলনের সপক্ষে সুনীতিবাবুর সুপারিশ সুবিখ্যাত হলেও যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

৪.৫.২ কৃষ্ণকুমার সিন্‌হা প্রচারিত ভারতী লিপি

শিলিগুড়ির ভাষা গবেষক কৃষ্ণকুমার সিন্‌হা মহাশয় একটি সর্বভারতীয় লিপির প্রস্তাব দিয়েছেন। এর নাম ভারতী লিপি[৭]। এই লিপির আবিষ্কারক কৃষ্ণকুমারবাবুর পিতা ভুবনদাস সিন্‌হা। ভারতী লিপিতে ৭টি স্বরবর্ণ এবং ১৮টি ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে (সিন্‌হা ১০৮)। মহাপ্রাণতা, নাসিক্য উচ্চারণ, দ্বিত্ব ইত্যাদি বোঝানোর জন্য ৭ টি বিশেষক চিহ্ন (diacritic mark) ব্যবহার করা হয়েছে। এই লিপি 'এক বর্ণ — এক ধ্বনি' নীতি মেনে চলেছে। যৌগিক স্বরের জন্য আলাদা কোনো বর্ণকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, লিপি পরিবর্তন অনিবার্যভাবে বানানকেও পরিবর্তিত করে দেয়। সুনীতিবাবুর রোমক লিপির প্রস্তাবে এই সমস্যা লক্ষ করা গেছিল। এখানেও কৃষ্ণকুমারবাবু জানাচ্ছেন:

> বানান ভুলের সম্ভাবনা কম। বানান মুখস্থ করার দরকার হয় না। শুধুমাত্র ধ্বনি অনুসারে ধ্বনি লিপিগুলি পরপর বসালেই শুদ্ধ বানান যুক্ত শব্দ গঠন করা যাবে। (সিন্‌হা ১২৭-২৮)

এখানে অসচেতনভাবে শুদ্ধ বানানের সংজ্ঞাই পালটে দেওয়া হচ্ছে। ধ্বনিসংবাদী বানানকে 'শুদ্ধ' বানান বলে না। তাকে ব্যাকরণের নিরিখে 'শুদ্ধ' হয়ে উঠতে হবে। ব্যাকরণগত যুক্তি নিতান্ত যদি না-ই থাকে, অন্ততপক্ষে সেই বানান সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। যা ব্যাকরণ কিংবা সমাজ কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি,

[৭] মূল গ্রন্থে 'ভারতী লিপিমালা' নামে অভিহিত। আমাদের মতে, বর্ণসমষ্টিকে 'লিপি' বলাই যথেষ্ট। এখানে একাধিক লিপির কথা বলা হচ্ছে না বলে 'লিপিমালা' বহুবচনের প্রয়োজন নেই।

সেই বানান যথাযথভাবে ধ্বনিকে প্রকাশ করলেও 'অশুদ্ধ' বলেই পরিগণিত হবে। ধরা যাক, 'গ্যান' বানান ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ এবং সামাজিকভাবেও স্বীকৃতি পায়নি। এই বানান ধ্বনিকে যথাযথভাবে প্রকাশ করলেও একে শুদ্ধ বানানের তকমা দেওয়া যায় না। আরেকটি উদাহরণ দেওয়ার আগে ভারতী লিপির বর্ণগুলি আগে দেখে নেওয়া যাক—

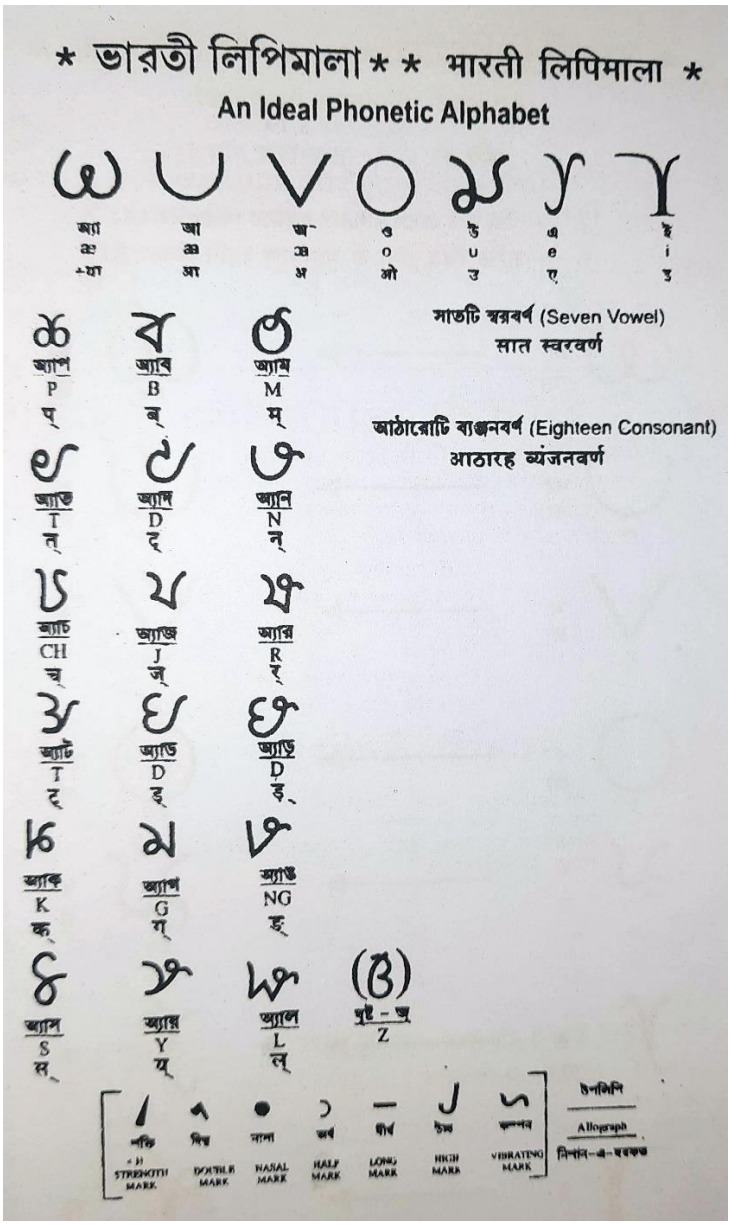

চিত্র ৪.১: ভারতী লিপির স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ

এই লিপিতে 'বিজ্ঞান' শব্দটি লেখা হচ্ছে (সিন্‌হা ১২৪) এইভাবে[৮]— অ্যাব- ই- (অ্যাগ+দ্বিত্ব)- (আ+নাসা)- অ্যান। অর্থাৎ, বঙ্গাক্ষরে এর সমতুল্য হল— ব্ + ই + গ্ + গ্ + আঁ + ন্। এখানে লিপির সরলীকরণকে গুরুত্ব

[৮] ইউনিকোডে দুষ্প্রাপ্যতার কারণে মূল ভারতী লিপি বর্তমান অভিসন্দর্ভে ব্যবহার করা সম্ভব হল না। পরিবর্তে লেখক কর্তৃক প্রস্তাবিত নাম বর্ণ বিশ্লেষণে ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতল বর্ণগুলি একসঙ্গে প্রথম বন্ধনীতে রইল।

দিতে গিয়ে বানান পালটে দেওয়া হচ্ছে। ভারতী লিপিতে 'শ্রী' লেখা হচ্ছে এইভাবে— (অ্যাস+শক্তি) – অ্যার – (ই+দীর্ঘ)। এই বানান ভাষাবিজ্ঞানসম্মত নয়। /শ্/-এর সহস্বনিম /স্/। এদের মধ্যে 'শক্তি' যোগ বা বিয়োগের কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু তা-ই নয়, ভারতী লিপিতে দীর্ঘত্বসূচক বিশেষক চিহ্ন ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ, বাঙালির উচ্চারণে দীর্ঘ স্বরধ্বনি সাধারণত পাওয়া যায় না। তাহলে ভারতী লিপি একইসঙ্গে উচ্চারণকেও গুরুত্ব দিচ্ছে, আবার ক্ষেত্রবিশেষে লিপ্যন্তর করার চেষ্টাও করছে। এই নীতি বিভ্রান্তিকর। সুনীতিবাবুর রোমক লিপির প্রস্তাবের মতো ভারতীলিপিকেও ভাষাতাত্ত্বিক নিরীক্ষা হিসাবে দেখাই শ্রেয়। এর প্রায়োগিক উপযোগিতা নিতান্ত কম। বর্তমান গবেষণায় লিপির পরিবর্তন কীভাবে বানান পালটে দেয়, তা বুঝে নিতে সাহায্য করে ভারতী লিপির নিরীক্ষামূলক প্রস্তাব।

৪.৫.৩ আইআইটি মাদ্রাসের ভারতি লিপি[৯] এবং বাংলা বানান

আইআইটি মাদ্রাসের অধ্যাপক শ্রীনিবাস চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে একদল গবেষক 'ভারতি লিপি'-র উদ্ভাবন করেছেন। তার নমুনা নীচে দেওয়া হল[১০] —

স্বরবর্ণ

ব্যঞ্জনবর্ণ

[৯] সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে বানান হওয়া উচিত ছিল 'ভারতী'। -ঙীপ্ স্ত্রীপ্রত্যয়। এখানে লিপির নামের বানান অপরিবর্তিত রাখা হল। দ্র. (*MW Cologne Scan*)

[১০] ভারতি লিপির গবেষকদের তৈরি 'সুন্দরভারতি' ফন্ট ব্যবহার এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। ফন্টের লিংক- https://bharatiscript.com/#fonts

নির্বাচিত যুক্তব্যঞ্জন

ক্ত=ǿṅt ক্ষ= ǿṣ চ্ছ= ċċ ঞ্জ= ċṗ ক্ক= ǿǿ ত্র= ṫr জ্ঞ= ṗċ ঙ্গ= ȯǿ

নমুনা বাক্য

১। অমলকান্তি আমার বন্ধু= Ↄmlǿṅṫ Ↄm̄r ụṅṭ̆

২। লোকসান পুষিয়ে তুমি রাঁধবে মায়া প্রপঞ্চ ব্যঞ্জন= ȍǿS̄n ŭṣ̂ẙ ŭm̊ r̄ṫụ̈ m̄ẙ ụ̇ruċċ ụ̇vċṗn

৩। বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে= ụ̂ṣǿ m̄S ṫr ɛ̄ṫụ̆ṗl ṭ̄ǿ

ঠিক সুনীতিবাবুর রোমক লিপির প্রস্তাবের মতোই, ভারতি লিপি জাতীয়তাবাদী প্রণোদনা থেকে সঞ্জাত। ভারতি লিপির ওয়েবসাইটের হোমপেজে রয়েছে স্পষ্ট ঘোষণা: “One Nation. One script” (*Bharati*)। কী কারণে প্রয়োজন হল ভারতি লিপির? বর্তমানে ভারতে সর্বত্র— সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে— রোমক লিপির বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। আধার কার্ড, পাসপোর্ট, ভোটার কার্ড, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, আদালতের নথি ইত্যাদি বিবিধ সরকারি নথিপত্রে রোমক লিপি— স্থানীয় লিপির সঙ্গে— ব্যবহৃত হয়। এমনকি, দোকানের নামফলক, খাদ্যপণ্যের প্যাকেট, চলচ্চিত্র বা গানের সাবটাইটেল, ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের ঠিকানা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সর্বজনবোধ্যতার স্বার্থে রোমক লিপির ব্যবহার বাড়ছে। রোমক লিপি রৈখিক (linear) হওয়ায় কম্পিউটার, মোবাইল বা মুদ্রণযন্ত্রে সহজে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু ভারতীয় ভাষাগুলির উচ্চারণপ্রকৃতির সঙ্গে রোমক লিপি পুরোপুরি মানানসই নয়। ভারতি লিপির ওয়েবসাইটে যুক্তি সাজানো হয়েছে এইভাবে —

> Simplicity is the virtue of the English script, but lack of enough letters is its shortcoming. For example, it doesn't have separate letters for long vowels which are commonly used in India. The name of the country itself, Bharat, for example, uses the letter 'a' twice; the first one being the long 'a' and the second one being the short 'a'. But because of the lack of long vowels in English, we are forced to use the same for both. Because of this, Bharat (भारत) as in the name of our country and Bharat (भरत) as in the name of a person, cannot be differentiated from each other when written in English. (*Bharati Lipi - A Phonetical Superset of Indian Languages*)

এই লিপির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গবেষকদের আশা, ভারতি লিপি রোমক লিপির এইসব সীমাবদ্ধতা দূর করতে পারবে। সরকারি নথিপত্রে ভারতি লিপি ব্যবহৃত হলে দেশীয় নাম বা জায়গার বানান ভুলের সম্ভাবনা থাকবে না। সর্বভারতীয় ঐক্য স্থাপনে সুবিধা হবে। আন্তর্জাতিক স্তরেও একাধিক ভারতীয় লিপি ব্যবহারের আর দরকার হবে না। এই সবই খাতায়-কলমে বেশ সদুদ্দেশ্য বলে মনে হতে পারে। বাস্তবে কিন্তু ভারতি লিপি বাংলা ভাষার বানান পরিস্থিতি জটিলতর করে তোলে। এই লিপির মূল সমস্যা — বাংলা বানানকে নিরঙ্কুশভাবে ধ্বনিতাত্ত্বিক করে তোলা। ধরা যাক, ‘স্ত্রী’ শব্দটি Ṣṫr̂ রূপে ভারতি লিপিতে লেখা হবে। কিন্তু এতে মুদ্রণের সমস্যা কিছু কমল কি আদৌ? ভারতি লিপি মুদ্রণের সুবিধার্থে রৈখিক হতে চেয়েছিল। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, হস্-চিহ্ন, স্বরবর্ণের

চিহ্ন (আ-কার, ই-কার, উ-কার ইত্যাদি) বোঝানোর জন্য এই লিপিকে দ্বিতল আকৃতি ধারণ করতে হচ্ছে। ř হরফটি দ্বিতল। তা বঙ্গাক্ষর 'রী'-এর বদলে ব্যবহার করলে মুদ্রণে কী সুবিধা হবে, তার কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না। বাংলায় ত্রিতল যুক্তাক্ষরের সংখ্যা খুব বেশি নয়। র্দ্ধ, চ্ছ্র, র্ত্ত ইত্যাদি কয়েকটি মাত্র পাওয়া যায়। তাদের মুদ্রণের জন্য আলাদা একটি লিপির প্রস্তাব যুক্তিসংগত নয়।

ভারতি লিপির আরেকটি বড়ো সমস্যা— এই লিপি পাঠকের দৃষ্টিকোণকে গ্রাহ্য করেনি। কেবলই মুদ্রণের সুবিধার কথা ভেবেছে। ṡtř মানে আসলে স্‌ত্‌রী। বাংলাভাষীরা এইভাবে যুক্তাক্ষরকে ভেঙে পড়তে অভ্যস্ত নন। দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে এইভাবে পড়া অসুবিধাজনক এবং সময়সাপেক্ষ। যুক্তাক্ষরের উচ্চারণের সূক্ষ্ম ব্যাকরণগত সমস্যাও ভারতি লিপিতে বিবেচনা করা হয়নি। লেখা হয় কাঞ্চন (কাঞ্‌চ্‌ন/ ώǰɷn); কিন্তু ঞ-এর উচ্চারণ না হয়ে পড়া হচ্ছে /kancon/। রৈখিক পদ্ধতিতে যুক্তাক্ষর ভেঙে লিখলে বাংলা উচ্চারণ বিকৃতি ঘটবে। একইভাবে জ্ঞ (জ্‌ঞ/ṗɷ), ক্ষ (ক্‌ষ/ώṡ̤), ক্ব (ক্‌ব/ώʋ̤) ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনবর্ণদুটি যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। ভারতি লিপিতে রৈখিক পদ্ধতিতে যিনি পড়ছেন ṗǒn (জ্‌ঞান) — তিনি কীভাবে এর যথাযথ উচ্চারণ জানবেন!

বাস্তবে লেখার ক্ষেত্রেও ভারতি লিপি উপযুক্ত নয়। একটি প্রাকৃতিকভাবে বিকশিত লিপি কয়েক শতক ধরে মানুষের হাতের লেখায় বিবর্তিত হওয়ার সময় পায়। ভারতি লিপি কলম-না-তুলে লেখার ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক। ώ̄ (কা), ώ̊ (কি), ώ̆ (কু), ώ̆ (কূ), ώ̣ (খ), ώ̣̆ (ঘু) ইত্যাদি লেখার সময় কলম না তুললে ভারতি লিপিতে অক্ষরের আকৃতি পালটে যাবে। আর কলম বারবার তুলতে হলে সময়ের অপব্যয় হবে। ভারতি লিপির উদ্যোক্তারা আশাবাদী, একদিন এই লিপি ভারতীয় সমাজের সর্বস্তরে ব্যবহৃত হবে (*Bharati Lipi - A Phonetical Superset of Indian Languages*)। বাস্তবে অবশ্য সমস্যা-জর্জরিত এই লিপির সাফল্য লাভের সম্ভাবনা কম।

৪.৫.৪ পূর্ব পাকিস্তানে লিপি বিষয়ক নিরীক্ষা

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের জন্মের আগে প্রায় ২৫ বছর পূর্ববঙ্গে ভাষা-পরিকল্পনার স্তরে বিবিধ নিরীক্ষা-প্রবণতা নজরে পড়ে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশের বানান সংস্কারের ইতিহাস সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে কেবল লিপিগত পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করা হবে।

উনিশ শতকের শেষলগ্ন থেকে পূর্ববঙ্গে বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যে ধর্মীয় ভিত্তিতে ভাষা সংস্কারের একটি প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছিল। এর কিছু সামাজিক কারণ নির্দেশ করা যায়। উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষার স্পর্শে বাঙালি হিন্দুসমাজ যতটা উন্নতি করতে পেরেছিল, বাঙালি মুসলমান সমাজ কিন্তু তথাকথিত 'নবজাগরণ'-এর সুফল সেভাবে ভোগ করতে পারেনি। অথচ আগে তাঁরাই ছিলেন শাসকের ধর্মাবলম্বী। ফলে উনিশ শতকের শেষলগ্নে আরবি অক্ষরে বাংলা লেখার বিক্ষিপ্ত কিছু প্রয়াস নজরে পড়ে (শরীফ ২৬-২৭)। দেশভাগের আগে পর্যন্ত এই ধরনের প্রয়াস অবশ্য বিশেষ কোনো সাফল্য পায়নি।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর পরিস্থিতির কিছু পরিবর্তন আসে। ইসলামি আদর্শের সঙ্গে মানানসই করে বাংলা ভাষাকেও পরিবর্তিত করার তাগিদ অনুভূত হয়। 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' ১৯৪৯ সালে তাদের প্রতিবেদন পেশ করে। এখানে একদিকে যেমন বাংলা ভাষাকে আরবি অক্ষরে লেখার সুপারিশ করা হয়েছিল, অন্যদিকে হরফের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে 'শহজ বাংলা' বানানের প্রস্তাব দেওয়া হয়। যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লেখা, বাংলা বানানকে রৈখিক প্রকৃতির করে তোলা ইত্যাদি— আইআইটি মাদ্রাসের ভারতি লিপির প্রস্তাবের মতোই— জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে জরুরি বলে রাষ্ট্রের তরফে প্রচার করা হয়েছিল (ঘোষ)। বাস্তবে অবশ্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণ হঠকারীভাবে লিপি ও বানান-সংস্কারের বিরোধিতা করেছিলেন।

প্রায় সমকালেই ঢাকার বাংলা একাডেমি লিপি ও বানান-সংস্কারের কিছু প্রস্তাব পেশ করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলা বর্ণমালা থেকে কম ব্যবহৃত বর্ণ বাদ দেওয়া। বর্ণ বাদ গেলে বানানও আবশ্যিকভাবে পালটে যাবে। ১৯৬৩ সালে একাডেমির এই প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল (শরীফ ৩০-৩১)। ঋ, ঌ, ঐ, ঔ, ঞ, ৎ — এইসব বর্ণ একাডেমি বাদ দিতে চেয়েছিল। ফলে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লেখা হবে বান্‌ছা (বাঞ্ছা), গন্‌জ (গঞ্জ) ইত্যাদি।

বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের পর বানান ও লিপি বিষয়ক ঐতিহ্যবিচ্যুত কোনো নিরীক্ষা আর নজরে পড়ে না। ১৯৫২ সালের পর থেকে ভাষাকে কেন্দ্র করে জাতীয় আবেগ সুসংহত হওয়ায় বাঙালির ঐতিহ্য হিসাবে বাংলা লিপি সংরক্ষণের পক্ষে সর্বজনীন উৎসাহ লক্ষ করা যায়। পাঠ্যপুস্তককে বানান সমতাবিধানের উদ্দেশ্যে বানান-সংস্কারের কতিপয় উদ্যোগ হয়েছে অবশ্য। ৬.৬ অধ্যায়ে এগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কেবল পারম্পর্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে লিপি সংস্কারের ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

৪.৬ মুদ্রণ-প্রযুক্তি, লিপি এবং বাংলা বানান

লিপি বিষয়ে নিরীক্ষা দু'ভাবে হতে পারে। কেউ কেউ বাংলা লিপি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে অন্য কোনো লিপিতে (রোমক, ভারতী, ভারতি, আরবি-ফারসি ইত্যাদি) বাংলা ভাষা লেখার প্রস্তাব দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ বাংলা লিপির মূল কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে তাকে অল্পবিস্তর পালটে দেওয়ার পক্ষপাতী। এই দ্বিতীয় দলের মূল লক্ষ্য— মুদ্রণ-প্রযুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বাংলা লিপিকে আধুনিককালের ব্যবহার্য করে তোলা।

বাংলা লিপির খোলনলচে পালটে না দিলেও, তাতে বেশ কিছু সংস্কারের প্রস্তাব এনেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যেমন: ড়, ঢ়, য় -কে আলাদা বর্ণ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া, বর্ণমালায় ৎ-কে স্থান দেওয়া, দীর্ঘ ঋ ও দীর্ঘ ঌ পরিত্যাগ করা, কিছু বর্ণের একাধিক সহলেখর মধ্যে (যেমন: র/ ৰ) একটিকে বেছে নেওয়া ইত্যাদি (পাল ২৩৪-৩৫; মুখোপাধ্যায়, বরুণকুমার ১০০-০১)। অন্যদিকে, মুদ্রণের সঙ্গেও তিনি সরাসরি যুক্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগরীয় সাটে বাংলা ছাপানোর জন্য প্রায় ৬০০টি চিহ্ন ব্যবহার করা হত। একই ব্যক্তি মুদ্রণ এবং লিপি-সংস্কারের সঙ্গে জড়িত— এই ঘটনা কাকতালীয় নয়। মুদ্রণের প্রয়োজনেই লিপি-সংস্কার।

একই প্রবণতা পুনরাবৃত্ত হতে দেখা যায় বাংলায় লাইনোটাইপ প্রচলনের সময়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে (ভট্টাচার্য ১৪৪)। লাইনোটাইপের ব্যবহার

আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ফিয়োনা রস তৎকালীন সময়ের বিবরণ দিয়েছেন এইভাবে:

> The operation of the first Bengali Linotype upon its official inaugaration on 26 September 1935 was given a mixed reception... Despite the fact that some leading newspapers, including Amrta Bazar Patrika and The Statesman, reproduced a paragraph of Bengali text set on the Linotype, the typeface itself received no comment - although for the first time mention was made of its artist, Sushil Kumar Bhattacharya, who it was reported worked under the guidance of Jatindra Kumar Sen (Ross 294)

লাইনোটাইপ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার প্রয়াস প্রায় একই সময়ে সমাপতিত হওয়া একেবারেই কাকতালীয় নয়। এর কিছুকাল আগে থেকেই বিদ্যাসাগরীয় বর্ণমালার সীমাবদ্ধতা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছিল। ১৩২৪ বঙ্গাব্দে *সবুজ পত্র*-তে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাংলার বেখাপ বর্ণমালা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধে বানান ও লিপি সংস্কারের বেশ কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এই সংস্কারের সঙ্গে অনিবার্যভাবে এসে পড়েছিল মুদ্রণ প্রযুক্তির প্রসঙ্গ। প্রবন্ধের শেষাংশে লেখক জানিয়েছিলেন:

> রেল-গাড়ি, মোটর-গাড়ি সবই প্রথম প্রথম ঘোড়া-গাড়ির গড়নে তৈরি হয়েছিল, ক্রমে স্ব-স্ব ধর্ম অনুসারে তাদের চেহারা-বদল এসেছে। বাংলার ছাপার অক্ষরেরও এখন নিজমূর্তি ধারণ করবার সময় হয়েছে। (ঠাকুর ৭৫)

লাইনোটাইপ প্রবর্তিত হওয়ার পর বিদ্যাসাগরীয় সাটের প্রায় ৬০০টি চিহ্নের সংখ্যা কমে হল ১৭৪ (পালপলাশ বরন ২৪৪)। এর ফলে মুদ্রণের গতি বৃদ্ধি পেল। বিশেষত, দৈনিক সংবাদপত্র দ্রুতগতিতে মুদ্রণের কাজ সহজ হল (সেন, দীপঙ্কর ৫২)। ফলে লাইনোটাইপ প্রবর্তনে *আনন্দবাজার পত্রিকা* এবং অন্যান্য সংবাদপত্রের ব্যাবসায়িক উদ্দেশ্য ছিল। ইতোপূর্বে বিদ্যাসাগরীয় সাটে মুদ্রণের ক্ষেত্রে বাংলা বানানের নিয়ম বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করছিল (মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দুসুন্দর ১২০-২১)। যেমন: স্ট যুক্তাক্ষর হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর বাংলা অক্ষরডালাতে বেশ কিছু নতুন যুক্তাক্ষর (স্ট, স্টি, স্টী, স্ট্রী ইত্যাদি) সংযোজন জরুরি হয়ে পড়ল। আগে এদের জায়গায় ষ্ট (এবং ষ্ট + বিভিন্ন স্বরচিহ্ন) ব্যবহার করলেই চলত। এখন বানানের নিয়ম পালটানোর ফলে মুদ্রাকরদের সমস্যা বৃদ্ধি পেল। একইভাবে, বিদেশি শব্দে ণ্ট-এর বদলে ন্ট লেখার বিধান মুদ্রাকরদের নতুন যুক্তাক্ষর সংযোজনে বাধ্য করেছে।

লাইনোটাইপ বাংলা যুক্তাক্ষরের গঠনকে অল্পবিস্তর পালটাতে সক্ষম হয়েছিল। অর্ধবর্ণ (half-body) ব্যবহার করে যুক্তাক্ষর লেখার ফলে মুদ্রাকরের কাজ সহজ হয়েছিল। প্রত্যেকটি যুক্তাক্ষর আলাদা আলাদাভাবে অক্ষরডালায় সাজানোর আর প্রয়োজন রইল না। কিন্তু বাংলা দ্বিতল এবং ত্রিতল অক্ষর (যেমন: কি, টু ইত্যাদি), যুক্তাক্ষরের অস্পষ্ট আকৃতি ইত্যাদি সমস্যার সমাধান লাইনোটাইপ করতে পারেনি। মুদ্রণের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা যুক্তাক্ষর তিন রকমের (কোরেশী ১৯-২০) :

১। অনুভূমিকভাবে সংযুক্ত: চ্চ, ধ্ব

২। উল্লম্বভাবে সংযুক্ত: ট্র, ব্ধ, ল্ল, ত্ন

৩। সম্পূর্ণ নতুন আকৃতিবিশিষ্ট: ক্ষ, ক্ষ, জ্ঞ

লাইনোটাইপের সাফল্যের পর *আনন্দবাজার পত্রিকা* দ্বিতল এবং ত্রিতল বাংলা যুক্তাক্ষর অনুভূমিকভাবে মুদ্রণে উৎসাহী হয়েছিলেন। পারক (পার্ক), লনডন (লন্ডন) ইত্যাদি বানান শেষপর্যন্ত সাধারণ্যে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। কী ধরনের বানান মুদ্রণের পক্ষে সুবিধাজনক, তার কিঞ্চিৎ আন্দাজ পাওয়া যায় কালীচরণ পালের 'লিপিসংস্কার' প্রবন্ধ থেকে। লেখকের প্রস্তাব (পাল, কালীচরণ ৬২-৬৫)— ঙ, ঞ, ণ, ন ইত্যাদি পরিত্যাগ করে অংক, অংচল, ঘংটা, কিংতু, কিংবা ইত্যাদি বানান লেখা হোক। য, ণ, শ, ষ, ঊ-কার বাংলা বানান থেকে বাদ যাক। পরবর্তীকালে, সিতেস রায় অনুরূপ বাননীতি অনুসারে একটি পরীক্ষামূলক গ্রন্থ লিখেছিলেন।[১১] এইসব প্রস্তাব নিরীক্ষার স্তরেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে, প্রায়োগিক সাফল্য পায়নি। তবে লিপি এবং বানানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন করতে এইসব প্রস্তাবের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

৪.৭ সিদ্ধান্ত

ভাষা ও লিপির সম্পর্ক ছেদ করতে তাঁরাই চান, যাঁদের কোনো স্বার্থ রয়েছে। কখনও সেই স্বার্থের নাম 'জাতীয় ঐক্য', কখনও বা সেই স্বার্থের নাম একটি ভাষার ধর্মীয়করণ। মুহম্মদ আবদুল হাই পালটা প্রশ্ন তুলেছিলেন, প্রায় সমগ্র ইউরোপ জুড়ে একই লিপিতে বিভিন্ন ভাষা লেখা হওয়া সত্ত্বেও লিপির ভিত্তিতে ইউরোপের আন্তরিক ঐক্য স্থাপিত হয়নি —

> Muhammad Hye refuted the suggestion by saying, a common script has neither united Europe nor closed the Brit/US divide... For Hye, the attempt to Romanise Bangla is an insult to any nation proud of its heritage... Typing Bangla in English (Latin script) is not an innocent act; it has its own politics. It has its own economy. (Mortuza)

লিপি চয়ন একটি সামষ্টিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। লিপির পরিবর্তনে বানান পালটে যায়। ইতোপূর্বে আচার্য সুনীতিকুমারের রোমক লিপির প্রস্তাব কিংবা আইআইটি মাদ্রাসের ভারতি লিপির প্রস্তাব আলোচনা করার সময় তার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। অক্ষর ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন (ঊর্ধ্বকমা, বিস্ময়বোধক চিহ্ন, হস্‌-চিহ্ন, নুক্তা ইত্যাদি) বানানের অংশ হয়ে যায়। বাংলা লিপি পালটে রোমক বা ভারতি লিপি করে দিলে এই চিহ্নগুলির কী হবে? করে/ ক'রে, দিস/দিস্‌, যাও, যাও! ইত্যাদি সূক্ষ্ম ভাবগত পার্থক্য বাংলা ভাষায় বানানের মাধ্যমেই প্রকাশ করা যায়। কিন্তু অন্য লিপিতে বাংলা লেখা হলে তা সম্ভব হবে না।

বস্তুত, অন্য লিপিতে বাংলা লেখার চেষ্টা করা হলে সাধারণ মানুষের হাতে ভাষার কী করুণ পরিণতি হতে পারে, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ বাংলাদেশের 'মুরাদ টাকলা'-র ঘটনা। সামাজিক মাধ্যমে এক ব্যক্তি রোমক লিপিতে বাংলা ভাষায় মন্তব্য করেছিলেন: *Murad takla jukti dia kata bal, falti pic dicos kan! Lakapar kora kata bal* ("যেভাবে আসলো 'মুরাদ টাকলা'")। অস্যার্থ: *"মুরোদ থাকলে যুক্তি দিয়ে কথা বল, ফালতু পিক দিছস ক্যান! লেখাপড়া করে কথা বল।"* এই ধরনের বিকৃত রোমক লিপিতে বাংলা লেখকদের ব্যঙ্গ করে পরবর্তীকালে 'মুরাদ টাকলা' নামে অভিহিত করা হতে থাকে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিসরেও এই শব্দবন্ধের প্রয়োগ লক্ষ করা যায় (Newsbangla24)। কেবল হাস্য-পরিহাস নয়, বাংলা লিপির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

[১১] বিস্তারিত আলোচনার জন্য উপ-অধ্যায় ৫.৭.১ দ্রষ্টব্য।

ক্যালিগ্রাফি, শুভ-অশুভ চিহ্ন, সহলেখ (allograph) ইত্যাদিও হারিয়ে যাবে যদি বাংলা ভাষা তার নিজস্ব লিপিতে লেখা না হয়। লিপি পালটে দিলে ভাষার দৃশ্যগত সৌন্দর্যবোধ আহত হতে পারে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। জয় গোস্বামী লিখেছিলেন—

ও প্রীতি,

দীর্ঘ ঈ, হ্রস্ব ই-কারের ডানা

দুদিকে অর্ধেক মোড়া

চিঠিতে বসেছ, নিতে

বলেছ। নেবো না। (গোস্বামী ২৭৩)

বঙ্গাক্ষর ব্যতিরেকে অন্য কোনো লিপিতে লিপ্যন্তর করলে এই কবিতা তার অর্থ হারাবে। বাংলা লিপিকে পরিবর্তন করার প্রয়াস গত একশ বছরে একাধিকবার ঘটেছে। সাম্প্রতিককালে বাংলা লিপির নাম পালটে পূর্বী নাগরী/ বঙ্গ-অসমিয়া ইত্যাদি করার প্রয়াসও লক্ষ করা গেছে। অধ্যাপক পবিত্র সরকার বাংলা লিপি ঋণ নিয়ে বাংলাকেই অস্বীকার করার এই প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করেছেন এইভাবে—

> তবে আদতে ধার-করা হলেও আকৃতি পরিবর্তনের ফলে অনেক বর্ণমালায় দীর্ঘদিনের অভ্যাস আর সহবিবর্তনে গোষ্ঠীর নিজস্ব বর্ণমালা বলে গণ্য হয়েছে, এবং তার সম্বন্ধে এক ধরনের আবেগও তৈরি হয়েছে। ... এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে ঋণটি অস্বীকারের প্রবণতা দেখা যায়, যেমন ঘটেছে উত্তর-পূর্বের কোনো কোনো রাজ্যে। (সরকার ১২৯)

একটি জাতির লিপির সঙ্গে তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস জড়িত থাকে। লিপি এবং বানান পরস্পর সাপেক্ষ। ইতোপূর্বে বাংলা লিপি বর্জন করার প্রত্যেকটি প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। ভবিষ্যতে ভাষাবিজ্ঞানীদের ব্যক্তিগত নিরীক্ষা ব্যতিরেকে এই ধরনের প্রয়াসের আর কোনো সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির লিপির স্বচ্ছতাবিধানের প্রয়াসও প্রায় পরিত্যক্ত হয়েছে। ঢাকার বাংলা একাডেমিও স্বচ্ছ লিপির প্রস্তাব থেকে সরে এসেছেন। স্বাভাবিক বিবর্তনের বাইরে লিপির ক্ষেত্রে অন্তত আরোপিত সংস্কার-প্রয়াস কাজ করবে না বলেই মনে হয়।

তথ্যসূত্র

Akkas, Abu Jar M. "The Roman Cloak of Bangla Texts." *NewAge*, 21 Feb. 2021, https://www.newagebd.net/article/130788/the-roman-cloak-of-bangla-texts

Banerjee, Sudeshna. "Bengali Books for Children in Roman Script." *TheTelegraph Online*, 3 Nov. 2018, https://www.telegraphindia.com/west-bengal/bengali-books-for-children-in-roman-script/cid/1412492

Banerji, R. D. *The Origin Of Bengali Script.* University of Calcutta, 1919. *Internet Archive*, http://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.233577

Bharati. 9 Feb. 2021, https://bharatiscript.com/#fonts

Bharati Lipi - A Phonetical Superset of Indian Languages. https://bharatilipi.in/overview , Accessed 19 July 2022.

— https://bharatilipi.in/?p=about . Accessed 20 July 2022.

Chatterji, Suniti Kumar. *A Roman Alphabet for India.* Calcutta University Press, 1935, https://indianculture.gov.in/ebooks/roman-alphabet-india

—*The Origin And Development Of the Bengali Language.* Rupa, 2017.

Mitra, Rajendralal. *The Lalit-Vistara.* The Asiatic Society, 1881.

Mortuza, Shamsad. "The Hidden Politics behind Writing Bangla in Roman Script." *The Daily Star*, 21 Feb. 2021, https://www.thedailystar.net/supplements/news/the-hidden-politics-behind-writing-bangla-roman-script-2048237

MW Cologne Scan. https://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/scans/csl-apidev/servepdf.php?dict=mw&page=753 , Accessed 19 July 2022.

Nair, Shobhana K. "BJP Wants Population Control Law, Devanagiri Promotion." *The Hindu*, 14 Mar. 2020, https://www.thehindu.com/news/national/bjp-wants-population-control-law-devanagiri-promotion/article31062928.ece

Newsbangla24. "মুরাদকে সমালোচনার ভাষাতেও 'অশালীনতার' ছড়াছড়ি." *Newsbangla24*, https://www.newsbangla24.com/news/170248/Criticism-of-Murad-also-spreads-obscenity . Accessed 20 July 2022.

Report of the Official Language Commission (1956). Technical Report, Government of India, 1956, https://indianculture.gov.in/reports-proceedings/report-official-language-commission-1956

Ross, Fiona Georgina Elisabeth. *The Evolution of the Printed Bengali Character from 1778 to 1978.* School of Oriental and African Studies, University of London, 1988. *DOI.org (Datacite)*, https://eprints.soas.ac.uk/id/eprint/29311

"Susunia." *Susunia / Bankura District, Government of West Bengal / India*, https://bankura.gov.in/tourist-place/susunia/ . Accessed 3 Dec. 2022.

Vaidya, P. L. *Lalita-Vistara*. The Mithila Institute of Post-graduate Studies and Research, in Sanskrit Learning, 1958.

Zürcher, Erik J. *Turkey: A Modern History*. Third, I.B. Tauris, 2003.

কোরেশী, ফেরদৌস আহমদ. *বাংলা বর্ণমালার এনাটমী*. সমীক্ষা প্রকাশনী, ১৯৯০.

গোস্বামী, জয়. "ওঃ স্বপ্ন!" কবিতাসংগ্রহ ২, তৃতীয় মুদ্রণ, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২, পৃ. ২৭৩.

ঘোষ, বিশ্বজিৎ. "পূর্ববাংলা ভাষা কমিটির প্রতিবেদন ও বাস্তবতা." *Risingbd Online Bangla News Portal*, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, https://www.risingbd.com/opinion/news/214750

চক্রবর্তী, জগন্নাথ. "বাংলা বানান সংস্কার প্রস্তাব." *ভাষা*, সম্পা. মৃণাল, প্রথম প্রকাশ, এবং মুশায়েরা, ২০১৮.

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার. "ভারতে রোমক লিপি." *সাংস্কৃতিকী*, অখণ্ড সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৯.

ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ. "বাংলার বেখাপ বর্ণমালা." *সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী সংকলন*, সম্পা. গৌতম চট্টোপাধ্যায় এবং সুভাষ চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মশতবার্ষিক সমিতি, ১৯৭২.

পাল, কালীচরণ. "লিপিসংস্কার." *প্রসঙ্গ বাংলাভাষা*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৩.

পাল, পলাশ বরন. "বাংলা হরফের পাঁচ পর্ব." *মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা বই*, সম্পা. স্বপন চক্রবর্তী, প্রথম প্রকাশ, অবভাস, ২০০০.

বিশ্বাস, অচিন্ত্য. *বাংলা পুথির কথা.* বিদ্যা, ২০১৩.

ভট্টাচার্য, মিতালী. *বাংলা বানানচিন্তার বিবর্তন.* প্রথম সংস্করণ, পারুল প্রকাশনী, ২০০৭.

মুখোপাধ্যায়, জয়দীপ. "শুশুনিয়া লিপি ও চন্দ্রবর্মা." *আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন*, ১৭/০২/২০১৯, https://www.anandabazar.com/editorial/article-on-susunia-script-1.953058

মুখোপাধ্যায়, বরুণকুমার. "বাংলা মুদ্রণের চারযুগ." *বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*, সম্পা. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, ১৯৮১.

মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দুসুন্দর. "বর্ণমালা ও বানান সমস্যা." *বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*, সম্পা. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, ১৯৮১.

"যেভাবে আসলো 'মুরাদ টাকলা.'" *Jugantor*, https://www.jugantor.com/social-media/496910/যেভাবে-আসলো-মুরাদ-টাকলা , সংগৃহীত- ২০ জুলাই, ২০২২

শরীফ, আহমেদ. *বাঙলাভাষা-সংস্কার আন্দোলন.* আগামী প্রকাশনী, ২০১৮.

সরকার, পবিত্র. *লিপি: ইতিহাস ও নির্মাণ.* প্রথম প্রকাশ, স্পার্ক বুক কোম্পানি, ২০২১.

সিন্‌হা, কৃষ্ণকুমার. *হাজার বছরের বাংলাভাষা— লিপি ও সাহিত্য.* ভারতী লিপি রিসার্চ সেন্টার, ২০২০.

সেন, দীনেশচন্দ্র. "বঙ্গলিপির আদিকথা." *বঙ্গ-প্রসঙ্গ*, সম্পা. সুশীল রায়, প্রথম প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ ভবন, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ.

সেন, দীপঙ্কর. *মুদ্রণচর্চা.* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০০.

পঞ্চম অধ্যায়: বাংলা বানানে বিকল্প স্বর

৫.১ বিকল্প বানান: সংজ্ঞা নির্মাণ

বানান প্রমিতকরণ এক ধরনের কর্তৃত্ব জ্ঞাপন। এই কর্তৃত্বের যাথার্থ্য দু'ভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে—ব্যাকরণগত যুক্তি এবং সামাজিক ক্ষমতা। কোনো প্রস্তাবিত বানান বৃহত্তর জনসাধারণ কেন মেনে নেবেন? সেই বানানের নিশ্ছিদ্র ব্যাকরণগত যুক্তির প্রভাবে মান্যতা তৈরি হতে পারে। যেমন: কি এবং কী বানানের ফারাক রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন।[১] অথবা ক্ষমতাবান কোনো সংস্থা বা ব্যক্তি যুক্তি ব্যতিরেকেও সামাজিক প্রভাবের ফলে প্রমিত বানান নির্মাণ করতে পারেন। যেমন: 'চক্ষুরোগ' বানানটি ব্যাকরণগতভাবে ভুল হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি একে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[২] এছাড়াও বিভিন্ন কারণে একটি বানান 'প্রমিত' তথা সামাজিকভাবে স্বীকৃত হয়ে উঠতে পারে। প্রথম অধ্যায়ে (উপ-অধ্যায় ১.৬) সেই কারণগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এই কর্তৃত্বপরায়ণতার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে বিভিন্ন ধরনের বিকল্প বানানের অভ্যাস। বাংলা বানান সংক্রান্ত বেশিরভাগ আলোচনা প্রধানত প্রমিত বানানের যাথার্থ্য বিষয়ে আলোকপাত করে। প্রমিতকরণের বিরুদ্ধে গড়ে-ওঠা বিকল্প বানান সম্পর্কে কোনো বিদ্যায়তনিক গবেষণা বাংলা ভাষায় হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। অথচ বিকল্পকে বাদ দিয়ে প্রমিতকরণের প্রক্রিয়া সম্যকভাবে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে 'বিকল্প'-এর সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে নেওয়া প্রয়োজন—

- নিছক ভুল বানানকে 'বিকল্প' আখ্যা দেওয়া যায় না। আমরা কথা বলতে চাইছি বাংলা বানানের ইতিহাসে সচেতন বিকল্প নির্মাণের বিবিধ প্রয়াস সম্পর্কে।
- প্রচলিত বানানবিধির বিরোধিতা করে প্রকাশিত কোনো বানানবিধি নিজেই যদি প্রমিত বানানবিধি হয়ে ওঠে, তাকে বিকল্প বলা যায় না। যেমন: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির পরে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধিকে কিন্তু 'বিকল্প' বলা যায় না। অথবা, রবীন্দ্রনাথের কি/কী সম্পর্কিত প্রস্তাব তৎকালীন বাঙালির লিখন-অভ্যাসের বিপরীতে থাকলেও প্রমিত-বিধি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ায় একে 'বিকল্প' বলে অভিহিত করা যাবে না।

---

[১] "কি যেখানে অব্যয় সেখানে প্রশ্নের সংকেত। ... প্রশ্নসূচক কি শব্দের অনুরূপ আর-একটি 'কি' আছে, তাকে দীর্ঘস্বর দিয়ে লেখাই কর্তব্য। এ অব্যয় নয়, এ সর্বনাম" (ঠাকুর ৬১০, ৬১৮)। এই বক্তব্য আরেকটু স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে দেবপ্রসাদ ঘোষকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে: "আমার বক্তব্য এই যে, অব্যয় শব্দ "কি" এবং সর্বনাম শব্দ "কী" এই দুইটি শব্দের সার্থকতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ... "তুমি কি জানো সে আমার কত প্রিয়" আর "তুমি কী জানো সে আমার কত প্রিয়" এই দুই বাক্যের একটাতে জানা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হচ্চে আর একটাতে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্চে জানার প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্বন্ধে, এখানে বানানের তফাৎ না থাকলে নিশ্চিতরূপে আন্দাজ করা যায় না" (ঘোষ, দেবপ্রসাদ ১২৬)। বিস্তারিত আলোচনার জন্য পলাশ বরন পালের প্রবন্ধ 'কি বনাম কী' দ্রষ্টব্য (পাল, *আ মরি বাংলা ভাষা* ৫৬-৬৭)।

[২] যুক্তি: বহুল-প্রচলিত 'চক্ষু' শব্দটিকে অর্ধতৎসম ধরে নিয়ে আকাদেমি 'চক্ষুরোগ' বানানকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। একই কারণে 'চক্ষুষ্মান' বানানও স্বীকৃতি পেয়েছে (সরকার প্রমুখ ৫২২)।

- বানান- অথবা লিপি-সংস্কারের বিক্ষিপ্ত প্রস্তাবকেও 'বিকল্প' বলা হচ্ছে না। বিকল্প বানান আবশ্যিকভাবেই হবে অপ্রমিত এবং স্বল্প প্রচলিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, সাহিত্য সংসদ, ঢাকা বাংলা একাডেমি প্রভৃতি সংস্থার হাত ধরে বাংলা বানান বর্তমানে একটি নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু যদি তা না হত? যদি অন্য পথে প্রবাহিত হত বাংলা বানানের নিয়ম, তাহলে কি উন্নততর কোনো বানানবিধি বাংলা ভাষায় প্রচলিত হওয়া সম্ভব ছিল? বিকল্প বানানের ইতিহাস এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে সাহায্য করে। বিকল্প প্রস্তাবসমূহের মধ্য থেকে প্রমিতের বৃত্তে গ্রহণ করার মতো উপাদান কিছু রয়েছে কি না, তাও বিবেচনা করা যেতে পারে।

৫.২ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিকল্প বাংলা বানান

বাংলা বানানের বিকল্প পথ নির্মাণের সচেতন প্রয়াস কবে থেকে শুরু হয়েছে? আপাতভাবে মনে হতে পারে, ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি প্রকাশিত হওয়ার আগে কোনো বানানকেই 'বিকল্প' বলে অভিহিত করা যায় না। কারণ, প্রমিতের ধারণা প্রতিষ্ঠিত না হলে কোনো বানান-প্রস্তাবকে বিকল্পই বা বলা যাবে কী করে! কিন্তু বিকল্প বানান মানে শুধু এই নয় যে, তা প্রমিত বানানবিধির বিরোধিতা করবে। প্রচলিত বানানকে সচেতনভাবে অস্বীকার করাও এক ধরনের বিকল্প নির্মাণের প্রয়াস বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। যা প্রথাগত ব্যাকরণকে অস্বীকার করে, তা-ই বিকল্প। এখন প্রশ্ন হল, বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এই ব্যাকরণ নামক প্রথা শুরু হচ্ছে কবে থেকে?

মধ্যযুগে বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ শেখানোর জন্য বাংলায় আলাদা কোনো পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়নি। তখন রাজভাষা ছিল ফারসি। অর্থকরী বিদ্যা হিসাবে বাঙালির সন্তানকে ফারসি ব্যাকরণ আয়ত্ত করতে হত। অন্যদিকে, ধর্মীয় তাৎপর্যে কুলীন ভাষা ছিল সংস্কৃত। উভয়ের চাপে পড়ে দেশীয় ভাষা বাংলার ব্যাকরণ রচনার পরিকল্পনা মধ্যযুগের লেখকদের মাথায় আসেনি। *বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা* গ্রন্থে পরমেশ আচার্য জানাচ্ছেন —

> আর ব্রাহ্মণদের লেখাপড়া সংস্কৃত শিক্ষার গণ্ডিতে আটকে ছিল বলেই মনে হয়। মাতৃভাষা এবং পার্থিব বিষয়ের সঙ্গে সে শিক্ষার কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় ।
>
> ... প্রাক্-ব্রিটিশ আমলে রাজকর্মচারী, জমিদার, পুরোহিত, প্রভৃতি উঁচুশ্রেণির লোকেরা প্রধানত আরবি-ফারসি বা সংস্কৃত শিক্ষা করত। কেউ কেউ বাড়িতে হয়তো বাংলাও শিখত। (আচার্য ৮৮, ১২৪)

মধ্যযুগে বাংলা ব্যাকরণ রচিত হওয়ার আরেকটি কারণ অনুমান করেছেন অধ্যাপক নির্মলকুমার দাশ। তাঁর মতে, তুর্কি আক্রমণের পর বাংলাদেশে আগত বিদেশি শাসকেরা বেশ দ্রুত বাংলা শিখে নেন। ফলে শাসকের শেখার প্রয়োজনে আলাদা কোনো বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয়নি —

> ... পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের মধ্যেই দেশের মুসলমান সুলতানেরা এদেশে উপনিবিষ্ট হয়ে প্রজাদের সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্যের দ্বারা বিপুল ভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ছেন। ... ফলে তাঁদের বাংলা শিখাবার জন্য আর পৃথকভাবে ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজন হয় নি। (দাশ, নির্মলকুমার ৮৮)[৩]

প্রথম বাংলা ব্যাকরণ লিখলেন জেসুইট মিশনারিরা। ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দের ৩ জানুয়ারি মার্কোস আন্তোনিও সান্তুচি (Marcos Antonio Santucci) নামে এক পাদরি গোয়ার জেসুইট প্রোভিন্সিয়ালে পাঠানো এক চিঠিতে লেখেন যে, তিনি এবং অন্যান্য ধর্মযাজকরা মিলে বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণ এবং শব্দসম্ভার তৈরি করেছেন—

> The fathers [Ignatius Gomes, Manoel Sarayva and himself] have not failed in their duty: they have learned the language well, have composed vocabularies, a grammar, a confessionary and prayers; they have translated the Christian Doctrine [*Doctrina Christa* or Catechism], etc., nothing of which existed until now. (Hosten 46)[৪]

তবে সান্তুচি-কথিত এই ব্যাকরণের সন্ধান পাওয়া যায়নি। সান্তুচির পরে উল্লেখযোগ্য বৈয়াকরণ হলেন মানোয়েল দ্য আসসুম্পসাঁও। ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে লিসবন থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর রচিত *Vocabulario Em Idioma, Bengala & Portuguez* (Khondkar 36–37)। ড. সুশীলকুমার দে অবশ্য এই বইটির নাম সামান্য আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন।[৫] এর পাশাপাশি পর্তুগিজ মিশনারিরা কিছু ধর্মপুস্তকও রচনা করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে সেগুলির আলোচনা প্রাসঙ্গিক হলেও ব্যাকরণের পরিসরে সেগুলি উল্লেখযোগ্য নয়। এরপর ব্রিটিশদের হাতে বাংলা ব্যাকরণ ক্রমশ একটি প্রমিত রূপ ধারণ করতে থাকে।

আসসুম্পসাঁওয়ের ব্যাকরণ প্রকাশিত হওয়ার ৩৫ বছর পর ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হবে হালেদের বিখ্যাত ব্যাকরণ বই *A Grammar of the Bengal Language*। হালেদ সহসা কোনো ব্যক্তিগত বা বিদ্যাচর্চাগত প্রণোদনা থেকে ব্যাকরণ রচনা করেননি। তাঁর ব্যাকরণ রচনার প্রেক্ষাপটে কাজ করেছিল ব্রিটিশদের বাণিজ্যনীতি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লক্ষ্য ছিল নির্বিঘ্নে বাণিজ্য করা। দেশীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসকে তারা প্রয়োজন-মাফিক গ্রহণ করেছিল। বাণিজ্যের স্বার্থে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ, পর্দাপ্রথা ইত্যাদি বহু কুসংস্কার বিষয়ে ব্রিটিশরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করেনি। এই নীতির সামাজিক প্রভাব বর্তমান আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক। তবে দেশীয় ভাষাসমূহ এই নীতির ফলে সমৃদ্ধ হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকদের বাংলা শেখার প্রয়োজন হওয়ায় ঘরোয়া কথোপকথন আর সাহিত্যের সীমা পেরিয়ে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ক্রমশ একটি সর্বজনমান্য রূপ পরিগ্রহ করার দিকে অগ্রসর হল। লেখা হল ব্যাকরণ, পাঠ্যপুস্তক। বানান সংক্রান্ত নিয়মকানুন কী হওয়া উচিত, সেই প্রসঙ্গে আলোচনাও শুরু হল। শ্রীশ চৌধুরী ব্রিটিশদের প্রভাবে দেশীয় ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছিল বলে জানাচ্ছেন —

---

[৩] এই গবেষণাপত্রটি ১৯৮৭ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সেই বই দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় বর্তমান নিবন্ধে ভারত সরকারের 'শোধগঙ্গা' ওয়েবসাইটে সংরক্ষিত গবেষণাপত্রের পাণ্ডুলিপিটি তথ্যসূত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। পাণ্ডুলিপির লিংক- http://hdl.handle.net/10603/151273

[৪] কলকাতার সেন্ট জ়েভিয়ার্স কলেজের ফাদার এইচ হস্টেন উপর্যুক্ত চিঠির তথ্যসূত্র জানাচ্ছেন, *O Chronista de Tissuary, Goa*, Vol. II, 1867, p 12।

[৫] আসসুম্পসাঁও রচিত ব্যাকরণ বইটির নাম ড. সুশীলকুমার দে-র গ্রন্থে এইভাবে পাওয়া যায়: 'Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez' (De 75)।

> This policy had a positive effect upon the native languages. Many languages spread out of the domain of home of their native speakers into public domains of administration, education and mass communication. This enriched their lexicon, forced them to standardise their spelling and writing system, and made them a medium of instruction and mass communication. (Chaudhary 310)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এই উদ্যোগের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে হালেদ ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত বাংলা ব্যাকরণ বই প্রণয়ন করেন। জোনাথন ডানকান ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইম্পের নিয়মাবলি (Impey's Code) অনুবাদ করে ১৫০০০ টাকা পান। এইচ পি ফরস্টার সর্বপ্রথম ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষিক অভিধান রচনা করলেন (Chaudhary 329–30)। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয় উইলিয়াম কেরির *A Grammar of the Bengalee Language*। কেরি তাঁর বইয়ের ভূমিকায় হালেদের কৃতিত্ব স্বীকার করেছেন; তবে সান্তুচির ব্যাকরণ সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না —

> Much credit is due to Mr. Halhed, except whose work, no Grammar of this language has hitherto appeared. (Carey iv)

কেরির ব্যাকরণ-গ্রন্থের একাধিক পরিমার্জিত সংস্করণ পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়। উইলিয়াম কেরির পরে যে ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন, তিনি হলেন জি সি হটন (Graves Chamney Haughton)। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর *Rudiments of Bengali Grammar*। মোহম্মদ আবদুল কাইয়ুম তাঁর গবেষণায় অভিমত জ্ঞাপন করেছেন, হালেদ, কেরি এবং হটনের ব্যাকরণ বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়নে সাহায্য করেছিল। সংস্কৃত ব্যাকরণকে আদর্শ বলে মেনে নিয়ে ইতোপূর্বে সংস্কৃত পণ্ডিতরা প্রাকৃত, কিছু দ্রাবিড় ভাষা, এমনকি ফারসি ব্যাকরণ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করেছিলেন। ফলে ব্রিটিশদের প্রয়োজনে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার যখন প্রয়োজন দেখা দিল, তা সংস্কৃতের ছাঁচে রচিত হল —

> Sanskrit pundits have been analysing and teaching Sanskrit grammar since the day of Pacini and had devised a system of analysis and description based on Sanskrit which they could use effectively in analysing and describing the Prakrits, some Dravidian languages and even Persian.... Following the trend of Carey or Radhakanta Dev, so many Bengali grammars were written by the Bengalis in the nineteenth century stressing the fact that, as Sadhubhasa was based on the Sanskrit language, Bengali grammar should be based on Sanskrit grammar. (Qayyum 319–22)

এই সংস্কৃতায়নের ফলে বাংলা ভাষার স্বকীয়তার বহিঃপ্রকাশ কিয়দংশে নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ন হয়। অন্যদিকে আবার, সংস্কৃতের ছাঁচে রচিত হওয়ায় বাংলা ব্যাকরণের একটি প্রমিত রূপ সহজে সাধারণ্যে প্রচারিত হয়। সংস্কৃতকে অবলম্বন না করলে বাংলা ব্যাকরণ হত বর্ণনামূলক (descriptive)— নির্দেশমূলক (prescriptive) নয়। এতে ভাষাবিজ্ঞানীদের খুশির কারণ ঘটলেও, একটি ভাষায় ন্যূনতম নিয়মের বাঁধন না থাকলে তাকে সম্ভবত উন্নত ভাষা বলে গণ্য করা যায় না। সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, ব্রিটিশ মিশনারিদের আমল থেকে বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃতের ছাঁচ অবলম্বন করে ক্রমশ প্রমিত রূপ ধারণ করতে শুরু করেছে। পরে যত দিন যাবে, এই প্রমিতকরণের বাঁধন আরও দৃঢ় হবে। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম ইয়েটস লিখবেন *Introduction to the Bengali Language*।

ক্রমশ বাঙালিরাও মাতৃভাষার ব্যাকরণ রচনায় অগ্রসর হবেন।[৬] রাধাকান্ত দেবের *সংক্ষিপ্ত শিক্ষাপুস্তক* (১৮১৮), রাজা রামমোহন রায়ের বিখ্যাত গ্রন্থ *গৌড়ীয় ব্যাকরণ* (১৮৩৩), ভগবচ্চন্দ্র বিশারদের *সাধুভাষার ব্যাকরণসার সংগ্রহ* (১৮৪০), ব্রজকিশোর গুপ্ত রচিত *বঙ্গভাষা ব্যাকরণ* (১৮৪০), ক্ষেত্রমোহন দত্তের *গৌড়ীয় ব্যাকরণ* (১৮৪১) ইত্যাদি গ্রন্থ ধীরে ধীরে বাংলা ব্যাকরণ তথা বানানের প্রমিত একটি কাঠামো গড়ে তুলবে। এইসব ব্যাকরণগ্রন্থের সম্পূর্ণ কোনো তালিকা প্রণয়ন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে বাংলা বানান প্রমিত হওয়ার কালে গোড়ায় গলদ রয়ে গেছে, তা মনোযোগী পাঠকের নজরে ধরা পড়ে। পূর্বোক্ত সংস্কৃতায়নের ফলে বাংলা শব্দের উচ্চারণ বাঙালির নিজস্ব ঘরানার হলেও বানান নির্ধারিত হল সংস্কৃতের নিয়মানুসারে। ফলে দীর্ঘ স্বরধ্বনি (ঈ, ঊ), ঋ, তিনরকম ঊষ্মধ্বনি ইত্যাদি বাঙালির উচ্চারণে না থাকলেও, লেখ্য বানানে বেশ পাকাপাকি স্থান করে নিল। সংস্কৃত-নির্ভর বাংলা বানানের এই বিভ্রান্তির অবসান অদ্যাবধি হয়নি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাংলা ব্যাকরণ নির্মাণের আদিযুগে বাংলা বানানের নিজস্ব স্বরকে অবদমিত করে প্রমিতকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই প্রমিতকরণকে অস্বীকার করে একাধিকবার বাংলা বানানের বিকল্প পথ নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে। ভাষাতত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক-সামাজিক গুরুত্বের নিরিখে বিকল্প বানানের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মাইলফলক নিম্নরূপ —

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লেখা জন মারডকের বানান-বিষয়ক পত্র
- যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির লিপি-সংস্কার প্রস্তাব
- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির বিপক্ষে দেবপ্রসাদ ঘোষের প্রস্তাব
- হাংরি-শ্রুতি প্রজন্মের বানান-নিরীক্ষা তথা অণুপত্রিকায় বিকল্প বানান
- নিরীক্ষামূলক বানান-ভিত্তিক কিছু সাম্প্রতিক গ্রন্থ
- অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তীর বাংলা বানান-সংস্কার প্রস্তাব
- পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি প্রসঙ্গে পলাশ বরন পালের প্রস্তাব
- পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধির অন্যান্য বিরোধীপক্ষ

লক্ষণীয়, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একই আদর্শের ওপর ভিত্তি করে বাংলা বানানের বিকল্প পন্থা নির্মাণের চেষ্টা করা হয়নি। যেমন: দেবপ্রসাদ ঘোষের কাছে বিকল্প মানে ছিল বাংলা ব্যাকরণের সংস্কৃতায়ন দৃঢ়তর করা, আবার মুহম্মদ শহীদুল্লাহের কাছে বিকল্পের ধারণা ছিল সংস্কৃতায়নের বিরোধিতা করে বাংলার নিজস্ব স্বরের অনুসন্ধান। উভয়েই প্রচলিত বানান-কাঠামোর বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু ভিন্ন আদর্শগত প্রণোদনা থেকে। বর্তমান অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে উপরি-উক্ত বিভিন্ন বিকল্প বানানের প্রস্তাবগুলি আমরা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখব। আমাদের মূল উদ্দেশ্য: প্রচলিত বিধির বাইরে বাংলা বানানের অন্যতর কোনো পন্থা তৈরি হওয়া সম্ভব কি না, তা যাচাই করে দেখা।

---

[৬] পূর্ণাঙ্গ তালিকা তথা প্রত্যেকটি ব্যাকরণ-গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য (দাশ, নির্মলকুমার ৪১৫-৮৩) দ্রষ্টব্য।

৫.৩ জন মারডকের বানান-বিষয়ক পত্র

প্রচলিত বাংলা বানানবিধির বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বোধহয় ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্কটিশ মিশনারি জন মারডক। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বাংলা বানান সংক্রান্ত কিছু সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন। তবে তাঁর বিকল্প প্রস্তাবগুলি প্রধানত হরফ- এবং লিপি-সংস্কারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। ব্যাকরণের আলোচনায় মারডক বিশেষ প্রবেশ করেননি। পূর্বোক্ত চিঠি থেকে মারডকের বিকল্প প্রস্তাবগুলি সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যেতে পারে —

১। 'বিরামচিহ্ন' (মারডকের ভাষায়: 'a mark, equivalent to *biram*') ব্যবহার করে ব্যঞ্জনান্ত শব্দের মুক্ত এবং রুদ্ধদলের উচ্চারণ স্পষ্ট করার পক্ষপাতী মারডক। 'বর' উচ্চারণ রুদ্ধদলান্ত, অথচ 'তত' উচ্চারণ মুক্তদলান্ত — এই ধরনের ঘটনা বিদেশির পক্ষে বিভ্রান্তিকর মনে হওয়া স্বাভাবিক। 'বিরামচিহ্ন' বলতে মারডক হস্-চিহ্ন বুঝিয়েছেন।[৭] 'বর'-এর বদলে 'বর্' লিখলে বাংলা-শিক্ষার্থী বিদেশিদের নিশ্চয়ই সুবিধা হয়; কিন্তু একইসঙ্গে বাংলা ব্যাকরণে বেনিয়মকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

২। কোনো কোনো বাংলা অক্ষরের একাধিক সহলেখ (allograph) রয়েছে। যেমন: গু/ গু, ত্ত/ তু ইত্যাদি। মারডক এক্ষেত্রে বিকল্প বর্জনের পক্ষপাতী।

৩। তৃতীয় সমস্যাটিকেই সবচেয়ে জরুরি বলে মারডক চিহ্নিত করেছেন। বাংলায় স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যতিরেকে কমপক্ষে ১২০টি যুক্তাক্ষর রয়েছে। তাদের আকৃতিও অনেকসময় অস্বচ্ছ। ঙ্গ, জ্ঞ, ঞ্জ, ষ্ণ ইত্যাদি যুক্তাক্ষরের আড়ালে কোন্ কোন্ অক্ষরগুলি নিহিত রয়েছে, তা সহজে শনাক্ত করা যায় না। মারডক উদাহরণ দিচ্ছেন, glow, help ইত্যাদি শব্দ লেখার সময় ইংরেজিতে অক্ষরগুলি একই লাইনে পাশাপাশি বসে। বাংলায় কিন্তু একই ধ্বনি প্রকাশের জন্য 'দ্বিতল' যুক্তাক্ষরের (গ্ল, ল্ল) সাহায্য নিতে হবে। ফলে মুদ্রণ প্রযুক্তির দিক থেকে রোমক অক্ষর ব্যবহার করা অনেক সুবিধাজনক।

প্রাথমিকভাবে সমস্যাগুলি লিপিবদ্ধ করার পর মারডক 'Easy Remedy' শিরোনামে কিছু সমাধানসূত্র পেশ করছেন। তাঁর প্রথম প্রস্তাব, তৎসম-তদ্ভব-দেশি নির্বিশেষে যুক্তাক্ষর ভেঙে হস্-চিহ্ন ব্যবহার করে লেখা হোক। যেমন: বন্ধু (বন্ধু), উল্কা (উল্কা), শৃঙ্খলা (শৃঙ্খলা) ইত্যাদি। মারডক জানাচ্ছেন—

> The great alteration proposed is the doing away with the joined consonants by the use of *biram.* The two other very minor points are uniformity in vowel combinations, and

[৭] যথাযথ বিচারে হস্-চিহ্নকে বিরামচিহ্ন বলা যায় না। কারণ, এটি বাক্যের কোনো অংশে কতটা সময় থামতে হবে, তা বুঝতে সাহায্য করে না। 'বিরামচিহ্ন' এবং 'যতিচিহ্ন' বস্তুত সমার্থক। অধ্যাপক সুভাষ ভট্টাচার্য বিরামচিহ্নের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে –"বাক্যে কোথাও স্বল্প বা পূর্ণ বিরতি, বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের বা পদের সুর (অর্থাৎ প্রশ্ন, বিস্ময়, নির্দেশ) ইত্যাদি বোঝাতে যেসব চিহ্ন ব্যবহার করা হয় সাধারণভাবে তাকেই বিরামচিহ্ন বলা হয়" (ভট্টাচার্য, সুভাষ, *তিষ্ঠ ক্ষণকাল: বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* ১০)। পূর্বোক্ত গ্রন্থে অধ্যাপক ভট্টাচার্য বিরামচিহ্নের তালিকায় হস্-চিহ্নকে অন্তর্ভুক্ত করেননি।

the use of the *biram* to mark invariably the suppression of the inherent vowel. (Murdoch 4)[৮]

কেবল য-ফলা, র-ফলা, জ্ঞ ইত্যাদি কয়েকটি ব্যতিক্রমকে মারডক স্বীকৃতি দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, শব্দান্তে রুদ্ধদলের উচ্চারণও তিনি হস্-চিহ্ন ব্যবহার করে বোঝানোর পক্ষপাতী। যেমন: কণ্টক্ (কণ্টক)। মারডকের প্রস্তাব মেনে নিলে লিখতে হয় 'বঙ্কিম্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়্'! এতে প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সুবিধা হয় কি না বলা কঠিন, তবে অভিজ্ঞ ভাষাব্যবহারকারীদের লিখন-অভ্যাস প্রতি পদক্ষেপে ব্যাহত হতে থাকে। শুধু ব্যাবহারিক অসুবিধাই নয়, ব্যাকরণের নিরিখেও মারডকের প্রস্তাব বর্জনীয়। 'হিম' বানান উচ্চারণের সুবিধার কথা মাথায় রেখে 'হিম্' লিখলে, স্বরসন্ধিজাত 'হিমালয়' শব্দটি সিদ্ধ হবে কী করে! 'বিদ্যুৎ' শব্দের সঙ্গে উচ্চারণ সাদৃশ্যের কথা বিবেচনা করে 'দূত' বানান বাংলায় 'দূৎ/দুৎ' করে নিলে দূতাবাস, দৌত্য ইত্যাদি শব্দগুলি নিষ্পন্ন হবে কীভাবে!

জন মারডক অবশ্য চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে রোমক হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাবের প্রতি পক্ষপাত গোপন করেননি। তবে সম্ভাব্য বাধার কথা কল্পনা করে সেই প্রস্তাব সাময়িকভাবে তিনি মুলতুবি রেখেছেন —

> There are strong arguments in favor of Romanising system; but the transition involved is so violent that I must confess I see little prospect of its being carried out extensively at present. (Murdoch 6)

মারডকের তিনটি প্রস্তাবের মধ্যে বর্ণের স্বচ্ছতা-সংক্রান্ত একমাত্র দ্বিতীয় প্রস্তাবটি পরবর্তীকালে স্বীকৃতি পেয়েছে। যুক্তাক্ষর পরিত্যাগ বা শব্দান্তে রুদ্ধদল বোঝানোর জন্য হস্-চিহ্ন ব্যবহারের প্রস্তাব বাহুল্যবোধে বাংলা ভাষায় স্বীকৃতি পায়নি।

৫.৪ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির বিকল্প প্রস্তাব

মারডকের বিকল্প বানানের প্রস্তাব কিয়দংশে হঠকারী এবং ভাষাতাত্ত্বিকভাবে অগভীর ছিল। পক্ষান্তরে, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি অন্যান্য ভারতীয় ভাষাসমূহের সঙ্গে তুলনা করে বাংলা বানান সংস্কারের কিছু প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। এই বিষয়ে *প্রবাসী* পত্রিকায় তিনি দুটি প্রবন্ধ (কার্তিক, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ এবং বৈশাখ, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ) লেখেন। দুটিরই নাম 'বাঙ্গালা অক্ষর'। পরবর্তীকালে এই দুটি প্রবন্ধ যোগেশচন্দ্র রচিত *বাঙ্গালা ভাষা: প্রথম ভাগ (ব্যাকরণ)* নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই দুটি প্রবন্ধ অবলম্বনে যোগেশচন্দ্রের বিকল্প প্রস্তাবগুলি খতিয়ে দেখা যেতে পারে—

১। মারডকের মতো সমস্ত যুক্তাক্ষর হস্-চিহ্ন ব্যবহার করে বিশ্লিষ্ট করার পক্ষপাতী নন যোগেশচন্দ্র —

[৮] ভারত সরকারের 'Indian Culture' নামক ওয়েবসাইটে সংরক্ষিত এই চিঠির ডিজিটাল প্রতিলিপি বর্তমান অধ্যায়ে তথ্যসূত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

যে যুক্তাক্ষরে স্বর কিংবা ব্যঞ্জনের আকার স্পষ্ট আছে, তৎসম্বন্ধে কথা নাই। যুক্তাক্ষর থাকাতে লেখায় সময় কাগজ পরিশ্রম বাঁচে, হসন্ত-চিহ্ন (য.) দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয় না। (রায় বিদ্যানিধি ২৪৯)

পরিবর্তে যুক্তাক্ষরের স্বচ্ছ রূপের সপক্ষে তিনি সওয়াল করেছেন। শুধু যুক্তাক্ষর নয়, বর্ণগুলির দৃশ্যগত সাদৃশ্য (ব র, ঋ ঝ, চ ছ ট ইত্যাদি) তাঁর মতে অবাঞ্ছিত।

২। স্বরবর্ণদ্যোতক বিভিন্ন 'কার' ব্যঞ্জনের ডানদিকে বসে বলে একরৈখিকতার (linearity) নিয়ম লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে যোগেশচন্দ্র অভিযোগ করেছেন। যেমন: কে= ক্+ এ। এখানে উচ্চারণ হয় /ke/, অর্থাৎ স্বরধ্বনি /এ/ পরে উচ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু দৃশ্যগতভাবে এ-কার বসছে ক-এর আগে।

৩। বাংলায় অন্তঃস্থ ব অক্ষর (ৰ) প্রচলনের পক্ষে সওয়াল করেছেন যোগেশচন্দ্র। তাঁর মতে, এর ফলে খাওয়া, শোওয়া, হাওয়া ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণ যথাযথভাবে বোঝানো যাবে। শুধু তা-ই নয়, 'বিদ্বান', 'সত্ত্ব' ইত্যাদি তৎসম শব্দের উচ্চারণও 'ঠিক হইয়া আসিবে'। অর্থাৎ, বাঙালির নিজস্ব উচ্চারণ পদ্ধতিকে যোগেশচন্দ্র 'বেঠিক' বলে চিহ্নিত করছেন।

৪। যোগেশচন্দ্র বাংলায় নাগরী र অক্ষর প্রচলন করতে চেয়েছেন। তাঁর যুক্তি, এর ফলে অন্য অক্ষরের সঙ্গে বাংলা র-এর সাদৃশ্য নিয়ে বিভ্রান্তি থাকবে না। কলমের একটানে লিখতেও সুবিধা হবে।

৫। রেফের নীচে দ্বিত্ব-বর্জনের প্রস্তাব দিয়েছেন যোগেশচন্দ্র। সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে এই দ্বিত্ব আবশ্যিক নয়।

৬। আনুনাসিক বর্ণ কিয়দংশে বর্জনের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। যোগেশচন্দ্রের যুক্তি —

গঞ্জনা ঝঞ্ঝাট লিখি, কিন্তু পড়ি গন্‌জনা ঝন্‌ঝাট। কণ্ঠ দণ্ড লিখি, কিন্তু পড়ি কন্‌ঠ, দন্‌ড। ... ইহাদের স্থানে অনুস্বার দিতে আপত্তি হয়, লুপ্তচিহ্ন (°) বসাইলেও চলে। কবর্গ পরে থাকিলে উহা দ্বারা ঙ্, চবর্গ পরে থাকিলে ঞ্, টবর্গ পরে থাকিলে ণ্ বুঝিতে আয়াস লাগে না। (রায় বিদ্যানিধি ২৫২)

যুক্তাক্ষরে ন এবং ম-এর উচ্চারণ অপরিবর্তিত রয়েছে বলে তাদের স্থানে লুপ্তচিহ্ন (°) ব্যবহার না করলেও চলে।

৭। কিছু বিশেষ শব্দে লুপ্ত ই-উচ্চারণের আভাস বোঝাতে যোগেশচন্দ্র ই-এর চৈতন ব্যবহার করে লিপি-সংস্কারের পক্ষে অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। যেমন: আৈজ, খৈল ইত্যাদি।

৮। যোগেশচন্দ্র /æ/ -এর উচ্চারণ বোঝানোর জন্য অ্যা, য়্যা, এ্যা ইত্যাদির পরিবর্তে এ বর্ণ ব্যবহারের পক্ষপাতী। তাঁর যুক্তি, এর ফলে ছাপাখানায় মুদণে ব্যবহার্য অক্ষরের সাশ্রয় ঘটবে। দুটি উপায়ে তিনি মুদ্রণকার্য সহজ করার প্রস্তাব দিয়েছেন —

ক. শব্দের বানান সহজ করা যেতে পারে। উদাহরণ: জাহাদের নীচাসক্ত অবিবেকী মন। অনিত্ত সংসার মদে মুগ্ধ অনুখ্খন।[৯]

খ. স্বরবর্ণগুলিকে বাদ দিয়ে কেবল তাদের কার-চিহ্ন ব্যবহার করে অক্ষর-সংখ্যা কমানো যেতে পারে। উদাহরণ: োহে ম্রিত্তু তুমি মোরে কি দেখাো ভয়। ো ভ ে কম্পিত নয় ামার রিদয়।

যোগেশচন্দ্রের ব্যবহৃত নতুন অক্ষরের নমুনা নীচের চিত্রে[১০] দেখানো হল—

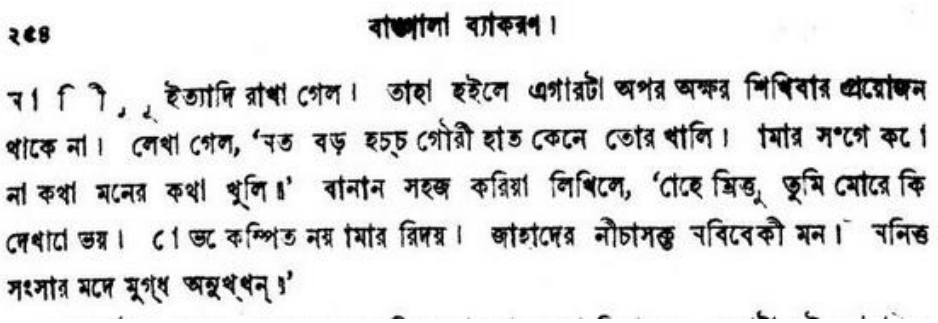

২৫৪ বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

ৰা ি ী ু ূ ইত্যাদি রাখা গেল। তাহা হইলে এগারটা অপর অক্ষর শিখিবার প্রয়োজন থাকে না। লেখা গেল, 'ৰত বড় হচ্চ গৌরী হাত কেনে তোর খালি। ামার সংগে ক ে না কথা মনের কথা খুলি।' বানান সহজ করিয়া লিখিলে, 'োহে ম্রিত্তু, তুমি মোরে কি দেখাো ভয়। ো ভ ে কম্পিত নয় ামার রিদয়। জাহাদের নীচাসক্ত ৰবিবেকী মন। ৰনিত্ত সংসার মদে মুগ্ধ অনুখ্খন্।'

চিত্র ৬.১: যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রস্তাবিত নতুন বাংলা অক্ষর

শেষ পর্যন্ত লিপি তথা বানান-সংস্কারের পক্ষে পরিবর্তনকেই যোগেশচন্দ্র অনিবার্য ধ্রুবক বলে চিহ্নিত করতে চান। তাঁর প্রস্তাবিত বানান ও লিপি সংস্কারের নমুনা —

> আমাদের আচার -ব্যবহার , আহার-বিহার , রীতি-নীতি প্রভৃতি যাবতীয় কাজে পরিবর্তন হইয়াছে, হইতেছে। এত পরিবর্তনেও যদি আমরা বাঙ্গালী আছি; সংস্কাের প েরও বাঙ্গালা অক্ষর বাঙ্গালাই থাকিবে। (রায় বিদ্যানিধি ২৫৪)

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সংস্কার-প্রস্তাবগুলি তৎকালীন মুদ্রণ-প্রযুক্তির নিরিখে কিছুটা হয়তো প্রাসঙ্গিক ছিল। তবে এদের মূল সমস্যা: প্রযুক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে বানান ও লিপি সংস্কারের প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। প্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তনশীল। ব্যাকরণের যুক্তি কিন্তু শতকের পর শতক অপরিবর্তিত থাকে। কম্পিউটার-নির্ভর আধুনিক মুদ্রণ-প্রযুক্তির আগমনের পর বাংলা বর্ণমালায় অক্ষর-সংখ্যা হ্রাসের এই মরিয়া প্রয়াস প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে অন্য ভাষার ওপরেও যোগেশচন্দ্র অত্যধিক নির্ভরতা দেখিয়েছেন। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সাদৃশ্য যে-কোনো ভাষারই স্বাভাবিক ঘটনা। ইংরেজিতে p, b, d কাছাকাছি দেখতে বলে কিন্তু রোমক লিপি পালটে অন্য ভাষা থেকে অক্ষর ঋণ নেওয়া হয় না। বাংলাতে র বা য যদি নাগরী অক্ষরে লিখতে হয়, তাহলেও বর্ণগুলির দৃশ্যগত

---

[৯] এই উদাহরণ দেওয়ার সময় যোগেশচন্দ্র অ-অক্ষরের জন্য বিশেষ একটি চিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন। দেখতে মূর্ধন্য ণ-এর মতো। প্রযুক্তিগতভাবে সেই অ-দ্যোতক অক্ষর লেখা সম্ভব না হওয়ায় বর্তমান গবেষণায় অ-অক্ষরই বজায় রাখা হয়েছে।

[১০] চিত্র ৬.১ সংগৃহীত হয়েছে এখান থেকে— https://archive.org/details/dli.bengal.10689.2915/page/n21/mode/2up?view=theater

সাদৃশ্য থেকে যাবে। ঝ ঋ, চ ট, ল ন ইত্যাদি অক্ষরের ক্ষেত্রে তখন কি করণীয়? যোগেশচন্দ্রের সংস্কার-প্রস্তাব ব্যক্তিগত স্তরে নিরীক্ষা-প্রবণতার কারণে ঐতিহাসিকভাবে স্মরণীয়। কিন্তু প্রচলিত কাঠামোকে অস্বীকার করে বিকল্প পথ নির্মাণের মতো যুক্তিগত গ্রহণযোগ্যতা এই প্রস্তাবে খুঁজে পাওয়া যায় না।

৫.৫ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বনাম দেবপ্রসাদ ঘোষ

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ব্যক্তিগত প্রতিভা এবং উদ্ভাবনী শক্তির ওপর নির্ভর করে বাংলা বানানের বিকল্প পথের অনুসন্ধান করেছিলেন। পক্ষান্তরে, দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রধানত ধ্রুপদি সংস্কৃত ব্যাকরণের ওপর ভিত্তি করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। ইতোপূর্বে *প্রবাসী* পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়েছিল প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ রচিত 'চ'ল্‌তি ভাষার বানান'। সেই বিধি অবশ্য সাধারণ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। কিন্তু *সবুজ পত্র*-উত্তরকালে চলিত বাংলার ক্ষেত্রে ক্রমশ প্রসারিত হওয়ায় চলিত বাংলার বিধি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এমতাবস্থায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হল ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে। এই বিধির উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত অ-সংস্কৃত শব্দের বানানের প্রমিত রূপ নির্ধারণ। বানানবিধির প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লেখেন —

> বাংলা ভাষায় প্রচলিত শব্দ সমূহের মধ্যে যেগুলি সংস্কৃত ভাষা হইতে অপরিবর্তিত আসিয়াছে তাহাদের বানান প্রায় সুনির্দিষ্ট। কিন্তু যে সকল শব্দ সংস্কৃত নহে, অর্থাৎ যেগুলি দেশজ বা অজ্ঞাতমূল, বিদেশাগত, অথবা সংস্কৃত বা বিদেশী শব্দের অপভ্রংশ, তাহাদের বানানে বহুস্থলে বিভিন্নতা দেখা যায়। [(ভট্টাচার্য, মিতালী ১৪৪) থেকে পুনরুদ্ধৃত]

তৎকালীন উপাচার্য কেবল অতৎসম শব্দের বানানে হস্তক্ষেপের কথা বললেও বাস্তবে কিন্তু এই নীতি মেনে চলা হয়নি। নীচে তার তিনটি প্রমাণ পেশ করা হল—

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা সমিতির সভার (২২ নভেম্বর, ১৯৩৫) কার্যবিবরণে আলাদাভাবে অতৎসম শব্দের বানান-সংস্কারের কথা বলা হয়নি —

> The Committee (the Paribhasha Committee)[১১] considered at the suggestion of the Vice-Chancellor the desirability of adopting a uniform spelling of Bengali words. (*Minutes of the Syndicate: For the Year 1935, Part Iv* 3253)

২। 'Minutes of the Syndicate: for the year 1935, part v' থেকেও জানা যাচ্ছে, পরিভাষা সমিতির অধীনে যে বানান-সমিতি গঠিত হয়েছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল বাংলা বানান সংস্কার। আলাদাভাবে অতৎসম শব্দের বানান সংস্কারের কথা সেখানে বলা হচ্ছে না —

[১১] বন্ধনীভুক্ত স্পষ্টীকরণ বর্তমান গবেষক-কৃত।

> The Committee has recently appointed a Sub-Committee to consider the problem of adopting a standard system of spelling for Bengali words. (*Minutes of the Syndicate: For the Year 1935, Part v* 27)

৩। পরের বছর, ১৯৩৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত উপাচার্যের ভাষণেও এই বানান-সমিতির উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে যথারীতি, সেখানেও সামগ্রিক বাংলা বানান সংস্কারের কথাই বলা হয়েছে —

> Our experts are also exploring the possibilities of a standardised form of spelling in Bengali. The principles on which we desire to proceed and the difficulties that await solution have been stated in the form of a questionnaire and we have invited the criticisms of scholars and writers from all parts of the province. (*Minutes of the Senate and the Faculties for the Year 1936* 104)

স্পষ্টতই, উপরের তিনটি প্রমাণ থেকে বোঝা যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির ভূমিকা এবং বানান উপসমিতির কার্যবিবরণের বয়ানে আদর্শগত ব্যবধান রয়ে গেছে। উপাচার্যের পূর্বোক্ত ভাষণে যে প্রশ্নমালার কথা পাওয়া যায়, তার প্রতিক্রিয়া খুব অনুকূল ছিল না। বানান চর্চাকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রায় ২০০টি প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে উপসমিতি বানান-সংক্রান্ত কিছু নীতি বদলাতে বাধ্য হন। ১৯৩৬ সালের সিন্ডিকেটের কার্যবিবরণ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়—

> The Bengali Spelling Sub-Committee reconsidered their report in the light of the opinion received from over 200 distinguished literatures. A revised report has been published and it is gratifying to note that Dr. Rabindranath Tagore and Dr. Saratchandra Chatterjee have signified their assent to use in their writings the modes of spelling recommended by the Committee. (*Minutes of the Syndicate: For the Year 1936, Part v* 23)

সাধারণ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা থেকে বানানবিধির প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তৎসম শব্দ অপরিবর্তিত রাখার আশ্বাস দেওয়া হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্ভবত বাংলা ব্যাকরণ-চর্চায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। তবু নতুন বানানবিধি শরৎচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা সোচ্চারে যখন ঘোষণা করে, তার কারণটি সহজে অনুমেয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান উপসমিতি আসলে শরৎচন্দ্রের নাম ব্যবহার করে নিজেদের মান্যতা বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, বানান উপসমিতি সংস্কৃত এবং সংস্কৃতজ শব্দের বানানেও যথেষ্ট পরিমাণ হস্তক্ষেপ করেছেন। বিভিন্ন জনের প্রতিবাদের মধ্যে আলাদাভাবে নজরে পড়ে দেবপ্রসাদ ঘোষের সংস্কৃত ব্যাকরণ-নির্ভর প্রতিযুক্তিসমূহ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-উপসমিতির অনধিকার হস্তক্ষেপ সম্পর্কে তিনি জানাচ্ছেন—

> ...বিশ্ববিদ্যালয়-বাণান-কমিটির প্রস্তাবলীর মধ্যে চল্‌তি ভাষার সম্বন্ধে মাত্র দুই-একটি প্রস্তাব আছে, আর সমস্তই সাধুভাষার প্রচলিত রূপের পরিবর্ত্তন ও নিয়ন্ত্রণবিষয়ক। বস্তুতঃ কমিটির অভিযান প্রধানতঃই নিয়োজিত হইয়াছে প্রচলিত সাধুভাষার রেফের পরে বর্ণদ্বিত্ব, বিসর্গ, ঈ, ণ ও ঙ-এর বিরুদ্ধে; সর্ব, আর্য, পর্যন্ত, কার্তিক, পুনঃপুন, রানি, মামি, বাঙালি, প্রভৃতি রূপের অবতারণাই ইহার নিদর্শন। (ঘোষ, দেবপ্রসাদ ২৮)

দেবপ্রসাদ ঘোষের আশঙ্কা, এই উদ্যোগের ফলে সাধুভাষার বানানে প্রচলিত স্থিরতা নষ্ট হয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। নীচে লেখকের অন্যান্য যুক্তিগুলি সংক্ষেপে পেশ করা হল —

১। তদ্ভব শব্দেও ণ বজায় রাখতে হবে। এতে কিছু ক্ষেত্রে সমোচ্চারিত শব্দসমূহের মধ্যে অর্থের পার্থক্য বজায় রাখতে সুবিধা হবে। যেমন: পর্ণ শব্দজ 'পাণ' আর 'পান' (to drink), বর্ণন শব্দজ 'বাণান' আর 'বানান' (বানানো/ to make) ইত্যাদি।

২। z-এর উচ্চারণ বোঝানোর জন্য পৃথক কোনো বর্ণকে (জ় বা জ) স্বীকৃতি দেওয়ার দরকার নেই। অনেক বিদেশি ধ্বনিই বাংলা বর্ণের সাহায্যে যথাযথভাবে প্রকাশ করা যায় না। যেমন: ইংরেজি f এবং v, ফরাসি u, জার্মান ö এবং ch ইত্যাদি। বাকিগুলির জন্য যদি নতুন বাংলা বর্ণ উদ্ভাবন না করলেও কাজ চলে, z-এর ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য।

৩। দেবপ্রসাদ ঘোষের মতে, রেফের পরবর্তী দল প্রস্বরিত (accentuated) হয়ে উচ্চারিত হয় —

> আমরা "দুর্দ্দম" শব্দ উচ্চারণ করিতে "দুর্+ দম্" এ ভাবে বলি না; "দুর্+ দ্দম্" এই ভাবেই উচ্চারণ করি। পরবর্ত্তী ব্যঞ্জনধ্বনির উপর এই জোর পড়ে বলিয়াই চল্‌তি কথায় আমরা "ধর্ম্ম" "কর্ম্ম"কে "ধম্ম" "কম্ম" এই ভাবে বলি; এই একই কারণে এই সব স্থলে পালি ও প্রাকৃতে "ধম্ম" "কম্ম" লেখা হয়। (ঘোষদেবপ্রসাদ ১১)

এই যুক্তির কারণে তিনি রেফের পর ব্যঞ্জনদ্বিত্ব বজায় রাখার পক্ষপাতী।

৪। ক্রমশঃ, বস্তুতঃ, প্রায়শঃ, পুনঃপুনঃ, প্রাতঃ ইত্যাদি ক্ষেত্রে শব্দান্তে বিসর্গ বজায় রাখতে হবে। নচেৎ ক্রমশ/ লোমশ, বস্তুত/ প্রস্তুত, পিত/শীত ইত্যাদি উচ্চারণ-বিভ্রাট ঘটার সম্ভাবনা দেখা যাবে।

৫। সংস্কৃত শব্দে ব্যবহৃত ঈপ্ প্রত্যয়ের সাদৃশ্যে অসংস্কৃত স্ত্রীবাচক শব্দেও ঈ-ব্যবকার করে স্ত্রীলিঙ্গ বোঝানো হবে। যেমন: মামী, কাকী, খুকী, রাণী ইত্যাদি। প্রচলিত ব্যতিক্রম: দিদি, ঝি, বিবি ইত্যাদি। ভাষা, দেশ, স্বত্ব বোঝাতেও ঈ-প্রত্যয় ব্যবহৃত হবে। যেমন: ঢাকী, বাঙ্গালী, ইংরাজী, ফরাসী ইত্যাদি।

৬। কি/কী বানানের প্রভেদ বাংলা ভাষায় চিরকাল ছিল না বলে দেবপ্রসাদ ঘোষ 'কী' বানান বর্জনের পক্ষপাতী।

৭। মূল সংস্কৃত শব্দে ঊ থাকলে তদ্ভব শব্দেও ঊ বজায় রাখতে হবে। যেমন: পূর্ব> পূব, চূর্ণ> চূণ, পূর্ণ> পূরা ইত্যাদি।

৮। মত/ মতো, ভাল (কপাল)/ভালো, কাল (সময়)/ কালো ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিপার্শ্ব (context) থেকে উচ্চারণ বুঝে নেওয়া যায়। আলাদাভাবে ও-কার ব্যবহার করার দরকার নেই। চাল (রীতি)/ চাল (rice), কাল (সময়)/ কাল (<কল্য) ইত্যাদি ক্ষেত্রে ও-কার ব্যবহার করা সম্ভব নয়। পরিপার্শ্বের সাহায্যেই অর্থগ্রহণ করতে হয়। তাহলে অন্যান্য শব্দেও অকারণ ও-কার যোগ বর্জনীয়।

৯। /æ/ -এর উচ্চারণ বোঝানোর জন্য অ্যা বা এ্যা ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ, এই দুটি ক্ষেত্রে স্বরবর্ণের সঙ্গে য-ফলা আ-কার যোগ করা হচ্ছে। পরিবর্তে এ বা য়্যা ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন: এসিড বা য়্যাসিড।

১০। বিদেশি শব্দে st ধ্বনিসমাবেশ বাংলায় ষ্ট দিয়ে বোঝানো উচিত, স্ট নয়। কারণ, দন্ত্য স এবং মূর্ধন্য ট -এর সমাবেশ সংস্কৃত ধ্বনিতত্ত্ব অনুযায়ী বেমানান। আর বাংলা উচ্চারণ ধরলে স-এর উচ্চারণ সংখ্যার নিরিখে নিতান্ত কম। ফলে স্ট ব্যবহার অযৌক্তিক।

১১। দ্বিস্বরধ্বনির উচ্চারণ বোঝানোর জন্য ঐ- এবং ঔ-কার ব্যবহার করতে হবে। বউ, দই ইত্যাদি বানান পরিত্যাজ্য; বৌ, দৈ ইত্যাদি লিখতে হবে।

১২। মূল সংস্কৃত শব্দে ক্ষ থাকলে তদ্ভব শব্দেও ক্ষ বজায় রাখতে হবে। যেমন: ক্ষেত্র> ক্ষেত, √ক্ষিপ্> ক্ষ্যাপা ইত্যাদি। নাহলে ক্ষুর (razor-blade) এবং খুর (গবাদি পশুর —) শব্দের মধ্যে তফাত থাকবে না।

এই তালিকা আরও দীর্ঘ করা যায়। তবে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির বিপক্ষে এগুলিই দেবপ্রসাদ ঘোষের প্রধান আপত্তি। নির্দিষ্ট কিছু শব্দের বানান কী হবে, কেবল তা নিয়ে এই বিতর্ক ঘনিয়ে ওঠেনি। মূল সমস্যাটি গভীরতর। বাংলা ভাষার বানান সংস্কার করার প্রয়োজন আদৌ আছে কি না, দেবপ্রসাদ সেই মূলগত প্রশ্নটি একের পর এক লেখায় উত্থাপন করেন। কাকে বলে বানান-সংস্কার? কেবল সংস্কারের খাতিরেই সংস্কার করা কতটা যুক্তিগ্রাহ্য? যে বানান সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে শুদ্ধ, তথাকথিত সংস্কারের পর বাংলা ভাষায় তাকে 'অশুদ্ধ' বলা যায় কি? 'বাণান-কমিটিতে ঘণ্টা কয়েক' প্রবন্ধে এই মূলগত সমস্যাটির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে —

> "আপনারা বলছেন যে রেফের পরে দ্বিত্ব বাণান চলবে না। চলবে না কথাটার মানে কি? ধরুন আমি একখানা বই University-র কাছে পেশ করি approval-এর জন্যে, এবং তাতে লেখা থাকে 'পূর্ব্ব', 'সর্ব্ব', ইত্যাদি। তাহলে সে বাণান আপনারা কাটবেন?"
>
> চারু বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "হ্যাঁ, কাটব।"
>
> এবার অতি অপ্রত্যাশিত দিক্ হইতে আমার সমর্থন আসিল; হঠাৎ শহীদুল্লা সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "চারু বাবু, এ কথাটা আপনি কি বল্লেন? শব্দটা হল সংস্কৃত, পাণিনি allow করে গেছেন, আপনি কি করে কাটেন?" (ঘোষ, দেবপ্রসাদ ৭৩)

দেবপ্রসাদ ঘোষের যাবতীয় ব্যাকরণগত যুক্তি হয়তো ভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে নির্ভুল নয়। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান উপসমিতির অধিকারের সীমা বিষয়ে তাঁর আশঙ্কা যথাযথ। বানান সরলীকরণের স্বার্থে শুদ্ধ সংস্কৃত বানানকে বাংলা ভাষায় বর্জন করা যায় কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে যা 'সরলীকরণ' কিংবা 'সমতাবিধান', সাধারণ ভাষা ব্যবহারকারীর কাছে তা অকারণ জটিলতা বৃদ্ধি বলে মনে হতে পারে। গোপ> গোপী, শ্রীমৎ> শ্রীমতী ইত্যাদি স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দের সাদৃশ্যে মামী, কাকী বানান লিখলে বাংলা ভাষার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হত? মামি, কাকি বানানে ভাষাবিজ্ঞানীরা হয়তো সন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের বিভ্রান্তি বাড়ল। কিছু ক্রুদ্ধ ভাষাভঙ্গি উপেক্ষা করে মূল বক্তব্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে দেবপ্রসাদ ঘোষের বক্তব্যের যুক্তিগ্রাহ্যতা অনস্বীকার্য।

৫.৬ অণুপত্রিকায় বিকল্প বানান

বর্তমান গবেষণা-অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি প্রকাশের ২০ বছর পরেও সাধারণ্যে স্বীকৃতি লাভ করেনি। বিভিন্ন পত্রিকায় বিদেশি শব্দের বানানে এই স্বীকৃতি কিছু বেশি (সর্বোচ্চ ৭৫%)। কিন্তু পত্রিকায় মুদ্রিত তৎসম-তদ্ভব শব্দের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি পাওয়া যাচ্ছে ৫০%, অনেক ক্ষেত্রে তার চেয়েও কম।[১২] কিন্তু প্রথম অধ্যায়ে যে পত্রিকাগুলির (*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, দেশ, প্রবাসী, সমকালীন)* বানান নিরীক্ষা করা হয়েছিল, তারা কেউই সক্রিয়ভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি। পক্ষান্তরে, অণুপত্রিকার (little magazine) জগতে কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা অনেক বেশি প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয়। বিশেষত, গত শতকের ছয়ের দশকে বেশ কিছু অণুপত্রিকায় প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার তীব্র আবহ গড়ে উঠেছিল। ফলে সাহিত্যের জগতে যাঁরা সমস্ত শৃঙ্খল ভাঙার পক্ষপাতী; বিশ্ববিদ্যালয়-অনুমোদিত বানানবিধি তাঁরা যে অস্বীকার করবেন, তা খানিক প্রত্যাশিতই।

শ্রুতি ছিল কবিতা-কেন্দ্রিক অণুপত্রিকা। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত *শ্রুতি*-র ১৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। বিভিন্ন সম্পাদকীয় বিবরণ থেকে জানা যায়, নতুন ধরনের মুদ্রণবিন্যাসের মাধ্যমে কবিতার দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকে এই পত্রিকা আলাদা গুরুত্ব দিত। বিরামচিহ্নের বিলোপ করে কবিতার প্রবহমানতা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন *শ্রুতি*-গোষ্ঠীর কবিরা। বিরামচিহ্নের বদলে প্রয়োজনমাফিক ফাঁকা স্থান (space) এবং পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসে বৈচিত্র্য এনে কবিতা-পাঠের সময় কোথায় থামতে হবে, তা নির্দেশ করা হত। গুরুত্ব অনুসারে কোনো কোনো শব্দকে আলাদা হরফে ছাপিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হত। প্রত্যক্ষভাবে প্রচলিত ব্যাকরণের বিরোধিতাও লক্ষ করা যায়। প্রচলিত বাক্যতত্ত্বকে অস্বীকার, সংযোজক অব্যয়, ক্রিয়া বিশেষণ, বিশেষণ ইত্যাদি যথাসাধ্য পরিহার করার মাধ্যমে ভাষাকে নির্মেদ করার প্রয়াস *শ্রুতি*-গোষ্ঠীর মধ্যে লক্ষ করা যায়। সমধর্মী প্রতিষ্ঠান-বিরোধী পত্রিকা ছিল *ঈগল, কালক্রম, অব্যয়* ইত্যাদি।

সন্দীপ দত্ত *বাংলা গল্প-কবিতা আন্দোলনের তিন দশক* নামক গবেষণাগ্রন্থে জানাচ্ছেন, 'প্রকল্পনা সর্বাংগীন কবিতা আন্দলন'-এর সঙ্গে যুক্ত *স্বতোৎসার* এবং *কবিসেনা* পত্রিকায় চেতনাপ্রবাহমূলক সাহিত্যকে গুরুত্ব দেওয়া হত। বিষয়ের সঙ্গে মানানসইভাবে *কবিসেনা* পত্রিকায় (৫ম বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা, ১৯৭২) 'কর্তে', 'আংগিক', 'আমাদেরি' 'এ্যান্টি' ইত্যাদি কিছু অপ্রাতিষ্ঠানিক বানান নজরে পড়ে (দত্ত, সন্দীপ, *বাংলা গল্প-কবিতা আন্দোলনের তিন দশক* ১০-১৩)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মেনে না চললেও এগুলিকে অবশ্য খুব বেশি বৈপ্লবিক বানান বলা যায় না। সন্দীপ দত্তের মতে, অণুপত্রিকা আন্দোলন সাধারণত বাংলা বানানের একেবারে খোলনলচে পালটে দেওয়ার চেষ্টা করেনি —

> ছেদচিহ্ন বিলোপ, বাক্যবন্ধর মুক্তির সুর, গতানুগতিক বিষয়ভাবনা থেকে বেরিয়ে অন্য ছাঁচে ভাষামাধ্যমকে আবিষ্কার করা, এসব লক্ষ করা গেলেও বাংলা বানান এই আন্দোলনে অটুট থেকেছে। অর্থাৎ বানানের বাস্তিল দুর্গ উড়িয়ে দেওয়া যায়নি। (দত্ত, সন্দীপ, *লিটল ম্যাগাজিন ভাবনা* ২৯)

[১২] ১.৫.৫ উপ-অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত সারণি ১.৩ দ্রষ্টব্য।

তবে মোটের ওপর বাংলা বানানের কাঠামো অপরিবর্তিত থাকলেও *সাহিত্যের সন্ধানে, সপ্ততুরগ, নৈকট্য কবিসেনা* ইত্যাদি অণুপত্রিকায় কিছু ধ্বনিসংবাদী বানান (বল্লো, ক্যানোনা, ঠানডা, তার্পর, ত্যামনটি, য্যানো ইত্যাদি) মুদ্রিত হয়েছে। *সপ্ততুরগ* পত্রিকার তরফে কবিদের ধ্বনিসংবাদী বানানে লেখা পাঠানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। বানান বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন কাজল চক্রবর্তী সম্পাদিত অণুপত্রিকা *সাংস্কৃতিক খবর*। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রভাস অ্যাকাডেমি হলে এই পত্রিকা আয়োজিত আলোচনাসভায় বক্তব্য পেশ করেন সন্তোষকুমার ঘোষ, অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তী, ড. সুশীল রায় প্রমুখ। এই সভায় প্রস্তাব পেশ করা হয়— অণুপত্রিকার সম্পাদকেরা অন্তত দুই পৃষ্ঠা করে নতুন বানান ছাপুন।

কেমন হবে এই নতুন বানানের চেহারা? *সাংস্কৃতিক খবর* পত্রিকা ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিকল্প বানান-প্রস্তাবের একটি খসড়া প্রকাশ করে। ওই বছরই সেপ্টেম্বর মাসে 'নতুন বাংলা বানান' নামে একটি ক্রোড়পত্রও প্রকাশ করে। এই খসড়া এবং ক্রোড়পত্রের ভিত্তিতে বিকল্প বানানের মূল নীতিগুলি নীচে পেশ করা হল (দত্ত, সন্দীপ, *লিটল ম্যাগাজিন ভাবনা* ৩১)—

১। বাংলা বানান হবে ধ্বনিসংবাদী এবং নির্বিকল্প।

২। শব্দের উৎসের নিরিখে তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি ইত্যাদি বিভাজন পরিত্যাগ করা হবে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সমস্ত শব্দই বাংলা শব্দ বলে বিবেচিত হবে এবং বানানের বিকল্প নিয়ম সমস্ত বাংলা শব্দের ওপরে প্রযুক্ত হবে।

৩। যুক্তবর্ণ ভেঙে একরৈখিক (linear) এবং স্বচ্ছ মুদ্রণরীতি গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনে যুক্তবর্ণ বোঝাতে বিন্দুচিহ্ন (dot) ব্যবহার করা হবে। তবে র-ফলা ভাঙা হবে না। ফেব্রুয়ারি মাসের খসড়াও বিন্দুচিহ্নের কথা বলা হলেও পরে যুক্তবর্ণ বোঝাতে ঊর্ধ্বকমার প্রয়োগ দেখা যায়।

৪। বাংলা ভাষায় সর্বত্র হ্রস্ব স্বরধ্বনি, দন্ত্য ন, তালব্য শ এবং বর্গীয় জ ব্যবহার করা হবে।

৫। ঐ, ঔ, ঞ, হস্-চিহ্ন, ঊর্ধ্ব কমা এবং অনাবশ্যক ও-কার বাদ দিতে হবে।

৬। বিকল্প বানানবিধি মোতাবেক কয়েকটি শব্দের বানান নিম্নরূপ:

জগন'নাথ চক্রবর'তি (জগন্নাথ চক্রবর্তী), অশ'প্রিশ'শ (অস্পৃশ্য), শর'বহারা (সর্বহারা), আশে (আসে), স'থির (স্থির), শুন'দর (সুন্দর), শময় (সময়) ইত্যাদি।

এই বিকল্প বানানবিধি মেনে কাজল চক্রবর্তীর একটি কাব্যগ্রন্থও (*ঠিক সেই শময়,* ১৯৮২ খ্রি.) প্রকাশিত হয়। *সাংস্কৃতিক খবর* পত্রিকায় এই সময়ে বানান-বিষয়ক আরও কিছু লেখাপত্র প্রকাশিত হয়। যেমন: জগন্নাথ চক্রবর্তীর 'বাংলা বানানের কালবেলা' (চতুর্থ বর্ষ, ১৯৮৪), জগন্নাথ চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্র বানানে রবীন্দ্রনাথ' (মে, ১৯৮৪), রমাপ্রসাদ দে'র 'বানানবিদ্রোহ: দু একটি দ্বিধা' (জানুয়ারি, ১৯৮২) ইত্যাদি। *সাংস্কৃতিক খবর* বানান কিংবা ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক অণুপত্রিকা নয়। তবে বিকল্প বানানের অভিনবত্বের নিরিখে তাঁদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। এইসব বানান পরবর্তীকালে সাধারণ্যে গৃহীত হয়নি। এমনকি, তাঁরা নিজেরাও গ্রহণ করেননি। তবে নিরীক্ষামূলক এই ধরনের বানানে পরবর্তীকালে সামান্য কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

৫.৭ নিরীক্ষামূলক বানান-নির্ভর দুটি গ্রন্থ

জন মারডক থেকে শুরু করে অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তী পৃষ্ঠপোষিত 'সাংস্কৃতিক খবর' পত্রিকা — মুদ্রণের প্রয়োজনে বাংলা যুক্তাক্ষর ভেঙে রৈখিক মুদ্রণ-প্রক্রিয়া চালু করার কথা অনেকেই বলেছেন। ইতোপূর্বে সেই ধরনের প্রস্তাব সম্পর্কে আমরা আলোচনাও করেছি। কিন্তু এইসব প্রস্তাব মেনে সত্যই যদি কোনো বই লেখা হয়, কেমন হবে সেটি? কতদূর পাঠযোগ্যতা থাকবে তার? পাঠক কি প্রচলিত অভ্যাস ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বিকল্প কোনো বানানবিধিতে সায় দেবেন? সিতেস রায়ের লেখা *বাংলা বানান সমতা ও নয়া বরন পরিচয়* এবং ড. মৃদুল কান্তি বসুর লেখা *নতুন বাংলা বানান* বই থেকে আমরা এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে দেখার চেষ্টা করব।

৫.৭.১ *বাংলা বানান সমতা ও নয়া বরন পরিচয়:* সিতেস রায়

প্রথমে বলা যাক সিতেস রায়ের কথা। পূর্বোক্ত গ্রন্থের ভূমিকা অংশে ('লেখকের কথা') তিনি জানাচ্ছেন, বাংলা বানান বিষয়ে ১৯৫৪ সাল থেকে তিনি চর্চা করছেন। এই বিষয়ে তাঁর লেখা প্রথম প্রবন্ধ 'বিভকতি হিন বাংলা ভাসা' ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত *বার্তাবহ* পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।[১৩] ক্রমশ বাংলা বানান সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা আরও বিকশিত হল। সিতেস রায়ের মতে, সংস্কৃত-অনুসারী বাংলা ব্যাকরণ আসলে অন্য ভাষার দাসত্বের লক্ষণ—

> ... আমাদের ভাসার জনন বাংলা ব্যাকরন লেখা হয়নি। সংসক্রিতের উচ্চারন ও নিয়মাবলি দিয়ে প্রাকরিত বাংলা ভাসার বিচার হয় না। আমরা জেনে সুনেও বাংলা উচ্চারন ভংগি মেনে নিতে পারি না। এটি দাসতত মনোভাবেরই লকখন। (রায় ৪)

'সুতরপাত' অংশে লেখক অত্যন্ত সচেতনভাবে বিশ্ববিদ্যালয় তথা প্রতিষ্ঠান-অনুমোদিত বানানবিধির অন্তঃসারশূন্যতার কথা জানাচ্ছেন। মানুষের মুখের ভাষা এবং লিখিত বানানের মধ্যে ক্রমশই এক দুস্তর ব্যবধান তৈরি হয়েছে। তাই বানান-সংস্কারের বদলে দরকার বানানের 'সমতাবিধান'। এক্ষেত্রে 'সমতাবিধান' বলতে বাংলা বানানকে ক্রমশ আকাদেমি-মাফিক নির্বিকল্প করে তোলার কথা বলা হচ্ছে না। সমতাবিধান মানে মুখের ভাষা ও লেখ্য বানানের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান। বাঙালির উচ্চারণে যদি দীর্ঘ স্বরধ্বনি, ঋ, ণ ইত্যাদি না থাকে; লেখ্য বানানেও সেগুলি পরিত্যাগ করা উচিত। সিতেস রায় প্রস্তাবিত বিকল্প বানানবিধি নিম্নরূপ —

১। বাংলা বানান হবে ধ্বনিসংবাদী।

২। য, ড়, শ/ষ পরিহার করা হবে। এদের পরিবর্তে যথাক্রমে জ, র এবং স ব্যবহার করতে হবে। বাংলায় /শ/ স্বনিমের আধিক্য থাকলেও 'সবদ খমতা বেসি থাকায়' লেখক স-কে প্রাধান্য দিচ্ছেন; ধ্বনিতত্ত্বের দিক থেকে তাঁর যুক্তি যদিও স্পষ্ট নয়।

৩। একই যুক্তিতে ণ বাদ দিয়ে সর্বত্র ন লেখা হবে। ৎ বাদ যাবে, পরিবর্তে ত ব্যবহার করা হবে।

---

[১৩] সিতেস রায়ের বানানে 'বারতাবহ পতরিকা'। তাঁর নিজের লেখা কিংবা উদ্ধৃতি ব্যতীত বর্তমান নিবন্ধের অন্যত্র যুক্তবর্ণ বিশ্লিষ্ট করে বানান লেখা হয়নি।

৪। যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ করে লিখতে হবে। তবে এক্ষেত্রে হস্-চিহ্ন ব্যবহার করার কোনো দরকার নেই। যেমন: চিহ্ন> চিনহ, উচ্চারণ> উচচারন, সন্ধি> সনধি ইত্যাদি। সিতেস রায় জানাচ্ছেন, অনেক বাংলা শব্দ রুদ্ধদলান্ত হওয়া সত্ত্বেও হস্-চিহ্ন ব্যবহার করা হয় না —

> এই হসন উচচারন করে তার চিনহ না ব্যাবহার করার রিতি বাংলায় চলে আসছে। সেই নিয়ম ব্যাপক আকারে প্রচলিত হবে মাতর। জেমন- আমরা, তোমরা, ওসতাদ, জজ, ডিস, তছনছ, করিস, করিলেন...(রায় ১০৭)

তবে শব্দের আদিতে থাকলে যুক্তবর্ণ বিশ্লিষ্ট হবে না। এর ফলে সিতেস রায়ের প্রস্তাবে যুক্তব্যঞ্জনকে বাংলা বর্ণমালা থেকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

৫। র-ফলা ও রেফ বর্জন করা হবে। এদের র বর্ণ ব্যবহার করে বোঝানো হবে। যেমন: বর্জন> বরজন, সূর্য> সুরজ, সুব্রত> সুবরত। তবে শব্দের শুরুতে র-ফলাকে লেখক স্বীকৃতি দিচ্ছেন। ঋ-কার যেখানে শব্দের আদিতে বর্জিত হচ্ছে, সেখানে র-ফলা ব্যবহার অনিবার্য। যেমন: কৃষ্ণ> ক্রিসন।

৬। র-ফলার মতো য-ফলাও বর্জিত হবে। উচ্চারণের কথা মাথায় রেখে য-ফলার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হবে। যেমন: সত্য> সতত, ভৃত্য> ভ্রিতত।

৭। অনুচ্চারিত আনুনাসিক বর্ণ বানানে পরিত্যক্ত হবে। যেমন: স্মরণ> সরন, স্মৃতি> স্রিতি ইত্যাদি। একইভাবে শব্দের আদিতে থাকা অনুচ্চারিত অন্তঃস্থ ব পরিত্যক্ত হবে। যেমন: দ্বিতীয়> দিতিয়, ধ্বনি> ধনি। তবে শব্দমধ্যে থাকা ব-ফলা যদি উচ্চারিত হয়, তবে অন্যান্য যুক্তবর্ণের মতো বিশ্লেষণ করে লিখতে হবে। যেমন: সম্বোধন> সমবোধন, কম্বল> কমবল ইত্যাদি।

৮। দ্বিস্বরধ্বনি ভেঙে লেখা হবে। যেমন: খই, দই, বউ, সউর (<সৌর), অউচিতত (<ঔচিত্য) ইত্যাদি।

৯। দীর্ঘ স্বরধ্বনি (ঈ, ঊ) বর্জিত হবে। যেমন: নারী> নারি, শীত> সিত, মূল> মুল ইত্যাদি।

১০। /æ/ -এর উচ্চারণ বোঝানো হবে অ্যা বর্ণ দ্বারা। যেমন: গ্যান (<জ্ঞান), ব্যাবহার, ব্যাতিত ইত্যাদি।

জন মারডক বা যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির বিকল্প বানানে মূল যে সমস্যা, সিতেস রায়ের প্রস্তাবও সেই একই সমস্যায় আক্রান্ত। অর্থাৎ, মুদ্রণের দিকে লক্ষ রেখে বানান সংস্কার করা হয়েছে। মুদ্রণপ্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তনশীল। বিশেষত, কম্পিউটারের আগমনের পর টাইপ রাইটার যন্ত্রে যুক্তাক্ষর বর্জন করে চাবির (key) সংখ্যা কমানোর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। সিতেস রায় তাঁর প্রস্তাবিত বিকল্প বানানের ওপর নির্ভর করে শেষপর্যন্ত মুদ্রণ-প্রক্রিয়া সহজতর করতে চেয়েছিলেন। যুক্তবর্ণ বাদ দেওয়া তথা বিশ্লিষ্ট করে লেখার পিছনে কোনো ব্যাকরণগত প্রণোদনা কাজ করেনি। বাংলা উচ্চারণ, ধ্বনিতত্ত্ব এবং দলের (syllable) গঠন সম্পর্কেও তিনি প্রায়শ যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। সিতেস রায়ের বিকল্প প্রস্তাবে মুদ্রণ-যন্ত্রে চাবির সংখ্যা হবে এইরকম —

বর্ণ/ চিহ্ন	বরাদ্দ চাবির সংখ্যা
স্বরবর্ণ[১৪]	৭
স্বরচিহ্ন	৫
ব্যঞ্জনবর্ণ[১৫]	২৮
ব্যঞ্জন ফলা-চিহ্ন	৬
যুক্তবর্ণ	০
সংখ্যা	১০
যতিচিহ্ন	৬
অন্যান্য চিহ্ন	১০

সারণি ৫.১: বিকল্প মুদ্রণ-যন্ত্রে চাবির হিসাব

এদের মধ্যে অবশ্য একই চাবির দ্বারা একাধিক বর্ণ প্রকাশের বন্দোবস্ত থাকবে। সব মিলিয়ে, সিতেস রায়ের হিসেব মাফিক, বিকল্প বানান সমর্থিত মুদ্রণ-যন্ত্রে চাবি থাকবে ৫৯টি; যা পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত তৎকালীন মুদ্রণ-যন্ত্রের চাবির সংখ্যার তুলনায় ৩৩টি কম। মুদ্রণ-যন্ত্রে মাত্র ৩৩টি চাবি কমানোর জন্য বাংলা বানানের খোল-নলচে পালটে তাকে ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত করা সংগত সিদ্ধান্ত কি না; সেই প্রশ্ন অবশ্য রয়েই গেল।

৫.৭.২ *নতুন বাংলা বানান:* ড. মৃদুল কান্তি বসু

সিতেস রায়ের প্রস্তাব প্রচলিত বানান-কাঠামোর একেবারে বিপ্রতীপে হলেও নতুন কোনো অক্ষর বাংলা বর্ণমালায় তিনি সংযোজন করেননি। প্রচলিত অক্ষরসমূহকেই সাজানোর নতুন নিয়ম নির্মাণ করেছেন মাত্র। অন্যদিকে, ড. মৃদুল কান্তি বসুর *নতুন বাংলা বানান* গ্রন্থে প্রস্তাবিত বিকল্প পন্থা একেবারে বৈপ্লবিক। ড. বসু অনেকগুলি নতুন বর্ণ বাংলা ভাষায় প্রচলন করতে চাইছেন। তাঁর বিকল্প বানান ও লিপি সংক্রান্ত নীতি নিম্নরূপ—

১। একটি বর্ণ সর্বদা একটি ধ্বনিকে প্রকাশ করবে।

[১৪] অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা

[১৫] আনুনাসিক বর্ণ, য, শ, ষ, ৎ ইত্যাদি বাদ দেওয়ার পর পড়ে থাকে — ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম র ল স হ য় ং

২। স্বরবর্ণ থাকবে ৮টি — অ আ ই উ এ ও এ$_{১}$[১৬] ≥। এদের মধ্যে ≥ চিহ্ন ‘লঘু ও’ ধ্বনি বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। ড. বসুর মতে তথাকথিত ‘লঘু ও’ ধ্বনি সমন্বিত কিছু শব্দ হল কচু, ≥ণু, ≥তিথি, ≥গ্নি, ≥ধুনা ইত্যাদি। ড. বসু বাংলা ভাষায় ৭টি স্বরধ্বনির অতিরিক্ত আরেকটি নতুন যে স্বরধ্বনির প্রস্তাব দিয়েছেন, তার অস্তিত্ব প্রমাণিত নয়। তা ছাড়া, শব্দের আদিতে না থাকলে এই তথাকথিত ‘লঘু ও’ উচ্চারণ বোঝানোর কোনো উপায় নেই। ‘কচু’ শব্দে /k/-এর সঙ্গে ও-ধ্বনি উচ্চারিত হয়, নাকি ‘লঘু ও’, নাকি অ-ধ্বনি — তা ড. বসুর প্রস্তাবিত বানানবিধি থেকে বোঝা যায় না।

৩। স্বরবর্ণের চিহ্ন হিসাবে /e/ উচ্চারণ বোঝানো হবে এ-কারের বর্ধিত মাত্রা ব্যবহার করে। যেমন:

/ekṭi/ = একটি,

/æka/ = এ$_{১}$কা

/reba/= রে$_{২}$বা[১৭]

/khæla/ = খেলা

৪। ও-ধ্বনি বোঝানোর জন্য ড. বসু নতুন একটি স্বরবর্ণের চিহ্ন প্রস্তাব করছেন। বাংলায় ও স্বরধ্বনির চিহ্ন (‘ও-কার’) বস্তুত দুটি অংশের সমষ্টি — এ-কার এবং আ-কার। এই বৈশিষ্ট্য ব্রাহ্মী লিপির ঐতিহ্য মেনে তৈরি হয়েছে। ব্রাহ্মী লিপিতেও যেমন /ko/ ধ্বনি বোঝাতে ব্যবহৃত চিহ্ন 𑀓𑁄, আসলে কা (𑀓𑀸) এবং কে (𑀓𑁂) দ্যোতক চিহ্নের সম্মিলিত রূপ। এই পরম্পরা থেকে সরে গিয়ে ড. বসুর প্রস্তাব[১৮] — বর্ধিত মাত্রাযুক্ত এ-কারের সঙ্গে নীচের কুণ্ডলীর গোলাকৃতি বৃদ্ধি করে ‘ও-কার’ বোঝানো হোক।

৫। ঈ, ঊ এবং ঋ বর্জন করা হবে। উদা: ত্রিতিয়, রিজু।

৬। বাংলা বর্ণমালায় ৩১টি ব্যঞ্জনবর্ণের অস্তিত্ব স্বীকার করা হচ্ছে (বসু ৯৯) — ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম এবং আরও ৮টি অবর্গীয় (ড. বসুর বানানে ‘অবর্গিয’) ব্যঞ্জনবর্ণ (য ড় ঢ় র ল শ স হ)।

---

[১৬] /æ/ ধ্বনি বোঝানোর জন্য ড. বসু নতুন একটি বর্ণের প্রস্তাব দিচ্ছেন। এ বর্ণের কুণ্ডলীকে ওপরের দিকে কিছুটা প্রসারিত করে বর্ণটি তৈরি হয়েছে। প্রযুক্তিগত অসুবিধার কারণে বর্তমান নিবন্ধে এ$_{১}$ দ্বারা উক্ত বর্ণটিকে বোঝানো হয়েছে।

[১৭] এখানে র-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এ-কারের বর্ধিত মাত্রা ব্যবহার করেছেন ড. মৃদুল কান্তি বসু। প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে বর্তমান গবেষণাপত্রে সাব-স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে এ-কারের বর্ধিত মাত্রা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, রে$_{২}$ = র-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বর্ধিত মাত্রার এ-কার (/re/) এবং রে= র-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বাভাবিক মাত্রার এ-কার (/ræ/)। ড. বসু প্রস্তাবিত এই নিয়ম বিশ্বভারতীর এ এবং অ্যা উচ্চারণ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে এ-কারের বর্ধিত মাত্রা ব্যবহারের নিয়মের ঠিক বিপরীত।

[১৮] প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে এই চিহ্নটিও বর্তমান গবেষনাপত্রে দেখানো সম্ভব হল না।

৭। পূর্বোক্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলির ১১টি চিহ্ন প্রস্তাব করা হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি চিহ্ন প্রচলিত বাংলা লিপি থেকে গৃহীত, আর কিছু লেখকের নিজস্ব সংযোজন।[১৯] যেমন: ০ (আঙ্ক বা নাসিক্য), ◡(চাঁদ), Ɉ (দিত্য), > (জুগ্ম),´ (রেফ), ৲ (লেফ), ꞁ (শেফ), ⌐ (র-ফলা), ⌞ (ল-ফলা), ‿ (শ-ফলা), ্ (হশ্)। উদাহরণ:

নাসিক্য: অ০ক, গ০ধ, অ০বর

লেফ: উ ৲ কা (উল্কা), ব ৲ কল (বল্কল)

ল-ফলা: সি⌞ল (শ্লীল), স⌞থ (শ্লথ)

দ্বিত্ব: বাচ্যু, লজ্যা

যুগ্ম: কখ> (কক্ষ), তুছ> (তুচ্ছ), কুঝ>টিকা (কুজ্ঝটিকা)

শ-ফলা: ঝাপা‿ (ঝাপশা), বাক‿ (বাক্স), বত‿ (বৎস)

শেফ: ꞁতব (স্তব), ꞁথান (স্থান)

ড. মৃদুল কান্তি বসু মুদ্রণের দিকে বেশ কিছু মৌলিক তথা অভিনব প্রস্তাব পেশ করেছেন। তবে সবসময় বাংলা লিপিতে এইসব অভিনব সংযোজনের প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। পূর্বে আলোচিত সিতেস রায়ের মতো বাংলা বানান বিষয়ে বৈপ্লবিক কোনো পরিবর্তন ড. বসু আনতে চাননি। এই ধরনের নতুন লিপি মুদ্রণের সমস্যা ও সুবিধা সম্পর্কেও তিনি বিশেষ আলোচনা করেননি। সব মিলিয়ে, তাঁর প্রস্তাব মৌলিকত্বের দিক থেকে স্মরণীয় হলেও বানান-নীতির দিক থেকে গড়পরতা।

৫.৮ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধির বিকল্প অনুসন্ধান

গত শতকে আটের দশকে অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির পর বাংলা বানানের জগতে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। ১৯৮৬ সালের ২০ মে আকাদেমির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলা বানান ও লিপির প্রমিতকরণ বিষয়ে আকাদেমি উদ্যোগী হয়েছেন। বস্তুত, এই উদ্যোগ শুরু হয়েছিল আকাদেমি প্রতিষ্ঠারও কিছু আগে থেকে। ১৯৮৫ সালের ১৪-১৯ মে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পৃষ্ঠপোষণায় কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে একটি আলোচনাচক্র আয়োজিত হয়। উদ্‌বোধন করেছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। বাংলা ভাষার বানান ও লিপি, শিশুপাঠ্য গ্রন্থে প্রমিত বানানের ব্যবহার, বাংলা পরিভাষা নির্মাণ, প্রশাসনিক কাজে বাংলা ভাষা প্রচলন, আঞ্চলিক উপভাষার বিবরণ লিপিবদ্ধকরণ ইত্যাদি বিবিধ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সাহিত্য উপদেষ্টা পর্ষদের পক্ষে ড. শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন—

[১৯] পরবর্তী উদাহরণগুলিতে মূল গ্রন্থে ব্যবহৃত ব্যঞ্জনবর্ণের চিহ্নগুলির নিকটতম প্রতিরূপ পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে সর্বদা ড. বসু ব্যবহৃত চিহ্নগুলির সন্ধান ইউনিকোডে পাওয়া যায়নি। বন্ধনীভুক্ত চিহ্ন-নামের ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থের বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

> ... লিপিসংস্কার, বানানসংস্কার, অভিধান সংকলন, পরিভাষা সংকলন এবং বাংলাভাষা প্রচলনের ক্ষেত্রে যে-সব কাজ দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষিত সেগুলি নিয়ে এখানে যা-কিছু আলোচনা হবে তাকে নিছক অ্যাকাডেমিক স্তরে নিবদ্ধ না রেখে ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগের দিকটিই মুখ্যত বিবেচিত হবে। (*প্রসঙ্গ বাংলাভাষা* ৩০২)

উপরের বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, সরকারিভাবে এইসব বানান সংক্রান্ত 'প্রস্তাব' গৃহীত এবং বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করার পরিকল্পনা গোড়া থেকেই ছিল। এই আলোচনাচক্রে প্রস্তাবিত বিভিন্ন সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে ১৯৮৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে বাংলা বানান সংক্রান্ত একটি ভিত্তিপত্র প্রকাশিত হয়। ১৯৯৫ সালে আকাদেমির তরফে বানান সংক্রান্ত একটি সুপারিশপত্র প্রকাশ করা হয়। তার ভূমিকায় আকাদেমির তৎকালীন সচিব সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন —

> ... আকাদেমি থেকে এবিষয়ে একটি ভিত্তিপত্র প্রস্তুত করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় নিরত ব্যাপক সংখ্যক বিদ্বজ্জন ও প্রতিষ্ঠানের কাছে অভিমতের জন্য পাঠানো হয়েছিল। প্রাপ্ত মতামতগুলি বিবেচনা করে এখন একটি সুপারিশপত্র রচনা করা হয়েছে। ... সেই নিয়মসূত্র অনুসরণ করে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চতর পর্যায় অবধি পাঠ্যপুস্তক রচিত হলে, এবং ব্যানার ইত্যাদির ঘোষণায়, দূরদর্শনের বিজ্ঞপ্তিতে, সরকারি নানা প্রচারপত্রে তা অনুসৃত হলে, শিক্ষার্থীদের পক্ষে একধরনের বানানরীতিতে অভ্যস্ত হওয়া সম্ভব হবে এবং বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা দূর হতে পারবে। (মজুমদার ১১৩)

সনৎকুমারবাবুর বক্তব্য আলাদাভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে পাঠ্যপুস্তকের বানানকে। তাঁর অভিমত, আকাদেমির বানান মেনে পাঠ্যপুস্তক ছাপা হলে তথাকথিত 'সমতাবিধান' শিক্ষার্থীদের সহায়ক হবে। এই আদর্শ থেকে ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয় *আকাদেমি বানান অভিধান*। পরবর্তীকালে এই অভিধানের আরও কয়েকটি সংস্করণে কিছু বানানের অল্পবিস্তর পরিমার্জন ঘটে। পশ্চিমবঙ্গে পাঠ্যপুস্তকে আকাদেমির বানান ও 'স্বচ্ছ' লিপি গৃহীত হয়। অন্যান্য কিছু পত্রপত্রিকাও আকাদেমির নিয়মানুযায়ী বাংলা বানান লিখতে শুরু করেছেন। *আকাদেমি বানান অভিধান* প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর গত ২৫ বছরে আকাদেমির গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে নিঃসন্দেহে। তবে সেই গ্রহণযোগ্যতা নিরঙ্কুশ নয়।[২০] পক্ষান্তরে, কিছু বিকল্প অভিমত আকাদেমির সমতাবিধানের নীতির যাথার্থ্য নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। পলাশ বরন পালের মতো কেউ কেউ ব্যাকরণগত যুক্তির নিরিখে আকাদেমির বানানবিধির বিরোধিতা করেছেন। আবার কেউ কেউ প্রাতিষ্ঠানিক বানান 'চাপিয়ে দেওয়া'-র প্রবণতাটিকে নাকচ করতে চান। আমরা উভয় প্রকার আপত্তির যাথার্থ্যই খতিয়ে দেখব।

৫.৮.১ পলাশ বরন পালের যুক্তিসমূহ

পলাশ বরন পাল *আ মরি বাংলা ভাষা* গ্রন্থে একাধিক প্রবন্ধে আকাদেমির বানানবিধির মূলগত সূত্রগুলির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। নির্দিষ্ট কোনো শব্দের বানান নিয়ে বিতর্কে তাঁর আগ্রহ কম। বরং তিনি বিদেশি শব্দে হ্রস্ব স্বরধ্বনি ব্যবহার, /æ/ ধ্বনি বোঝানোর জন্য আলাদা বর্ণকে স্বীকৃতি না দেওয়া, 'তৎসম' শব্দের বানান অপরিবর্তিত রাখা ইত্যাদি আকাদেমি-স্বীকৃত নীতিগুলিকে যুক্তির সাহায্যে যাচিয়ে নিতে চেয়েছেন। তাঁর মূল বক্তব্য নিম্নরূপ —

[২০] বিস্তারিত আলোচনার জন্য বর্তমান গবেষণা-অভিসন্দর্ভের উপ-অধ্যায় ৭.৪.১ – ৭.৪.৩ দ্রষ্টব্য।

১। বিদেশি শব্দগুলি বাংলায় গৃহীত হওয়ার সময় তাদের বানানে হ্রস্ব বা দীর্ঘ স্বর নিতান্ত আপতিকভাবে বসানো হয়নি। ধরা যাক, ইংরেজি শব্দ 'কোম্পানী' বানানে এককালে দীর্ঘ-ঈ লেখা হত; কিন্তু পোর্তুগিজ় শব্দ 'ফিতা' কখনোই দীর্ঘ-ঈ ব্যবহার করে লেখা হত না, এমনকি পুরাতন বানানেও — এই নিয়ম কি নিতান্ত আপতিক? লেখকের ব্যাখ্যা, বাংলায় গৃহীত হওয়ার সময় বিদেশি শব্দের মূল উচ্চারণ অনুযায়ী বানানে হ্রস্ব বা দীর্ঘ স্বর ব্যবহৃত হত। এই কারণে মূল বিদেশি উচ্চারণের সঙ্গে সংগতি রেখে 'কোম্পানী', 'গরীব', 'আলমারী' ইত্যাদি শব্দে পুরাতন বানানে দীর্ঘ স্বরধ্বনি ব্যবহার করা হত। অন্যদিকে, মূল উচ্চারণে দীর্ঘ স্বর নেই বলে 'ফিতা' বা 'ম্যাজিস্ট্রেট' শব্দে কখনোই দীর্ঘ স্বর ব্যবহৃত হয়নি। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত অস্বীকার করে যাবতীয় বিদেশি শব্দে হ্রস্ব স্বর ব্যবহারের নিদান কতদূর সংগত, পলাশ বরন পাল সেই প্রশ্ন তোলেন *(পাল, আ মরি বাংলা ভাষা* ১৩২-১৩৩)।

২। বিদেশি শব্দের প্রসঙ্গে আকাদেমির বক্তব্য ছিল — "বাংলা শব্দভাণ্ডারে গৃহীত বিদেশি শব্দে দীর্ঘ স্বরচিহ্ন না-দিয়ে হ্রস্ব স্বরচিহ্ন ব্যবহৃত হবে" (সরকার প্রমুখ ৫২৯)। আকাদেমি স্পষ্টভাবে উল্লেখ না-করা সত্ত্বেও এই নিয়মের পিছনে নিহিত যুক্তি আন্দাজ করা কঠিন নয়। বাংলা উচ্চারণে দীর্ঘ স্বরধ্বনি না থাকায় অন্ততপক্ষে বিদেশি শব্দে সেগুলি বাদ দেওয়া হচ্ছে। তবে ঐতিহ্যগত বানানে হস্তক্ষেপ করতে না চেয়ে আকাদেমি তৎসম শব্দের বানান পরিবর্তনে উৎসুক নন। এর ফলে আকাদেমির বানানবিধির মধ্যে একপ্রকার মূলগত দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে। একদিকে আকাদেমি চাইছেন উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখতে। অন্যদিকে, শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী দু-ধরনের নিয়ম প্রণয়নে আকাদেমি বাধ্য হচ্ছেন। এই নীতি স্ববিরোধী। তবে জনরুচির দিকে লক্ষ রেখে এই স্ববিরোধকে প্রশ্রয় না দিয়ে উপায় ছিল না। পলাশ বরন পাল লক্ষ করেছেন, অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রেও বানান-চিন্তকরা সর্বদা উচ্চারণ অনুযায়ী বানান নির্দেশ করতে পারেননি। স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে তাঁরা যতটা সাহসী, ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রে কিন্তু তাঁরা ততটা সাহসী হতে পারেননি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 'মনুষ্য' থেকে জাত তদ্ভব শব্দ 'মানুষ' বানানে ষ হওয়ার কোনো ব্যাকরণগত যুক্তি নেই। বিশেষত, চলতি লব্জের 'মিনসে' শব্দটির বানানে যখন ষ প্রচলিত নেই, 'মানুষ' বানান কেবল জনরুচির দিকে লক্ষ রেখে বদলানো হয়নি। একই কথা বলা যায়, ষণ্ড>ষাঁড় বানানের ক্ষেত্রেও।

৩। বাংলা স্বাভাবিক উচ্চারণে দীর্ঘ স্বর প্রায় নেই বলে আকাদেমি যথাসাধ্য হ্রস্ব-ই ব্যবহারের পক্ষপাতী। তবে বাংলা প্রত্যয় -ই এবং -ঈ অর্থগতভাবে পৃথক বলে কেউ কেউ দাবি করে থাকেন। অধ্যাপক পাল তথ্যসূত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন বামনদেব চক্রবর্তীর বিখ্যাত পাঠ্যপুস্তক *উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ* । -ই প্রত্যয় বৃত্তি বোঝায়। যেমন: মাস্টার – মাস্টারি, ডাক্তার - ডাক্তারি। বামনদেব চক্রবর্তীর মতে[২১], "কিন্তু এই সমস্ত শব্দে ঈ-

[২১] আমাদের মতে, পলাশ বরন পাল সমর্থিত বামনদেববাবুর এই বক্তব্য ব্যাকরণগত যুক্তির ওপর স্থাপিত নয়। *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* গ্রন্থে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় হিসাবে -ই/-ঈ-এর মধ্যে কোনো অর্থগত ফারাক করেননি (চট্টোপাধ্যায় ১৫৯)। *ওডিবিএল* গ্রন্থে -ই/-ঈ প্রত্যয়ের তিনটি উৎস ব্যাখ্যা করা হয়েছে। -ইন্ (সং) থেকে (গুণিন্> গুণী) , -ঈয় (সং) থেকে (দেশীয়> দেশী) এবং -ইকা (সং) থেকে (গ্রামিকা> গাঁই)। সুনীতিবাবু -ই/-ঈ প্রত্যয়ের পরিচয় জানাচ্ছেন এইভাবে — "A secondary affix, forming nouns and adjectives. Three separate affixes of OIA. seem to converge into this single NIA. form..." (Chatterji 671)। মৎ-কর্তৃক নিম্নরেখ অংশ থেকে বোঝা যাচ্ছে, উভয় প্রত্যয়ের মধ্যে বিশেষ্য-বিশেষণের অর্থগত ফারাক স্বীকৃত নয়।

কারান্ত হইলে বিশেষণ। — মাস্টারী চাল, জমিদারী কায়দা, পণ্ডিতী বিধান, ডাক্তারী বুদ্ধি, কবিরাজী দাওয়াই ইত্যাদি" (চক্রবর্তী ৪৩৩)।

৪। স্ত্রী-প্রত্যয় হিসাবে কেবল -ঈ প্রত্যয়কে বেছে নিলে সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয়ের সঙ্গে সাযুজ্য থাকবে। না-হলে কোনো একটি শব্দের সঙ্গে স্ত্রী-প্রত্যয় যোগ করার আগে বিবেচনা করে দেখতে হবে সেটি তৎসম নাকি অতৎসম। যেমন: দেব + ঈ, কিন্তু পাগল + ই। বাংলায় একটিই স্ত্রী-প্রত্যয় হিসাবে -ঈ বেছে নিলে এই বিভ্রান্তির অবকাশ থাকে না (পাল ১৩৮-১৪০) । তখন তৎসম-অতৎসম নির্বিশেষে বানান লেখা হবে দেবী, পাগলী, কাকী, মামী, শ্রীমতী, দিদী[২২] ইত্যাদি। পলাশ বরন বাবুর এই বক্তব্য প্রায়োগিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তবে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে বিচার করলে কিছু সমস্যাও রয়েছে। স্ত্রী-বাচক -ঈ/-ই উৎস সংস্কৃত -ইকা প্রত্যয় (Chatterji 672)। এই প্রত্যয় ক্ষুদ্রার্থে এবং সম্পর্কিত ভাব বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়। ক্ষুদ্রার্থের উদাহরণ: রোটিকা > রুটি, রাজিকা > রাই (=সরষে), পুস্তিকা> পুথি, কাষ্ঠিকা> কাঠি, যন্ত্রিকা> যাঁতি। *ওডিবিএল* রুটী, কাঠী ইত্যাদি বানান ব্যবহার করলেও বর্তমানে এইসব শব্দে হ্রস্ব-ই প্রচলিত। পলাশ বরন বাবুর যুক্তি মেনে বাংলায় স্ত্রী-প্রত্যয় হিসাবে যদি কেবল -ঈ প্রচলিত হয়, তাহলে সেই প্রত্যয় দ্বারা গঠিত শবদগুলির বানান বদলে রুটী, পুথী, ছুরী, কাঠী ইত্যাদি করতে হয়। এই ধরনের বানান পরিবর্তন সময়ের উলটো অভিমুখে হাঁটার সামিল। কেউ কেউ অবশ্য এই সমস্যার সমাধানে বাগর্থতত্ত্বের সাহায্য নিতে পারেন। তাঁরা দাবি করবেন, এখানে যাবতীয় -ই প্রত্যয় (< -ইকা) নির্বিচারে বাদ দিতে বলা হচ্ছে না। কেবল স্ত্রী-বাচক শব্দ নির্মাণে -ই প্রত্যয়ের ব্যবহার বন্ধ হোক। তাহলে ক্ষুদ্রার্থে -ই প্রত্যয় ব্যবহার করে রুটি, কাঠি ইত্যাদি বানান লেখা জারি থাকতে পারে। কিন্তু এখানেও একটি সমস্যা রয়েছে। -ই/-ঈ প্রত্যয় সম্পর্কিত ভাব বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়। যেমন: বড়োমানুষি, ডাকাতি, রাখালি। অন্যদিকে, বামনদেব চক্রবর্তী এবং পলাশ বরন পাল এই ধরনের ভাব বোঝাতে -ঈ প্রত্যয় ব্যবহারের পক্ষপাতী। এখন -ঈ যদি কেবল স্ত্রী-প্রত্যয় হিসাবে বিবেচিত হয় (তার অন্য অর্থগুলিকে বাতিল করে), তাহলে লেখকের পূর্বের বক্তব্য অনুযায়ী বিশেষণ হিসাবে জমিদারী, ডাক্তারী ইত্যাদি বানান লেখা যাবে না। আর লিখলে জমিদারী (=*স্ত্রী জমিদার), ডাক্তারী (=*স্ত্রী ডাক্তার) ইত্যাদি শব্দে অর্থ বিভ্রাট ঘটবে। -ঈ স্ত্রী-প্রত্যয় হিসাবে একাধিপত্য পেলে বড়োমানুষী মানে হবে * নারী বড়োমানুষ। আবার, এইসব বিশেষণ (বড়োলোকিয়ানা অর্থে) লেখক আগে -ঈ ব্যবহার করে লেখার পক্ষে মত দিয়েছেন। এই বক্তব্য স্ববিরোধী।

৫। অসংস্কৃত শব্দে (যেমন: কাকা) সংস্কৃত প্রত্যয় (-ঈ) ব্যবহারের প্রস্তাবে সমস্যা কোথায়, তা অব্যবহিত আগে আলোচনা করা হয়েছে। সংস্কৃত শব্দে বাংলা প্রত্যয় ব্যবহারের নিয়মবিধিও খতিয়ে দেখা যেতে পারে। অধ্যাপক পালের যুক্তি—

> আকাদেমির প্রস্তাব অনুযায়ী যদি সমস্ত অসংস্কৃত শব্দেই দীর্ঘ-ঈ লেখা বন্ধ করে দিই, তাহলে 'নীলচে' বানান লিখতে পারবো না। কারণ, 'নীল' শব্দটা সংস্কৃত, কিন্তু তার সঙ্গে যোগ হয়েছে '-চে' প্রত্যয়, সেটি সংস্কৃত নয় মোটেই। (পাল, *আ মরি বাংলা ভাষা* ১৪১)

[২২] 'দিদী' বানান হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (বন্দ্যোপাধ্যায় ১১০৪) এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*-এ (দাস ১০৬৯) স্থান পেয়েছে।

আকদেমির নির্দেশের ব্যাখ্যা এই উদ্ধৃতিতে যথাযথভাবে করা হয়নি। আকাদেমি এইরকম কোনো নির্দেশ দেয়নি যে, যাবতীয় অসংস্কৃত শব্দে — এমনকি তৎসম শব্দের সঙ্গে বাংলা প্রত্যয় বা বিভক্তি যুক্ত শব্দে — নির্বিচারে হ্রস্ব-ই ব্যবহার করতে হবে । *আকাদেমি বানান অভিধান* মন্ত্রীগিরি, শশীভূষণ (শব্দটিকে 'বাংলা' বলে ধরে), পরবর্তীকাল ইত্যাদি বানান সমর্থন করে (সরকার প্রমুখ ৫২১)। অন্যত্র আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে—

> দীর্ঘ ঊ-কারযুক্ত তৎসম শব্দ কিংবা উপসর্গের সঙ্গে বাংলা প্রত্যয় কিংবা শব্দ যুক্ত হলেও দ্রুত অর্থবোধের সহায়ক বলে মূলের দীর্ঘ উ/ঊ-কার পালটাতে চাই না। তাই ধূর্তামি মূর্খামি পূজারি। (*পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গৃহীত বাংলা বানানবিধি* ১৮)

তার ফলে আকাদেমি আদৌ যা বলেনি, তা খণ্ডন করতে যাওয়া বৃথা পরিশ্রম মাত্র।

৬। হ্রস্ব এবং দীর্ঘ স্বরবর্ণযুক্ত 'দুটি রূপই প্রচলিত ও গৃহীত' থাকলে আকাদেমি হ্রস্ব স্বরবর্ণ ব্যবহারের পক্ষপাতী (*পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গৃহীত বাংলা বানানবিধি* ১১)। এখানে 'প্রচলিত' শব্দটি শিথিলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি পলাশ বরন বাবুর যথাযথ পর্যবেক্ষণ। অঙ্গুরি, আবলি, বেণি, রজনি ইত্যাদি শব্দের দীর্ঘ স্বরবর্ণযুক্ত রূপগুলিই বরং সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল। এখনও হয়তো রয়েছে। বাংলা এবং সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই। হ্রস্ব স্বরবর্ণযুক্ত বানান সেই স্থিতাবস্থাকে বিঘ্নিত করেছে।

৭। ক্রিয়াপদের বানানের ক্ষেত্রেও আকাদেমির বিকল্প কিছু প্রস্তাব পলাশ বরন বাবুর লেখায় পাওয়া যায়। নির্দেশক ভাবের কৃদন্ত বিশেষণস্থানীয়[২৩] ক্রিয়াপদের বানানে এবং ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ কালের রূপে তিনি -ও বিভক্তি ব্যবহারের পক্ষপাতী —

> ... *করিল* থেকে *করলো* লিখব না কেন, অর্থাৎ শেষের 'ল'-এর সঙ্গে 'ও'-কার দেবো না কেন? কিম্বা *করবো* লিখতে কেন দেবো না শেষে 'ও'-কার?
>
> ... 'ও'-এর মতো উচ্চারণ হচ্ছে, অতএব 'ও'-কার দেবো — আমার মতে 'ও'-কার বসানোর এর চেয়ে ভালো কোনো কারণ থাকতেই পারে না। (পাল, *ধ্বনিমালা বর্ণমালা* ৯৮)

এই 'যুক্তি'-র দুর্বলতা খুব সহজেই নজরে পড়ে। ক্রিয়াপদের অন্তর্গত ধাতুর পরিচয় স্পষ্ট রাখার তাগিদে কোরলো, বোললো ইত্যাদি বানান লেখা হচ্ছে না। অথচ করলো, বললো ইত্যাদি লিখলে সমগ্র ক্রিয়াপদের বানানটি উচ্চারণ-মাফিক হয়ে যায় না। পলাশ বরন বাবু অবশ্য ক্রিয়াপদের আকাদেমি-সমর্থিত বানানবিধির বিপক্ষে অন্য কয়েকটি যুক্তিও হাজির করেছেন। কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে — বিশেষত কবিতায় বা গানে — আকাদেমি-সমর্থিত বানান অর্থবোধে সমস্যা তৈরি করতে পারে। যেমন:[২৪] *নির্জন স্বাক্ষর* কবিতায় জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন—

> তুমি তা জান না কিছু, না জানিলে, —

---

[২৩] কৃদন্ত বিশেষণস্থানীয় শব্দবন্ধের ব্যাখ্যা বর্তমান গবেষণাপত্রের ৩.৪ সংখ্যক উপ-অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

[২৪] পলাশ বরন পাল রবীন্দ্র-সংগীত এবং কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা থেকে উদাহরণ দিয়েছেন। জীবনানন্দ দাশের উদাহরণটি বর্তমান গবেষকের সংযোজন।

আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে! (দাশ, জীবনানন্দ ১৩)

এখানে 'করে' মানে 'করিয়া', নাকি সাধারণ বর্তমান কাল বোঝাতে ক্রিয়াপদটি ব্যবহৃত হচ্ছে? কবিতা-গানে এই ধরনের সমস্যা প্রতিরোধে প্রয়োজন-মাফিক ঊর্ধ্বকমা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তার জন্য যাবতীয় বাংলা ক্রিয়াপদকে উচ্চারণ-অনুযায়ী কোরে, বোলে, কোরবো/ করবো ইত্যাদি লেখার প্রস্তাব বাস্তব-সংগত নয়।

পলাশ বরন পাল মেধাবী লেখক। অন্য অনেকে যেখানে বাংলা আকাদেমির বানানবিধির সমালোচনা করার সময় ব্যক্তিগত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পড়েছেন, পলাশ বরন বাবু সেখানে এক স্থিতধী বিকল্প কণ্ঠস্বর। যুক্তিনির্ভর অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য। গত প্রায় তিরিশ বছর ধরে তিনি বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে লেখালিখি করছেন। পেশায় পদার্থবিদ্ পলাশ বরন বাবু বাংলা ভাষার প্রতি খাঁটি মমত্ববোধ থেকে ব্যাকরণচর্চায় আগ্রহী। এই ব্যক্তিগত প্রেক্ষাপট তাঁর বানান-চেতনার সঙ্গে মানানসই। বাংলা বানান বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে — এই দাবি যুক্তিসংগত। এই চেতনা থেকেই তিনি 'কিম্বা', 'পরিসেবা' ইত্যাদি বানান লেখেন (পাল, *হক কথা* ৩৭-৪০), কৃদন্ত ক্রিয়াপদে ও-কার দিতে চান, অসংস্কৃত শব্দের বানান যথাসম্ভব বাংলা উচ্চারণ অনুযায়ী লিখতে চান। তাঁর বিশ্লেষণের একমাত্র দুর্বলতা, আমাদের মতে, ঐতিহাসিক-তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। শব্দের বানান কোনোদিনই কেবল উচ্চারণ দ্বারা নির্ধারিত হয় না। বানান নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য অজস্র উপাদান প্রভাব বিস্তার করে। কতিপয় এই ধরনের উপাদান ১.৬ উপ-অধ্যায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। ক্রিয়াপদ যেমন ব্যাকরণগতভাবে অত্যন্ত জটিল একটি গঠন। এর বিভিন্ন উপাদানের ঐতিহাসিক বিবর্তন, বিভিন্ন কালে এবং ভাবে একই ধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়াপদের বানানের তুলনামূলক আলোচনা, সর্বোপরি বানানের প্রায়োগিক ব্যবহারযোগ্যতা ইত্যাদি সম্পর্কে পলাশ বরন পাল গভীরে আলোচনা করেননি। অন্যান্য জায়গাতেও আকাদেমির বিকল্প প্রস্তাব পেশ করার সময় তাঁর যুক্তি যতটা বর্ণনামূলক, ততটা ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের ওপর স্থাপিত নয়।

৫.৮.২ আকাদেমির বানানবিধির অন্যান্য প্রতিপক্ষ

আকাদেমি বানান অভিধান-এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৩ সালের নভেম্বর মাসে। এই সংস্করণের ভূমিকায় পবিত্র সরকার লিখেছিলেন —

> ... পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ আগে থেকেই নিজেদের মুদ্রিত পাঠ্যে এ বানানবিধি অনুসরণ করে আসছিলেন। এবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ — সকলেই আকাদেমির বানান অনুসারে বাংলা পাঠ্য বই মুদ্রণের জন্য প্রকাশকদের নির্দেশ দিয়েছেন। (সরকার প্রমুখ "চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা," পৃষ্ঠাসংখ্যা অনুল্লিখিত)

পাঠ্যপুস্তকে আকাদেমির বানানের স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। আকাদেমির তৎকালীন সচিব সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় এই সংস্করণের নিবেদন অংশে আশা প্রকাশ করেছিলেন, "কয়েক বছরের মধ্যে এমন একটি প্রজন্ম গড়ে উঠবে যাঁরা বাংলা বানানের বিভ্রান্তি থেকে কিছুটা মুক্ত থাকবেন" (সরকার প্রমুখ "চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন," পৃষ্ঠাসংখ্যা অনুল্লিখিত)। এই ধরনের বক্তব্য পড়লে মনে হয়, প্রমিত বাংলা বানানের পরিস্থিতি বেশ আশাব্যঞ্জক। বাস্তবে কিন্তু বিরোধিতা কম হয়নি। অনেক সময়তেই, আকাদেমির

বানাননীতির বিরোধিতা করতে গিয়ে আকাদেমির সদস্যদের ব্যক্তি-আক্রমণ করা হয়েছে। বিরোধীপক্ষের কিছু বক্তব্য নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত ছিল। আবার কিছু বক্তব্য নিছক তাৎক্ষণিক ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। তার কোনো ব্যাকরণগত সারবত্তা নেই।

পশ্চিমবঙ্গ প্রধানশিক্ষক সমিতির তরফে ২০০৫ সালে *আ-মরি বাংলা ভাষা* নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এই বইয়ের কিছু লেখা সংকলনমূলক। রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ লেখকের ভাষা-বিষয়ক নিবন্ধের সম্পাদিত অংশবিশেষ সংকলিত হয়েছে। কিন্তু বইয়ের মূল আকর্ষণ বানান বিষয়ক লেখাগুলি। আকাদেমির বানানবিধি শিক্ষকসমাজে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তার আঁচ এইসব লেখা থেকে পাওয়া যায়। আকদেমির বানানবিধির বিপক্ষে তৎকালীন আমলে যে-সব প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল, সেগুলির সারাংশ নিম্নরূপ—

১। কিছু ক্ষেত্রে আকাদেমির বানানবিধির নিছক ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। আকাদেমি যে নির্দেশ দেয়নি, তা দিয়েছে বলে ধরে নিয়ে অকারণ উত্তেজনা সৃষ্টির প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এটি ইচ্ছাকৃত অপব্যাখ্যা হতে পারে, অথবা অন্যমনস্কতার ফল। যেমন, আলোচ্য গ্রন্থের *মুখবন্ধ* অংশে প্রধানশিক্ষক সমিতির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক অশোক কুমার মাইতি লিখেছেন —

> ‘প্রাজ্ঞ’, ‘বিজ্ঞ’ বানানকে সহজ করতে গেলে সকলে অজ্ঞ হয়ে যাবে। ... সহজ করতে গিয়ে ৃ -কার, য-ফলা, র-ফলা[২৫] ও যুক্ত বর্ণকে কি বর্জন করা হবে?
>
> ‘ব্রাত্য’কে সহজ করলে বরাত এর মত শোনায়। আন্ত্রিক কে সহজ করলে আন্‌ত্রিক হবে তা কি ঠিক হবে?
>
> ‘শ্মশান’ শম্‌শান হলে শবদাহ আর সেখানে হবে কি?
>
> শ, স ও ষ কে যে কোন একটি ‘স’ করলে শশুর যদি সসুর হয় তবে শশুর মশাই হতে সুড়সুড়ি লাগবে। বিদগ্ধ যদি বিদগধ হয় তাহলে গাধাও হাসবে। (রায়চৌধুরী ৩-৪)

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হল। কিন্তু আকাদেমির বিকল্প স্বর যাঁরা হয়ে উঠতে চাইছিলেন, তাঁদের মূল সমস্যা এই উদ্ধৃতি থেকে নির্ভুলভাবে চিনে নেওয়া যায়। যুক্তাক্ষর বিশ্লেষণের কোনো প্রস্তাব আকাদেমি দেয়নি। সেই প্রস্তাব ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ‘শহজ বাংলা’ নির্দেশিকায়[২৬] (১৯৪৯ খ্রি.)। বিশেষত, প্রাজ্ঞ, শ্মশান, শ্বশুর ইত্যাদি তৎসম শব্দের বানান আকাদেমি বানানবিধি অনুযায়ী অপরিবর্তিত রয়েছে। এই প্রাথমিক তথ্যের খোঁজ না-রেখেই আকাদেমির বানানবিধির অপব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

২। কেউ কেউ আকাদেমির বানানবিধি প্রণয়নের মধ্যে দলীয় রাজনীতির ছায়া খুঁজে পেয়েছেন। আকাদেমির বিরোধিতা করা তাঁদের কাছে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা করার সমতুল্য ছিল। প্রধানশিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের মন্তব্য থেকে এই বিষয়ে অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় — “সমিতি এই

---

[২৫] মূল উদ্ধৃতিতে য-ফলা ও র-ফলার চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে এখানে ভাষায় লেখা হল।

[২৬] বর্তমান গবেষণাপত্রের ৬.৩.২ উপ-অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত।

কল্পে (আকাদেমির বানানবিধি প্রসঙ্গে)[২৭] অনেকের কাছে মতামত চেয়েছেন, কেউকেউ সরকারী রক্তচক্ষু বা সরকারী সুযোগ সুবিধা বন্ধের ভয়ে সাড়া দিতে চান নি" (রায়চৌধুরী ৫)। আকাদেমির বানানবিধি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল সমর্থিত — এবম্বিধ ধারণা মাণিকলাল রায়চৌধুরীর সম্পাদকীয় মন্তব্যেও প্রতিফলিত। আকাদেমির 'স্বঘোষিত এবং স্বনিযুক্ত বাংলা ভাষার অভিভাবককুল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৃষ্ঠপোষনায় এবং সরকার পোষিত শিক্ষা পরিচালন কর্ত্তৃপক্ষের আনুকূল্যে' (রায়চৌধুরী ৭) যে বানানবিধি প্রণয়ন করেছেন, তা সম্পাদককে উদ্‌বিগ্ন করেছে। নিছক ব্যাকরণগত কারণে এই বিরোধী পক্ষ উদ্‌বিগ্ন নন। আকাদেমির বানান তাঁদের কাছে ভাষার ওপর নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল তথা সরকারি হস্তক্ষেপ বলে প্রতীত হয়েছে।

৩। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষা যদি চিরায়ত পথ থেকে খুব বেশি সরে আসে, তাহলে বাংলাদেশ এবং ভারতের বৃহৎ-বঙ্গীয় সংস্কৃতির থেকে বিচ্ছিন্নতা দেখা যাবে। ত্রিপুরা, অসম, দিল্লি, ঝাড়খণ্ড, আন্দামানের বাঙালিও কি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি মেনে চলবেন? বিশেষত, সেই বিধি যদি প্রথাগত বানানকে অস্বীকার করে, তাহলে বাঙালির জাতিসত্তা সর্বভারতীয় বঙ্গীয় সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই আশঙ্কা ইতোপূর্বেও বাংলা বানান সংস্কারের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে। ১৯৪৭-৭১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে একাধিকবার শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষাকে ঐতিহ্য-বিচ্যুত করার প্রয়াস ঘটেছিল। ৬.২-৬.৩ উপ-অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই যুক্তিকে আরও একটু প্রসারিত করে বলা যায়, বাংলা লিপির সহসা আমূল পরিবর্তন পূর্ব ভারতের অন্যান্য ভাষাকেও প্রভাবিত করবে। বাংলা ব্যতিরেকেও বেশ কিছু ভাষা বাংলা লিপিতে লেখা হয়। অসমিয়া ভাষা বাংলা থেকে বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত ড়, ঢ়, ৎ, য় গ্রহণ করেছে। ৱ অক্ষরটি কেবল অসমিয়া ভাষা লেখার ক্ষেত্রে মৌলিক সংযোজন। ৰ মধ্যযুগের বাংলা লিপিতে বহুল দৃষ্ট। কগবরক, সাঁওতালি, মণিপুরি, চাকমা ইত্যাদি ভাষাও বাংলা লিপিতে লেখা হয়েছে। এখন বাংলা লিপি যদি তার গঠন কিংবা যুক্তব্যঞ্জনের বিন্যাস সহসা পালটে ফেলে, বাকি ভাষাগুলির ওপরেও তা প্রভাব ফেলবে। এই আশঙ্কা যথাযথ। তবে আকাদেমির লিপি-স্বচ্ছতার প্রস্তাব প্রথাকে খুব বেশি অস্বীকার করেনি। বরং বাংলা লিপিকে যুগোপযোগী করে তুলতে চেয়েছে।

৪। আকদেমির বানানবিধির বিরুদ্ধে কেউ কুম্ভিলকবৃত্তির অভিযোগ তুলেছেন (রায়চৌধুরী ১০)। তাঁদের দাবি, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির প্রচেষ্টাকে আকাদেমি মৌলিক বানান-সংস্কার বলে প্রচার করেছেন। ৫.৪ উপ-অধ্যায়ে যোগেশচন্দ্রের বিকল্প বানান প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত, তাঁর প্রস্তাবের সঙ্গে আকাদেমির কোনো সাদৃশ্য নেই। এমনকি, থাকলেও সমস্যা ছিল না। বানান-সংস্কারের প্রস্তাবের মৌলিকত্ব বিচার্য নয়। প্রস্তাবিত বানানবিধির ব্যাকরণগত ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা থাকাই যথেষ্ট।

৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে একদা অভিযোগ উঠেছিল, তাঁদের বানান-সংস্কার প্রস্তাব দেশে বেকারত্ব বৃদ্ধির জন্য দায়ী। লাইনোটাইপ যন্ত্রে বাংলা ভাষা মুদ্রিত হলে বিদেশের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি বিদেশি লাইনোটাইপ যন্ত্রের অনুকূল, অতএব পরিত্যাজ্য। *মাসিক বসুমতী* পত্রিকায় লেখা হয়েছিল —

[২৭] বন্ধনীর মধ্যে স্পষ্টীকরণ বর্তমান গবেষক-কৃত।

লাইনো মেসিনে কম্পোজের অনুরোধে বাঙ্গালা বানানের পরিবর্ত্তনে সচেষ্ট না হইয়া তাঁহারা প্রচলিত বানান অনুসারে মেসিনের ছাঁচ করাইবার প্রচেষ্টা করিলে তাঁহাদের প্রয়াস সার্থক হইতে পারিত। যে বিশ্ববিদ্যালয়লব্ধ শিক্ষার ফলে অন্নসংস্থান হয় না — বেকার উমেদারের সংখ্যা দিন দিন প্রবর্দ্ধিত হইতেছে — সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে বানান সংস্কারের নামে সাহিত্য-সংহারের অন্তরালে বিদেশী বণিকের সম্পদবৃদ্ধির সহায়তার প্রচেষ্টা — সঙ্গে সঙ্গে বহু ভদ্রপরিবারের অন্নহানির প্রয়াস — বেকারসমস্যা বৃদ্ধির উদ্যম যে উচ্চ প্রশংসার যোগ্য, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই! (দত্ত, শশিভূষণ ৩৫৬)

একই যুক্তি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানান-সংস্কার প্রয়াসের বিরুদ্ধেও উত্থাপন করা যায়। মুদ্রণে সুবিধা কিংবা শিশুপাঠ্যতার কারণে বাংলা বানান ও লিপির সহজীকরণ কতদূর কাম্য? উপরের উদ্ধৃতিতে অতিশয়োক্তি কিঞ্চিৎ রয়েছে। কিন্তু মূল বক্তব্যটি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। প্রযুক্তির অনুরোধে বাংলা বানান পরিবর্তন না করে মুদ্রণ-প্রযুক্তিকে বাংলা বানানের উপযোগী করে তুলতে হবে। প্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তনশীল। ব্যাকরণ কিন্তু মোটামুটি স্থিতিশীল। বানানের ভিত্তি হবে ব্যাকরণ, প্রযুক্তি নয়। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লেখার পক্ষপাতী নয়। গত শতকে ছয়ের দশকে *আনন্দবাজার পত্রিকা* মুদ্রণের সুবিধার্থে যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লিষ্ট করে লিখতে শুরু করলে মণীন্দ্রকুমার ঘোষ একই সুরে আপত্তি জানিয়েছিলেন –"কেবল টাইপ-রাইটারের সুব্যবস্থার চিন্তায়ই কি ভাষাপ্রকৃতি আমূল উৎপাটিত করিয়া বাংলা ভাষাকে ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জন দিতে হইবে?" (ঘোষ, মণীন্দ্রকুমার ৮৮)

৬। আকাদেমির বানানবিধির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া তীব্র হওয়ার আরেকটি কারণ হল — আকাদেমি অনেক ধরনের ভাষা-সংস্কার একসঙ্গে করতে চেয়েছিল। এগুলিকে তালিকাবদ্ধ করা যেতে পারে—

ক. বানান সংস্কার,

খ. লিপির স্বচ্ছতাবিধান,

গ. পাঠ্যপুস্তকে পরিভাষা পরিবর্তন ('পুরুষ' বদলে 'পক্ষ'),

ঘ. সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে ধ্রুপদি লেখকদের সাধুভাষা পালটে চলিত বাংলা গদ্যে রূপান্তর[২৮],

ঙ. সর্বোপরি, পাঠ্যপুস্তক আকাদেমি নির্দেশিত বানানে মুদ্রিত না হলে— এমনকি ব্যাকরণসম্মত প্রথাগত বানানে মুদ্রিত হলেও— সরকারি স্বীকৃতি-প্রদানে অনীহা।

লক্ষণীয়, উপরের তালিকায় বানান-সংস্কার এবং পাঠ্যপুস্তকে আকাদেমির বানান আবশ্যিককরণ দুটি আলাদা ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। আকাদেমির বানান-সংস্কার প্রয়াস বিশ শতকের আটের দশক থেকে শুরু হয়েছিল। কিন্তু আকাদেমি যদি সরকারি আনুকূল্যে পাঠ্যপুস্তকের বানান বাধ্যতামূলকভাবে পালটে ফেলার চেষ্টা না করত, তাহলে এত তীব্র সামাজিক প্রতিক্রিয়া সম্ভবত হত না। এই শেষের সিদ্ধান্ত সরাসরি প্রকাশকদের লাভ-ক্ষতির সঙ্গে জড়িত ছিল। এই নির্দেশিকার ফলে রাতারাতি পুরোনো পাঠ্যপুস্তক—

[২৮] অধ্যাপক পবিত্র সরকার জানিয়েছেন, ২০০০ সালে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ও গবেষণা পর্ষদের এক কর্মশালায় ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণিতে সাধুভাষা চলিত গদ্যে রূপান্তরের প্রাথমিক খসড়া গৃহীত হয় (রায়চৌধুরী ৩৩৫)।

বিষয়গতভাবে ঠিক থাকা সত্ত্বেও— বানানের কারণে ব্যবহারযোগ্যতা হারাল। তৎকালীন পরিস্থিতির বিবরণ দিয়েছেন অধ্যাপক পবিত্র সরকার—

> প্রথম দিকে কাগজগুলি এ নিয়ে প্রচুর হট্টগোল করেছিল, ২০০৪ সালে জনপ্রিয় দৈনিকে শিরোনাম হয়েছিল, 'বাংলা যুক্তক্ষরের রূপ পালটে দিয়ে চমক রাজ্যের'। তাতে 'কাহার পরামর্শ লইয়াছেন' বলে সম্পাদকীয়ও লেখা হয়েছিল। ... কেউ কেউ বিরোধিতার অতিউৎসাহে ভেবেছিলেন বাংলা যুক্তাক্ষর ভাঙা হয়েছে, তাতে 'ঐতিহ্য গেল!' বলে হাহাকার শুরু হয়েছিল। এই লেখকের প্রতি ব্যক্তিগত কটুকাটব্য প্রচুর হয়েছিল। কবি বিষ্ণু দে-র জ্যেষ্ঠা কন্যা, বন্ধু রুচিরা প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমার বাবার নাম তোমরা পালটে দিলে?' তখন প্রাণপণ বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে, বাংলার একটা যুক্তব্যঞ্জনও আমরা ভাঙিনি, বরং তার চেহারা 'স্বচ্ছ' করার চেষ্টা করেছি। (সরকার, "ভাষাদিবসের চর্চা")

পবিত্রবাবুর দৃষ্টিকোণ থেকে যা 'বিরোধিতার অতিউৎসাহ' কিংবা 'প্রচুর হট্টগোল', অন্যদিকে তার সঙ্গে কিন্তু প্রচুর মানুষের জীবন-জীবিকার প্রশ্ন জড়িত ছিল। কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরির প্রাণপুরুষ সন্দীপ দত্ত জানিয়েছেন (রায়চৌধুরী ৩৪৩-৩৪৭), মধ্যশিক্ষা পর্ষদ একেকটি পাঠ্যপুস্তকের জন্য দুজন করে পর্যবেক্ষক (reviewer) নিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা অনেকেই আকাদেমির বানানবিধির সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। ফলে আকাদেমি-নির্দেশিত বানান বাতিল করে তাঁরা 'শুদ্ধ' বানান লেখার নির্দেশ দিচ্ছিলেন। *আকাদেমি বানান অভিধান*-এর একাধিক সংস্করণ বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হল এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রতিবাদসভা আয়োজিত হয়। লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরির তরফ থেকে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অবমাননার চক্রান্ত'-এর বিরুদ্ধে প্রচার করা হয়। একটি ছাত্র সংগঠন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বিরুদ্ধে মামলা করে। ২২ মে, ২০০৪ কলকাতার জীবনানন্দ সভাঘরে 'বাংলা ভাষা-সাহিত্যে উদ্ভটত্বের সমস্যা' শীর্ষক এক সভার আয়োজন করা হয়। নবারুণ ভট্টাচার্য, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সুনন্দ সান্যাল, অনির্বাণ ধরিত্রীপুত্র প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সেই সভায় বক্তব্য পেশ করেন। ৩১ মে, ২০০৪ সালে জীবনানন্দ সভাঘরে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ একটি সভার আয়োজন করেন। বাংলা আকাদেমির সদস্যগণ এবং কয়েকজন শিক্ষাবিদ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, শিক্ষার্থীরা আকাদেমি-নির্দেশিত বানানের বাইরে প্রচলিত বানান লিখলেও তা শুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। সাধু থেকে চলিত বাংলায় রূপান্তরিত গদ্যগুলি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৭। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির কতিপয় গঠনগত সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অধ্যাপক মৃণাল নাথ। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত 'বাংলা বানানবিধি' নামক পুস্তিকার *নিবেদন* অংশে কয়েকবার 'বানান সমিতি'-র উল্লেখ আছে (*পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গৃহীত বাংলা বানানবিধি* ১,৩)। কিন্তু কারা এই 'বানান সমিতি'-র সদস্য? কীভাবে তাঁরা নির্বাচিত হলেন? এর কোনো স্পষ্ট উত্তর পূর্বোক্ত পুস্তিকা থেকে পাওয়া যায় না। বানান অভিধানের শুরুতে অবশ্য এই জিজ্ঞাসার উত্তর কিয়দংশে পাওয়া যায় (সরকার প্রমুখ আখ্যাপত্র)। আরও একটি জটিল বিষয় হল আকাদেমির সঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সম্পর্ক। পর্ষদের পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কিত নির্দেশ আকাদেমির বানানকে শিক্ষাক্ষেত্রে একচ্ছত্র বৈধতা দেয়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে কারা এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আকাদেমির বানানই একমাত্র পাঠ্যপুস্তকে মুদ্রিত হওয়ার যোগ্য? অধ্যাপক নাথ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, আকাদেমি পর্ষদকে প্রভাবিত করেছিলেন এমন সিদ্ধান্ত নিতে—

পর্ষদকে শিখণ্ডি দাঁড় করিয়ে পেছন থেকে রথ পরিচালনা করেছেন আকাদেমিরূপী কৃষ্ণ। পর্ষদের লিখিত ফতোয়া আকাদেমি প্রবর্তিত বানান না মানলে, বা লিপি বিশেষ একজনের নিকট থেকে কিনে বই না ছাপলে তা বিবেচিতই হবে না। (রায়চৌধুরী ৩৫৯)

এই অভিযোগের সত্য-মিথ্যা নিরূপণ বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে স্বচ্ছতার অভাব ছিল বলে মনে হয়। আকাদেমির বানানবিধি বাধ্যতামূলক করার আগে, কারা সেই সিদ্ধান্ত নিলেন, কবে কোন্ যুক্তির ভিত্তিতে বাকি সমস্ত শুদ্ধ বানান পাঠ্যপুস্তকে বাতিল বলে পরিগণিত হল— সাধারণ মানুষকে স্পষ্টভাবে সেইসব তথ্য জানানো জরুরি ছিল। আকাদেমি এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ দুটি সর্বজনমান্য সংস্থা। তাঁদের পারস্পরিক প্রভাব এবং নির্ভরশীলতার সমীকরণ স্পষ্ট হওয়া দরকার।

৮। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানান সমিতির সদস্য হিসাবে যাঁরা বানানবিধি প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁরা অনেকেই কিন্তু ব্যক্তিগত বানান-ব্যবহারের ক্ষেত্রে আকাদেমির বানানবিধি সর্বাংশে মেনে নেননি। অধ্যাপক পবিত্র সরকার পরবর্তীকালে নিজে একাধিক বানান অভিধান সংকলন করেছেন। বর্তমান গবেষককে প্রদত্ত একটি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক সরকার জানিয়েছিলেন —

প্রশ্ন: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানের কিছু সীমাবদ্ধতা কি তাহলে আপনার নজরে পড়েছিল, যার জন্য অন্য একটি অভিধান প্রণয়নের আপনি প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন?

উত্তর: সীমাবদ্ধতা তো কিছুটা ছিলই। অনেক শব্দ ছিল না। 'বানান বিবেচনা'র পরেও কিন্তু আমার একটা বানান অভিধান বেরিয়েছে। 'ব্যবহারিক বানান অভিধান' নামে লতিকা প্রকাশনী থেকে বার করেছে। সীমাবদ্ধতা মানে সংখ্যার সীমাবদ্ধতা।...

প্রশ্ন: একই ব্যক্তি যখন একটি বিধিতেও যুক্ত থাকছেন, আবার নিজস্ব বানানেও লিখছেন; তখন বানানবিধির সর্বজনমান্যতা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে কি মনে হয়?

উত্তর: ঠিকই বলেছ। নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।... (সরকার, অধ্যাপক পবিত্র সরকারের সাক্ষাৎকার, পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য)

লক্ষণীয়, আকাদেমির স্বচ্ছ লিপির নীতি অধ্যাপক সরকারের ব্যক্তিগতভাবে-লিখিত অভিধানগুলিতে মানা হয়নি। যদিও এটি প্রকাশকের সিদ্ধান্ত বলে তিনি জানিয়েছেন, তবু এই সিদ্ধান্ত আকাদেমির লিপি-স্বচ্ছতার সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয়। অধ্যাপক সুভাষ ভট্টাচার্যও পরবর্তীকালে আকাদেমির বানানবিধিকে পুরোপুরি সমর্থন করেননি। আকাদেমি ছাড়াও সাহিত্য সংসদের একাধিক অভিধান-প্রকল্পের সঙ্গে তিনি যুক্ত। বর্তমান নিবন্ধকারকে তিনি জানিয়েছিলেন, ব্যক্তিগত লেখালিখির বানানের ক্ষেত্রে আকাদেমি বা সংসদ কাউকেই তিনি একশ শতাংশ মান্য করেন না —

প্রশ্ন: পশ্চিমবঙ্গে বানান বিষয়ে যে তিনটি মান্য সংস্থা রয়েছে — পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, সাহিত্য সংসদ, আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠী — প্রত্যেকটি বানান তৈরির প্রক্রিয়ার সঙ্গে আপনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আপনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কোন্ বিধি মেনে চলেন আপনার নিজস্ব লেখালেখির ক্ষেত্রে? এই তিনটি বিধির মধ্যে খুব অল্প হলেও ফারাক রয়েছে আমরা জানি।

> উত্তর: অবশ্যই, ফারাক তো আছেই। আসলে ব্যক্তিগত ভাবে বলতে গেলে এই তিনটির সঙ্গে আমার কিছু কিছু মতভেদ আছে। ... এখন যেটা প্রশ্ন তোমার সেটা হচ্ছে, আমি ব্যক্তিগতভাবে সবগুলো মানতে পারিনি। কিন্তু মিটিং যখন হচ্ছে আমি সেগুলো মেনে নিয়েছিলাম কাজের স্বার্থে, নইলে কাজটা এগোবে না। (ভট্টাচার্য, সুভাষ, অধ্যাপক সুভাষ ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার, পরিশিষ্ট ২ দ্রষ্টব্য)

আকাদেমির বানান-সমিতির সদস্যরাই যদি আকাদেমিকে সর্বাংশে মেনে না নেন, তাহলে প্রকাশকদের সরকারি নির্দেশ দিয়ে আকাদেমির বানান মানতে বাধ্য করা কতদূর যুক্তিসংগত? এটি শুধু ব্যাকরণগত প্রশ্ন নয়। নৈতিক দিক থেকেও নিজের বানান-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে প্রকাশকের ওপর নিয়ম চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয় বলেই মনে হয়।

আকাদেমির বানানবিধির বিরোধীপক্ষের মূল বক্তব্যগুলি এতক্ষণ খতিয়ে দেখা হল। প্রধানত ২০০৩-৪ সালে আকাদেমি এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে কেন্দ্র করে যে বানান-বিতর্ক ঘনিয়ে উঠেছিল, তার কিছু বিরুদ্ধমতের উত্তর পবিত্র সরকার পরবর্তীকালে দিয়েছেন (সরকার, *চম্‌স্কি ব্যাকরণ ও বাংলা বানান* ৩৪৫-৩৭৬)। আমাদের বিবেচনায়, মূল বিতর্কটির প্রকৃতি চিনে নিতে অনেকেই ভুল করেছেন। এটি আদৌ বানান-সম্পর্কিত বিতর্ক ছিল না। আকাদেমি কোনোদিনই তাঁদের বানানবিধির বিস্তারিত ব্যাকরণগত ব্যাখ্যা দেয়নি। আকাদেমি কেবল নির্দেশ দিয়েছিল। অন্যদিকে, বিরোধীপক্ষের বক্তব্যেও নিবিড় ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ খুব একটা পাওয়া যায় না। এটি ছিল মূলত সামাজিক বিতর্ক। আকাদেমি ২০০৩-৪ সাল নাগাদ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের যৌথ পৃষ্ঠপোষণায় বাংলাভাষী জনগণের সঙ্গে ক্ষমতার যে সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিল, অনেকেরই তাতে আপত্তি ছিল। প্রকাশকদের আর্থিক সমস্যার দিকটিও আকাদেমি বিবেচনা করেনি। ভাষা-পরিকল্পনার প্রয়াস সামাজিক অনুমোদন না-পেলে ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেবল ব্যাকরণ বানানকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। সাধারণ্যে আকাদেমির বানানবিধির তীব্র বিরোধিতা এই বক্তব্যের প্রমাণ হয়ে থাকল।

৫.৯ সিদ্ধান্ত

প্রমিত বানানবিধির বিকল্প প্রস্তাবের উল্লেখযোগ্য মাইলফলকগুলি কালানুক্রমিকভাবে বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনা করা হল। কোনো ব্যাকরণ বা বানানবিধিই একশ শতাংশ বিতর্কমুক্ত নয়। প্রমিত বানান থাকলে বিকল্প বানানের প্রস্তাবও থাকবে। এই বিকল্পের দুটি মাত্রা বর্তমান আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, ভাষার অভ্যন্তরে কিছু শব্দের বিকল্প বানান থাকবে। বানানকে নির্বিকল্প করে তোলার আতিশয্যে ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ বানানকে বাতিল করে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত, ভাষার বাইরে সামাজিক স্তরেও প্রমিত-বিরোধী কণ্ঠস্বর থাকা স্বাভাবিক।

ঔপনিবেশিক আমলে বিদেশিদের রচিত ব্যাকরণগ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা বানান প্রমিতকরণ শুরু হয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা ব্যাকরণের প্রমিত রূপটি মোটামুটিভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। আর সেই সময় থেকেই প্রমিত বানানের বিরুদ্ধে বিকল্প স্বরগুলি ক্রমশ অবয়ব ধারণ করতে থাকে। জন মারডক বা যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির বিকল্প বানানের প্রস্তাব বাংলা ভাষার ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে পেশ করা হয়নি। অন্যদিকে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দেবপ্রসাদ ঘোষের বক্তব্যে কিছুটা উষ্মা থাকলেও, তাঁর মূলগত যুক্তিসমূহ

উপেক্ষণীয় নয়। বাংলা বানান সংস্কার করতে গিয়ে সংস্কৃত শব্দের বানানে হস্তক্ষেপ করার আদৌ প্রয়োজন নেই বোধহয়। দুটি শুদ্ধ বিকল্প বানানের মধ্যে একটিকে সহসা অচল বলে দেগে দিলে বিভ্রান্তি বাড়ে। বাংলা অণুপত্রিকার জগতে বানান নিয়ে যে-সব নিরীক্ষা হয়েছে, মূলস্রোতের ভাষাকে তা বিশেষ প্রভাবিত করতে পারেনি। আকাদেমির বানানবিধিও, ঠিক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির মতোই, বহুলাংশে ব্যর্থ। পাঠ্যপুস্তকে আবশ্যিকভাবে ব্যবহার করার কারণে বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে এই বানানবিধি কিঞ্চিৎ সফল হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু তার বাইরে বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা কম। এমনকি, যাঁরা এই বানানবিধি প্রণয়ন করেছিলেন, তাঁদের একাংশ নিজেরাও পরবর্তীকালে নিজের নিজের বিকল্প বানান বেছে নিয়েছেন। সপ্তম অধ্যায়ে আকাদেমি বানানবিধির গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে সমীক্ষা করা হয়েছে।

লক্ষণীয়, যে-সব বিকল্প সম্ভাবনার কথা বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনা করা হল, দেবপ্রসাদ ঘোষের বক্তব্য ব্যতিরেকে বাকি কোনোটিই ব্যাকরণগত যুক্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। বরং বিবিধ সামাজিক উপাদান বিকল্প বানানের সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করেছে। জন মারডক, নিজে বিদেশি হওয়ার কারণে, রোমক অক্ষরে বাংলা লেখার প্রস্তাব করেন। অতিরিক্ত হস্-চিহ্ন ব্যবহার, 'দ্বিতল যুক্তাক্ষর' বিশ্লেষণ, সহলেখ (allograph) বর্জন প্রভৃতি প্রস্তাবের প্রত্যেকটিই বিদেশি শিক্ষার্থীর দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। পক্ষান্তরে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা উচ্চারণের নিরিখে রোমক অক্ষর কতটা বেমানান, তা অনুধাবন করেই প্রয়োজনীয় সংশোধনীর প্রস্তাব দিয়েছিলেন (উপ-অধ্যায় ৪.৫.১ দ্রষ্টব্য)। যোগেশচন্দ্রের বানান সংস্কারের পিছনে প্রণোদনা ছিল তৎকালীন আমলে মুদ্রণ-যন্ত্রের সীমাবদ্ধতা। অণুপত্রিকা তার স্বধর্মের কারণে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হওয়াই স্বাভাবিক। তবে প্রমিত বানানবিধির প্রত্যাশামাফিক যুক্তিসংগত বিরোধিতা অণুপত্রিকার জগতে তেমন নজরে পড়েনি। অনেক বেশি তীব্র প্রতিক্রিয়া বরং পাওয়া যায় আকাদেমির বানানবিধির বিরুদ্ধে। ব্যক্তিগত অসূয়া, রাজনৈতিক বৈরিতা, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশকদের বাণিজ্যিক সমস্যা, আকাদেমি এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পারস্পরিক সম্পর্কে অস্বচ্ছতা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে আকাদেমির বানানবিধি সাধারণ্যে প্রবল বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছে। এর কোনোটিই প্রায় ব্যাকরণগত কারণ নয়। সামগ্রিকভাবে বোঝা যাচ্ছে, অ-ব্যাকরণগত উপাদান বিকল্প বানান-প্রস্তাবের অন্যতম অনুঘটক।

এমতাবস্থায় ভবিষ্যতে বানানবিধি তৈরির সময় পূর্বোক্ত সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির দিকেও লক্ষ রাখতে হবে। কেবল তাত্ত্বিক ব্যাকরণের নিটোল যুক্তি কখনোই একটি সর্বজনমান্য বানানবিধি নির্মাণের জন্য যথেষ্ট নয়।

তথ্যসূত্র

Carey, William. *A Grammar of the Bengalee Language.* The Mission Press, Srerampore, 1818, https://archive.org/details/grammarofbengale00carerich/mode/2up

Chatterji, Suniti Kumar. *The Origin And Development Of the Bengali Language.* Rupa, 2017.

Chaudhary, Shreesh. *Foreigners and Foreign Languages in India: A Sociolinguistic History.* 1st ed., Foundation Books, 2011. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1017/UPO9788175968493

De, S. K. *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century (1800-1825).* University of Calcutta, 1919.

Hosten, H. "The Three First Type Printed Bengali Books." *Bengal: Past & Present — Journal of Calcutta Historical Society*, vol. ix, no. 1 (serial no 17), Sept. 1914, https://archive.org/details/bengalpastprese01socigoog/mode/2up.

Khondkar, Muhammad Abdur Rahim. *The Portuguese Contribution to Bengali Prose, Grammar and Lexicography.* School of Oriental and African Studies, University of London, 1971. *DOI.org (Datacite)*, https://doi.org/10.25501/SOAS.00028588.

Minutes of the Senate and the Faculties for the Year 1936. Minutes, Accession No. 104710, Calcutta University Press, 1936, https://www.caluniv.ac.in/digital-lib-dev/ebook/pdf_view.php?pdflink=https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/calcutta-university/minutes-of-the-senate-provisional-committee-syndicate-council/minutes_1936.pdf&cat_type=A.

Minutes of the Syndicate: For the Year 1935, Part Iv. Minutes, Accession No.100890, Calcutta University Press, 1935, https://www.caluniv.ac.in/digital-lib-dev/ebook/pdf_view.php?pdflink=https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/calcutta-university/minutes-of-the-senate-provisional-committee-syndicate-council/minutes_1935_p4.pdf&cat_type=A.

Minutes of the Syndicate: For the Year 1935, Part v. Minutes, Accession No.103161, Calcutta University Press, 1935, https://www.caluniv.ac.in/digital-lib-dev/ebook/pdf_view.php?pdflink=https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/calcutta-university/minutes-of-the-senate-provisional-committee-syndicate-council/minutes_1935_p5.pdf&cat_type=A.

Minutes of the Syndicate: For the Year 1936, Part v. Minutes, Accession No. 109498, Calcutta University Press, 1936, https://www.caluniv.ac.in/digital-lib-dev/ebook/pdf_view.php?pdflink=https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/calcutta-university/minutes-of-the-senate-provisional-committee-syndicate-council/minutes_1936_p5.pdf&cat_type=A.

Murdoch, John. *Letter to Babu Ishwar Chandra Bidyasagar on Bengali Typography*. 22 Feb. 1865, https://indianculture.gov.in/rarebooks/letter-babu-ishwar-chandra-bidyasagar-bengali-typography.

Qayyum, Muhammad Abdul. *A Critical Study of the Bengali Grammars of Carey, Halhed and Haughton.* School of Oriental and African Studies, University of London, 1974. *eprints.soas.ac.uk*, https://doi.org/10.25501/SOAS.00029000.

আচার্য, পরমেশ. *বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা.* দ্বিতীয় সংস্করণ, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০০৯.

ঘোষ, দেবপ্রসাদ. *বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান.* মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ.

ঘোষ, মণীন্দ্রকুমার. *বাংলা বানান.* দে'জ ষষ্ঠ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, শ্রাবণ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ.

চক্রবর্তী, বামনদেব. *উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ.* অক্ষয় মালঞ্চ, ২০১৮.

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার. *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ.* ২০১৭, রূপা, ২০১৭.

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. "বাংলাভাষা-পরিচয়." *রবীন্দ্র-রচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড)*, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, vol. ১৩, বিশ্বভারতী, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ.

দত্ত, শশিভূষণ, editor. "সাময়িক প্রসঙ্গ (বাঙ্গালা বানানের নূতন নিয়ম)." মাসিক বসুমতী, vol. ১ম খণ্ড, no. দ্বিতীয় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩, https://southasiacommons.net/artifacts/2341560/masik-basumati/. South Asia Commons.

দত্ত, সন্দীপ. *বাংলা গল্প-কবিতা আন্দোলনের তিন দশক.* প্রথম সংস্করণ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৩.

— *লিটল ম্যাগাজিন ভাবনা.* প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণাকেন্দ্র, ২০০০.

দাশ, জীবনানন্দ. *ধূসর পাণ্ডুলিপি.* প্রথম সিগনেট সংস্করণ, সিগনেট প্রেস, ফাল্গুন, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ.

দাশ, নির্মলকুমার. *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ.* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, http://hdl.handle.net/10603/151273.

দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন. "দিদি, -দী." *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*, দ্বিতীয় সংস্করণ :১৯৩৭, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২০২০, https://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/app/dasa_query.py?page=1069.

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গৃহীত বাংলা বানানবিধি. সংশোধিত সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট, ২০০৩.

পাল, পলাশ বরন. *আ মরি বাংলা ভাষা.* প্রথম প্রকাশ, অনুষ্টুপ, ২০১১.

— *ধ্বনিমালা বর্ণমালা.* দ্বিতীয় সংস্করণ, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১৫.

— *হক কথা.* প্রথম প্রকাশ, পরম্পরা, মে ২০১৩.

প্রসঙ্গ বাংলাভাষা. দ্বিতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৩.

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, editor. *বঙ্গীয় শব্দকোষ,* সাহিত্য অকাদেমী, p. ১৫০২.

বসু, মৃদুল কান্তি. *নতুন বাংলা বানান.* প্রথম সংস্করণ, মাদার পাপবলিশিং, ২০০২.

ভট্টাচার্য, মিতালী. *বাংলা বানানচিন্তার বিবর্তন.* প্রথম সংস্করণ, পারুল প্রকাশনী, ২০০৭.

ভট্টাচার্য, সুভাষ. অধ্যাপক সুভাষ ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার. সাক্ষাৎকার গ্রহণ: শ্যামাশ্যাম কৃষ্ণপূজারি চট্টোপাধ্যায়, অডিয়ো, ১২ জানুয়ারি, ২০২০, https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=subhash.

— *তিষ্ঠ ক্ষণকাল: বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ.* পঞ্চম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩.

মজুমদার, পরেশচন্দ্র. *বাঙলা বানান বিধি.* দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪.

রায় বিদ্যানিধি, যোগেশচন্দ্র. *বাঙ্গালা ভাষা: প্রথম ভাগ (ব্যাকরণ).* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ.

রায়চৌধুরী, মাণিকলাল, সম্পা. *আ-মরি বাংলা ভাষা.* প্রথম সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ প্রধানশিক্ষক সমিতি, ফেব্রুয়ারি, ২০০৫.

রায়, সিতেস. *বাংলা বানান সমতা ও নয়া বরন পরিচয়.* প্রথম সংস্করণ, সংসক্রিতি প্রকাসন, ১৯৯৮.

সরকার, পবিত্র. অধ্যাপক পবিত্র সরকারের সাক্ষাৎকার. সাক্ষাৎকার গ্রহণ: শ্যামাশ্যাম কৃষ্ণপূজারি চট্টোপাধ্যায়, অডিয়ো, ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৯, https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VAZtLKlS6tg5bkKwDlOshxB7Zx74V7jo.

— *আকাদেমি বানান অভিধান.* চতুর্থ সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, নভেম্বর, ২০০৩.

— *চম্‌স্কি ব্যাকরণ ও বাংলা বানান.* পুনশ্চ, ২০১৩.

— "ভাষাদিবসের চর্চা: বাংলা ভাষার কিছু কাজকর্ম - পবিত্র সরকার." *BanglaLive*, 21 Feb. 2022, https://banglalive.com/bengali-language/.

ষষ্ঠ অধ্যায়: সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বানান

৬.১ বাংলাদেশের বাংলা বানান এবং পশ্চিমবঙ্গের বাংলা বানান

শব্দের বানান কেবল ব্যাকরণ দ্বারা নির্ধারিত হয় না। বিষয়টি সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তবে সেক্ষেত্রে আলোচিত তত্ত্ব প্রধানত ভারতের বাঙালিদের ব্যবহৃত বাংলা ভাষার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বাংলা বানান সংস্কারের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে প্রথম অধ্যায়ের বক্তব্যের মূলগত সত্যতা আরও সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। ভাষাতত্ত্বের সীমানা ছাড়িয়ে বিবিধ সামাজিক উপাদানও প্রভাব বিস্তার করে বানান নিয়ন্ত্রণে। এই বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গের (এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের) বাংলা বানান সমতাবিধানের ইতিহাস থেকে কিছুটা প্রচ্ছন্নভাবে বোঝা যায়। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশের বাংলা বানান সংস্কারের ইতিহাস অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ভাষাতত্ত্ব-বহির্ভূত সামাজিক উপাদান (ধর্ম, রাজনীতি, জাতীয় চেতনা, মুদ্রণপ্রযুক্তি ইত্যাদি) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

বর্তমানে ভারত ও বাংলাদেশের প্রমিত বাংলা বানানের রূপ প্রায় অভিন্ন। কিন্তু এই দুই দেশে বানান-সংস্কার শুরুর উদ্দেশ্য এবং মধ্যবর্তী যাত্রাপথ একেবারে আলাদা। অবিভক্ত ভারতবর্ষে বানান সংস্কারের উল্লেখযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ একবারই হয়েছিল।[১] তা ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার প্রয়াস (১৯৩৫-৩৭)। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে হলেও সেখানে বানান-সংস্কারের ইতিহাস যথাযথভাবে বুঝতে হলে আরও অন্তত তিন দশক পিছন থেকে শুরু করতে হবে। বর্তমান আলোচনায় তাই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ভাষাগত দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষাপটের ওপর আলোকপাত করা হবে। বস্তুত দেশভাগ হওয়ার অন্তত পঞ্চাশ বছর আগে থেকে— বাঙালি মুসলমান সমাজের একাংশ— ধর্মীয় কারণে বাংলা ভাষার 'সংস্কার' করতে চাইছিলেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৪৪ সালে ড. মুহম্মদ এনামুল হক লিখিত একটি পুস্তিকায়। ভাষাতাত্ত্বিকভাবে বাংলা বর্ণমালা দু'ভাবে সংস্কার করা যেতে পারে —

১। বর্ণের আকৃতির স্বচ্ছতাবিধান তথা সহজবোধ্য আকৃতিযুক্ত যুক্তাক্ষর প্রচলন। যেমন: রু কিংবা দ্ধ -এর বদলে রু, দ্ধ।

২। বর্ণমালায় অপ্রাসঙ্গিক বর্ণের সংখ্যা হ্রাস। যেমন: ঋ, ৯, ঐ, ঔ, ঞ ইত্যাদি বর্ণ বাদ দেওয়া।

১৯৩৫ সালে আনন্দবাজার পত্রিকা লাইনোটাইপ প্রচলনের মাধ্যমে বাংলা যুক্তাক্ষরের আকৃতিতে অল্পবিস্তর কিছু পরিবর্তন আনে। এই উদ্যোগ বাংলা বর্ণমালার অন্যান্য ক্ষেত্রেও সংস্কার-সাধনকে উৎসাহ

[১] প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের 'চ'ল্‌তি ভাষার বানান' (১৩৩২ বঙ্গাব্দ) স্বল্প প্রচারিত বলে বর্তমান আলোচনায় ধর্তব্য নয়।

জুগিয়েছিল। মুসলমান লেখকদের একাংশ অবশ্য ব্রিটিশ শাসনকাল থেকেই বাংলা বর্ণমালা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে আরবি অক্ষরে বাংলা লেখার চেষ্টা করে আসছিলেন। ড. হকের বিবরণ নিম্নরূপ[২] —

> ... খ্রীস্টীয় [ঊনবিংশ] শতাব্দীর শেষার্ধে, বাঙলার কতিপয় মুসলমান আরবী হরফে বাঙলা লিখিতে শুরু করিয়াছিলেন। ... এই সেই দিনও (মাত্র আট-দশ বৎসর আগে) চট্টগ্রাম হইতে মৌলবী জুলফক্কার আলী সাহেব আবার বাঙলা হরফের পরিবর্তে আরবী-হরফে বাঙলা লিখিবার চেষ্টা পান এবং স্বয়ং অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয়ে একখানা পত্রিকা বাহির করিয়া আপন খেয়াল পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিলেও, কেহ তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করে নাই। (শরীফ ২৬-২৭)

পাকিস্তান গঠনের আগে যা ছিল বিক্ষিত ব্যক্তিগত উৎকেন্দ্রিকতা, দেশভাগ-পরবর্তী তীব্র মেরুকরণের সময়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তা-ই হয়ে দাঁড়াল ধর্মীয় আবেগের বহিঃপ্রকাশ। লক্ষণীয়, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-সহ কোনো কোনো ভাষাতাত্ত্বিক বাংলা লিপি পরিত্যাগ করে রোমক লিপিতে বাংলা ভাষা লেখার প্রস্তাব করেছেন।[৩] তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে লিপিগত ঐক্যসাধন এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলা ভাষার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি। রোমক লিপির ক্ষেত্রে কোনো ধর্মীয় প্রণোদনা কাজ না করলেও, আরবি লিপির ক্ষেত্রে বিষয়টি অন্যরকম ছিল।

৬.২ বাংলাদেশের বানান সংস্কারে ভিন্নতার কারণ

বাংলা ভাষা ও লিপিকে তার ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত করার এই ধরনের 'বৈপ্লবিক' প্রয়াস সফল হয়নি। সমকালীন বিদ্বৎসমাজও এর বিরোধিতা করেছিলেন। 'শহজ বাংলা' প্রকল্পের বছর দশেক আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন বানান সংস্কারের প্রয়াস করেছিল, তখন কিন্তু ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছিল। তার অল্পদিনের মধ্যেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বানান সংস্কার প্রয়াস এত আলাদা হয়ে গেল কেন? এর পিছনে কয়েকটি কারণ দর্শানো যায় —

প্রথমত, গত শতকের চারের দশকে ধর্মীয় মেরুকরণ অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে। নোয়াখালি, কলকাতা, বিহারের মতো বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় হিংসার ঘটনা ঘটতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে মুসলমান সমাজের একাংশের মনে হয়েছিল, ফোর্ট উইলিয়াম-শ্রীরামপুর মিশনের পণ্ডিতদের হাতে সংস্কৃতায়িত এবং হিন্দু-সংস্কৃতিতে জারিত বাংলা ভাষা নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানের উপযুক্ত নয়। আহমদ শরীফ তৎকালীন পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন —

> এমনি সময়ে যখন হিন্দুর লালিত হিন্দুয়ানীর বাহক বাঙলাভাষার নানা ত্রুটির কথা সুকৌশলে ছদ্ম আন্তরিকতায় উচ্চারিত হল, তখন ইসলামী শাস্ত্রের, জীবনদৃষ্টির ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের যুক্তিতে প্রাপ্ত পাকিস্তানে প্রায় সবাই এসব ত্রুটি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেই নিল। ... কোলকাতার ভাষা, বর্ণ, বানান অবিকৃত রাখলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাই যেন বৃথা হয়ে যায় । এদের অনুক্ত অভিপ্রায় ছিল, — এভাবে বর্ণে-বানানে-শব্দে, বাক্‌ভঙ্গিতে

---

[২] মূল সূত্র: মুহম্মদ এনামুল হক: *বাংলা-ভাষার সংস্কার*। প্রথম বন্ধনীর বক্তব্য উদ্ধৃতির অংশ। তৃতীয় বন্ধনীভুক্ত স্পষ্টীকরণ বর্তমান নিবন্ধকার-কৃত।

[৩] বিস্তারিত আলোচনার জন্য উপ-অধ্যায় ৪.৫.১ - ৪.৫.৪ দ্রষ্টব্য।

ও লিখনপদ্ধতিতে পার্থক্য সৃষ্টি করে অল্পকালের মধ্যেই হিন্দুরচিত বাঙলাগ্রন্থের সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানীদের চিরকালের জন্য চাক্ষুষ ও মানস বিচ্ছেদ ঘটানো। (শরীফ ৯-১০)

দ্বিতীয়ত, চিরায়ত ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন এই 'পাকিস্তানি বাংলা' কোন্ ভাষার আদর্শে গড়ে উঠবে, তার উত্তর হাতের কাছেই ছিল। কলকাতা এবং হুগলি নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উর্দুভাষী অধিবাসীদের দোভাষী মিশ্র সাহিত্য ইসলামি ঐতিহ্যের সঙ্গে মানানসই বাংলা বলে পূর্ব পাকিস্তানে প্রচারিত হল। বাংলা লিপি বর্জন করে তাকে উর্দু কিংবা আরবির নিকটাত্মীয় করে তোলার প্রয়াসও লক্ষ করা যায়। একই প্রবণতা থেকে, তৎসম শব্দ বর্জন করে কেউ কেউ বাংলায় যথেচ্ছ আরবি-ফারসি শব্দের মিশেল দিতে লাগলেন। 'শহজ বাংলা'-র বানান সংস্কার কোনো বিচ্ছিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক উদ্যোগ ছিল না। বরং সামগ্রিকভাবে বাংলা ভাষার 'পাকিস্তানায়ন' বিষয়ক পরিকল্পনার একটি অংশ ছিল বাংলা বানানকে তার ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত করা।

তৃতীয়ত, ১৯৪৭-পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মনে একটি দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল। বাঙালিসত্তা নাকি মুসলমানসত্তা — কোন্‌টিকে তাঁরা বেশি গুরুত্ব দেবেন? এই দ্বন্দ্বের প্রাচীনতম নথিবদ্ধ নিদর্শন পাওয়া যায় ষোড়শ শতকে সৈয়দ সুলতান, শেখ মুত্তালিব প্রমুখের লেখায়। 'হিন্দুয়ানী অক্ষর'-এ 'মুসলমানী শাস্ত্রকথা' রচনা করার 'অপরাধ'-এ আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁদের কৈফিয়ত দিতে হয়েছে।[৪] এতৎসত্ত্বেও লক্ষণীয়, ইংরেজ আমলের আগে পর্যন্ত সমস্যাটা ছিল অপেক্ষাকৃত সরল ও একমাত্রিক: নিছক ধর্ম ও ভাষার মধ্যে দ্বন্দ্ব। এর চেয়ে বেশি বহিরাগত কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রণোদনা সমস্যাটিকে জটিল করে তোলেনি। পক্ষান্তরে, উনিশ শতক থেকেই মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের অপেক্ষাকৃত দ্রুতহারে সামাজিক উন্নতি, ইংরেজদের প্ররোচনা, মুসলিম লিগের উত্থান, ক্রমশ মুসলমান মধ্যবিত্তের নবজাগরণ, তথাকথিত 'বুদ্ধির মুক্তি' ইত্যাদি নানা ঘটনা পরস্পরবিরোধী প্রভাব ফেলল মুসলমান জনমানসে। হিন্দু-রচিত সাহিত্যে মুসলমানরা যথাযথ গুরুত্ব পাননি। বঙ্গভঙ্গ-কেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট হয়ে যায় সিঁদুর-ধারণ, শঙ্খ বাজানো, ব্রতকথা শোনার মতো হিন্দু অনুষঙ্গ (সেন, অরুণ ১৭-১৮)। এর সঙ্গে বাহ্যিক প্ররোচনা হিসাবে কাজ করেছিল ইংরেজদের দ্বিজাতিতত্ত্বের নীতি। তৈরি হল পূর্বোক্ত 'মুসলমান এবং/অথবা বাঙালি' নামক দোটানা। বিশ শতকের দুইয়ের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে যে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন, তার চরিত্র পুরোপুরি ধর্ম-নিরপেক্ষ না হলেও, বাঙালি সত্তার চর্চা সেখানে সোৎসাহে হয়েছিল। *শিখা* পত্রিকায় প্রকাশিত কাজী আবদুল ওদুদের 'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা' ও 'বাঙ্‌লার জাগরণ', আনোয়ারুল কাদিরের 'বাঙালী মুসলমানের সামাজিক গলদ', রকীবউদ্দীন আহমদের 'বাঙালী মুসলমানের আর্থিক সমস্যা', আবুল হুসেনের 'বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলোর শিরোনাম থেকেই স্পষ্ট, নিছক ধর্মীয় পরিচয়ের সীমার বাইরে গিয়ে বাংলাদেশের মুসলমানদের বাঙালি সত্তা স্বীকৃত হচ্ছে এই সব লেখায়। *শিখা* পত্রিকারও আগের আমলের

---

[৪] *"জে সব বঙ্গে জন্মি হিংসে বঙ্গবানি। সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।। দেসি ভাষা বিদ্যা জার মনে না জুয়াএ। নিজ দেব তেয়াগি কেন বিদেশে না যাএ।। (য.)"* পূর্ববঙ্গের কবি আবদুল হাকিমের *'নূর নামা'* কাব্যের এই উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে (বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪৩) থেকে।

'বাসনা', 'আল্-এসলাম', 'ইসলাম দর্শন', 'ছোলতান' ইত্যাদি পত্রিকায় নানা সময়ে উঠে এসেছে বাংলাদেশের মুসলমানের বাঙালিত্ব নিয়ে বিতর্ক। বিস্তারিত আলোচনার জন্য পবিত্র সরকারের *বাংলা ভাষা, পূর্ব পাকিস্তান, বাংলাদেশ* নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য[৫] (সরকার, পবিত্র, *ভাষা, দেশ, কাল* ১৮০-২৪৩)।

এই মুসলমান/ বাঙালি দোটানার অভিমুখটি ধর্মের দিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছিলেন পাকিস্তানপন্থীরা। পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাকে যদি পশ্চিমবঙ্গের বাংলা থেকে দৃশ্যত (লিপি ও বানানের দিক থেকে) আলাদা করে দেওয়া যায়, তাহলে বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক জাতীয় আবেগ স্তিমিত হয়ে যাবে। গুরুত্ব পাবে ধর্মীয় পরিচয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবিও আর উঠবে না। আরবি অক্ষরে বাংলা লেখার বিষয়ে মূল উদ্যোগী ছিলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমান।

চতুর্থত, বাংলা হরফ এবং বানান পালটানোর একটি গূঢ়তর কারণ ছিল। সেই সময় পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষিতের হার ছিল যথাক্রমে ১২-১৫ শতাংশ এবং ৫ শতাংশের কম (উমর ২৭০)। বাংলা ভাষা তার ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে আরবি হরফে সহসা লেখা শুরু হলে, পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষিতের সংখ্যা ভগ্নাংশে নেমে আসবে। এতে নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে চাকরি, ব্যবসা, শাসনক্ষমতায় বাঙালি দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরীকে পরিণত হবে। ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড ও বর্ণমালা বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। তাতে লেখা হয় —

> হরফ পরিবর্তনের পশ্চাতে আছে শিক্ষা বিস্তারকে ব্যাহত করিবার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। ... বাংলা হরফকে পরিবর্তন করা চলিবে না। পাক-বাঙলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর কসাইয়ের মতো ছুরি চালনা করা চলবে না (য.)। (উমর ২৭৩-২৭৪)

পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিকে অবহেলা ও বঞ্চনার মাত্রা কেমন ছিল, তার কিছুটা হিসাব দেওয়া যেতে পারে। *বিবিসি নিউজ় বাংলা*-র একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে —

> পাকিস্তানের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৫০-৫৫), কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন বরাদ্দের মাত্র ২০ শতাংশ পেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। ... উনিশ'শ ছেষট্টি সালে প্রেসিডেন্ট সচিবালয়ে কর্মকর্তাদের ৮১ শতাংশ ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের আর মাত্র ১৯ শতাংশ পূর্বের। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে এই অনুপাত ছিল ৬৪ এবং ৩৬ শতাংশ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৯২ শতাংশ কর্মকর্তাই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ৭৮ শতাংশই ছিলেন পশ্চিমের বাসিন্দা। (আনোয়ার)

পাকিস্তান সরকারের উদ্যোগে বাংলা বানান ও লিপি পরিবর্তন কোনো ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তি থেকে করা হয়নি। এর পিছনে কাজ করেছিল ক্ষমতার অলিন্দে আধিপত্য কায়েমের সমীকরণ। রাষ্ট্রিক পরিসরে বাংলা ভাষা ও লিপির মর্যাদা না থাকলে সুবিধা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের।

---

[৫] পরবর্তীকালে এই প্রবন্ধটি *ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ* গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয় (সরকার, পবিত্র, *ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ*)। তবে বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভে পূর্বোক্ত প্রথম সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে।

পঞ্চমত, পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাকে পৃথক করে তোলার ধর্মীয় প্রণোদনা যদি নীরবে কাজ করে থাকে, অন্যদিকে প্রকাশ্যে প্রচারের জন্য একটি কেজো যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল। তা হল গণসাক্ষরতা। নবগঠিত রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্রুত শিক্ষার প্রসার হওয়া দরকার। সেই সময়ের মুদ্রণ-প্রযুক্তিও বাংলা ভাষার জটিল বানান-পদ্ধতি ও যুক্তাক্ষরের উপযুক্ত ছিল না। তাই ভাষাকে সরল করতে হবে। সম্ভব হলে উচ্চারণ-অনুগ বানান লিখতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সংস্কারকদের একাংশ এই ধরনের বক্তব্য প্রচার করেছিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যখন সাক্ষরতা প্রসারে অসুবিধার যুক্তিতে আরবি হরফের বিরোধিতা করছেন, তখনই আবার কেউ কেউ সাক্ষরতা প্রসারে সুবিধার অজুহাতে বাংলা ভাষাকে 'শহজ বাংলা' করে তুলতে চাইছেন।

৬.৩ পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি (১৯৪৯ খ্রি.)

নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানের আদর্শের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণভাবে বাংলা ভাষার সংস্কার-সাধনের কিছু উদ্যোগ সরকারি স্তরে লক্ষ করা যায়। এই বিতর্কিত পরিস্থিতিতে ১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' (East Bengal Language Committee) গঠিত হয় (ঘোষ)। কমিটির সদস্য ছিলেন ১৬ জন। সভাপতি ছিলেন মৌলানা মহম্মদ আকরাম খান। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, কবি গোলাম মুস্তাফা, কয়েকজন প্রাদেশিক মন্ত্রী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রমুখ। পরবর্তীকালে অবশ্য কয়েকজন সদস্য রদবদল হয়। বাংলা ভাষা সংস্কার, বাংলা লিপি পরিবর্তন, পরিভাষা নির্মাণ ইত্যাদি কাজের জন্য কয়েকটি উপ-সমিতি (sub-committee) গঠিত হয়। সামগ্রিকভাবে পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটির আলোচ্য পরিধির অন্তর্ভুক্ত ছিল—

১। বাংলা ব্যাকরণ, লিপি, বানান ইত্যাদি সহজীকরণ এবং প্রমিতকরণ।

২। বিদেশি শব্দের উপযুক্ত বাংলা পরিভাষা নির্মাণ।

৩। বাংলা ভাষাকে একদিকে পাকিস্তান, অন্যদিকে বাঙালির (বিশেষত পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের) সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা।

৬.৩.১ ভাষা কমিটির লিপি-সংস্কার প্রস্তাব

বাংলা লিপি পরিবর্তন সংক্রান্ত উপ-সমিতির প্রস্তাব ছিল, উর্দু অক্ষরে (অর্থাৎ, ফারসি ও উর্দু অক্ষর সংযোজিত আরবি লিপিতে) বাংলা লিখতে হবে। ভাষা কমিটি অবশ্য এই সুপারিশ অনুমোদন করেনি। লিপি সংক্রান্ত প্রস্তাব বাতিল হলেও উপ-সমিতির ভাষা সংস্কার সংক্রান্ত সুপারিশ বরং অনুমোদন পায়। সাধুভাষার পাশাপাশি চলিত ভাষাকে স্বীকৃতি, সংস্কৃত প্রভাব এড়ানো, ভাষায় ইসলামি আদর্শকে গুরুত্বপ্রদান ইত্যাদি নিয়মকানুন মেনে কীভাবে বাংলা লিখতে হবে তার দৃষ্টান্ত ভাষা কমিটির প্রতিবেদনে (*Report of the East Bengal Language Committee, 1949* 103) পাওয়া যায়—

মূল বাক্য

১। আমি তোমায় জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না।

২। হিল্লোলিত সমীরে তরঙ্গিনী আন্দোলিত হইতে লাগিল।

ভাষা কমিটির পরামর্শ-মাফিক পরিবর্তিত বাক্য

১। আমি তোমায় কেয়ামতের দিন পর্যন্ত ভুলিব না।

২। লীলুয়া (য.) বাতাসে নদী নাচিতে লাগিল।

বানানের আলোচনাতেও উল্লিখিত বাক্যদ্বয় মনোযোগ দাবি করে, কারণ একই বি-সংস্কৃতায়নের প্রবণতা ভাষা কমিটির বানান-চেতনাতেও প্রতিফলিত —

> The present spellings of our language are obsessed with the idea of spellings of Sanskrit words. This means that only about 30 per cent. of the words of Tatsama origin are ruling over the spelling of the rest of words of Tatbhava, indigenous and foreign origin. (*Report of the East Bengal Language Committee, 1949* 42)

৭ ডিসেম্বর, ১৯৫০ ভাষা কমিটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন পূর্ব বাংলা সরকারের শিক্ষা দফতরের সচিবের কাছে প্রেরিত হয়। বাংলা হরফ পরিবর্তনের বিপক্ষে মত প্রকাশ করায় সরকার এই প্রতিবেদন ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশ করেনি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পরে বাংলার লিপি পরিবর্তন একেবারে অসম্ভব ছিল। তাই পাকিস্তান সরকারের মুখ রক্ষার্থে প্রায় ৮ বছর পরে ভাষা কমিটির সুপারিশগুলি প্রকাশ্যে আসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটির প্রস্তাবগুলির মূল্যায়ন করতে গিয়ে জানিয়েছেন—

> ‘পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি’তে নানা মতের লোক থাকলেও সেদিনের প্রেক্ষাপটে তাঁরা শেষ পর্যন্ত যে সুপারিশ সরকারের কাছে পেশ করেছিলেন, সেখানে ইতি-নেতি দুই ধারাই বর্তমান। তাঁরা যে আরবি বা উর্দু হরফ প্রবর্তনের সুপারিশ করেননি, এটি অবশ্যই আজ ইতিবাচক সিদ্ধান্ত বলে মেনে নিতে হয়। আবার বর্ণমালা সহজীকরণের নামে তাঁদের কিছু সিদ্ধান্ত নেতিবাচক মানসিকতার দৃষ্টান্ত হিসেবেই উল্লেখ করতে হয়। (ঘোষ)

৬.৩.২ ভাষা কমিটির ‘শহজ বাংলা’ প্রস্তাব

ভাষা কমিটির লিপিগত প্রস্তাব সম্পর্কে এতক্ষণ সবিস্তারে আলোচনা করা হল। বানান বিষয়ে তাঁদের সুপারিশ ছিল, সাধারণ জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচলনের উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষার সরলীকৃত একটি রূপ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পাবে। এর নাম ‘শহজ বাংলা’ (Shahaj-Bangla)। এই ‘শহজ বাংলা’-র নিয়মকানুন সংক্ষেপে নিম্নরূপ —

১। প্রচলিত ৬টি বাংলা স্বরবর্ণ স্বীকৃতি পেয়েছে: অ, আ, ই, উ, এ, ও। এদের সঙ্গে নতুন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্বরবর্ণ: অ্যা। মোট স্বরবর্ণের সংখ্যা ৭।

২। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্বরবর্ণগুলির কার-চিহ্ন অক্ষরের ডানদিকে বসাতে হবে। অ, আ, উ, অ্যা স্বরবর্ণের কার-চিহ্ন প্রচলন অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছে। অ-এর জন্য কোনো কার-চিহ্ন নেই (যেমন: ম=ম্+অ)। আ, উ এবং অ্যা বোঝানো হবে যথাক্রমে া, ু এবং 'য-ফলা আ-কার' চিহ্ন দ্বারা। মূল পরিবর্তন দেখা গেল বাকি তিনটি স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে। ই-এর কার-চিহ্ন হল ী। অর্থাৎ, 'শহজ বাংলা' মতে, দ্+ই= দী, ব্+ ই= বী। এ স্বরবর্ণের চিহ্ন ১। যেমন: ক্+ এ= ক১, দ্+এ+শ্+অ= দ১শ। ও স্বরবর্ণের চিহ্ন হল ৌ। ব্+ ও+ ন্+ অ= বৌন, ল্+ ও+ ক্+ অ= লৌক।

৩। ব্যঞ্জনবর্ণের রয়েছে ৩১টি —

ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ত থ দ ধ প ফ ব ভ ন ম শ ছ র ড় য় ল হ ং ঁ।

যুক্তাক্ষর গঠনের সময় কিছু বাংলা অক্ষরের গঠন পালটে যায়। 'শহজ বাংলা' পদ্ধতিতে এই পরিবর্তন অনুমোদিত নয়। ফলে পরিবর্তন রোধ করার জন্য হস্-চিহ্ন ব্যবহার করে যুক্তাক্ষর বিশ্লেষণ করে লিখতে হবে।

৪। উচ্চারণের সঙ্গে বানানের সংগতি রাখার জন্য সমস্ত ধরনের ফলা (য্, র্, ণ্, ম্, ল্ ইত্যাদি) বর্জন করতে হবে।

৫। উচ্চারণভিত্তিক বানানের মূল সমস্যা কোন্ জায়গার উচ্চারণ অনুযায়ী বানান হবে? এক্ষেত্রে ভাষা কমিটির প্রস্তাব, প্রমিত উচ্চারণ ('pronunciation of the elite') অনুযায়ী বানান হবে।

'শহজ বাংলা' পদ্ধতিতে লিখিত বানানের নমুনা —

"আমরা বীশ্শাস করী জ১ দুনীয়ার শকল জবান হইত১ আমাদ১র 'শহজ বাংলা' ব১শী বীগ্গাঁন শমমত হইব১। খাঁকা খুকী জুবক জুবতী ব্রীদ্ধ ব্রীদ্ধা ক১হ কৌন শময়১ই বানান ভুল করীব১ না।"

'শহজ বাংলা' প্রকল্প জনসাধারণ প্রত্যাখ্যান করেছিল। বাংলা ভাষাকে তার ঐতিহ্যগত চরিত্র থেকে বিচ্যুত করে সংস্কার-সাধন করা সম্ভব নয়। বিশেষত, এই প্রকল্প যত না ভাষাতত্ত্বের যুক্তির ওপর স্থাপিত ছিল, তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল। ১৯৫২ সালের আগে বাংলার আরবিকরণের যে উদ্যোগ সম্পর্কে ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, তারই মৃদু সংস্করণ বলা যেতে পারে 'শহজ বাংলা'-কে। সরাসরি বাংলা ভাষার বিরোধিতা না করলেও, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পূর্ব এবং পশ্চিম বঙ্গের ভাষার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য প্রভেদ তৈরি হত।

৬.৪ বাংলা একাডেমির বানান-প্রস্তাব (১৯৬৩ খ্রি.)

'শহজ বাংলা' প্রকল্পের ব্যর্থতার পর সমতুল্য আরেকটি উদ্যোগ ১৯৬৩ সালে নজরে পড়ে। ঢাকার বাংলা একাডেমি বাংলা বানান ও লিপি সংক্রান্ত একটি উপসংঘ নির্মাণ করেন। সভাপতির পদে ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী প্রমুখ। বাংলা

একাডেমির উপসংঘ বানান বিষয়ক যে-সব প্রস্তাব পেশ করলেন, সেগুলি 'শহজ বাংলা' দ্বারা অনুপ্রাণিত। তবে আগের মতো ততটা বৈপ্লবিক বা ঐতিহ্য-বিরোধী নয়। কিছু নির্বাচিত প্রস্তাব ছিল এইরকম (শরীফ ৩০-৩১)—

১। বর্ণমালা থেকে ঙ এবং ণ বাদ যাবে। পরিবর্তে, শব্দের উৎস নির্বিশেষে যথাক্রমে ং এবং ন ব্যবহার করতে হবে।

২। ই/ঈ এবং উ/ঊ -এর মধ্যে হ্রস্ব স্বরধনি সাধারণত ব্যবহৃত হবে। কেবল বিদেশি শব্দ লিপ্যন্তর এবং প্রচলিত বানানে বিকল্প হিসাবে দীর্ঘ স্বরধ্বনি ব্যবহার করা যাবে।

৩। ঋ, ঌ, ঐ, ঔ, ঞ, ৎ — এগুলিও বর্ণমালা থেকে বাদ যাবে। ঞ-সমন্বিত যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে প্রথম অক্ষরটি ন লিখতে হবে। যেমন: বাঞ্ছা = বান্‌ছা, গঞ্জ = গন্‌জ ইত্যাদি।

৪। বর্ণমালা থেকে বিসর্গ বাদ যাবে। শব্দমধ্যের বিসর্গর বদলে ব্যঞ্জনদ্বিত্ব ব্যবহার করা হবে (দুঃখ= দুখ্‌খ), শব্দান্তে বিসর্গ থাকলে তার স্থানে হ্‌ ব্যবহৃত হবে (আঃ= আহ্‌)[৬]।

৫। যুক্তাক্ষর গঠনের সময় কোনো ব্যঞ্জনের আকৃতি পালটাবে না। ব্যতিক্রম: জ্ঞ, ক্ষ। শু, রু, রূ, হৃ ইত্যাদি লেখার সময়েও স্বরবর্ণ স্বচ্ছ আকৃতিতে লিখতে হবে।

৬। দ্বিত্বের জন্য ব-ফলা, ম-ফলা ব্যবহৃত হবে না। অন্য যুক্তবর্ণগুলিও হস্‌-চিহ্ন ব্যবহার করে বিশ্লিষ্টরূপে লিখতে হবে।

৬.৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির ভিন্নমত (১৯৬৮ খ্রি.)

পূর্বোক্ত বানান সংস্কারের সমতুল্য অভিমত প্রকাশ করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল অনুমোদিত বাংলা ভাষা সংস্কার ও সরলীকরণ কমিটি। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে এই কমিটি গঠিত হয়। প্রায় ১১ মাস পরে (ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮) কমিটি শিক্ষা পর্ষদের কাছে তাঁদের প্রস্তাবসমূহ পেশ করেছিলেন। লিখিতভাবে এই কমিটির প্রস্তাবসমূহের বিরোধিতা করেন মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই এবং মুনীর চৌধুরী। তাঁদের যুক্তি ছিল নিম্নরূপ —

[৬] আহমদ শরীফ উল্লেখ করেননি, এই প্রস্তাবে একাধিক ধ্বনিতাত্ত্বিক সমস্যা তৈরি হয়। শব্দমধ্যে বিসর্গর উচ্চারণ পরপর দুটি মহাপ্রাণ ধ্বনি দিয়ে বোঝানো হবে কেন? 'দুক্‌খ' উচ্চারণ জিহ্বার পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক। সমাসবদ্ধ শব্দের কথাও আলাদাভাবে উল্লেখ করা দরকার। যেমন: 'প্রাতঃকাল' শব্দে বিসর্গর উচ্চারণ হ্‌।

১। বর্ণমালা থেকে ঙ বাদ গেলে ং-এর সঙ্গে স্বরচিহ্ন যোগ করতে হবে। যেমন: বাংালি, আংুল ইত্যাদি। ণ বাদ গেলে কিছু সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দের মধ্যে পার্থক্য থাকবে না। যেমন: বাণ/বান, অণু/অনু ইত্যাদি।

২। বর্ণমালাতে যদি ঈ, ঊ না-থাকে, তাহলে বিদেশি শব্দ লিপ্যন্তরের সময় ঈ, ঊ ব্যবহারের নির্দেশ স্ববিরোধী। এছাড়া দীর্ঘ স্বর বর্জন করলে সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দের ক্ষেত্রেও (কুল/কূল, দিন/দীন ইত্যাদি) বিভ্রান্তি দেখা যাবে।

৩। ৯ দীর্ঘদিন বাংলা ভাষায় বর্জিত। তাকে নতুন করে বর্জনের প্রয়োজন নেই। ঋ সম্পর্কে উক্ত ত্রয়ী প্রতিবাদকারীর বক্তব্য —

> ঋতু ও ঋষি লইয়াও বিভ্রাট সুনিশ্চিত; হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাও বাধিয়া যাইতে পারে। ঋ-কারের ব্যবহারের তো কোন অন্তই নাই। কৃপণ-এর কৃ-কে উদার হইয়া 'ক্রী' বা 'ক্রি' ধারণে দরাজ-দিল্ হইতে উপদেশ দিলেও লাইনো, টেলিপ্রিণ্টার ও টাইপ-রাইটার যন্ত্র শুনিতে চাহিবে না, এমন নয়; কৃপণ-বেচারার 'হ্রিদযন-তরের' 'ক্রীয়া' 'বন্ধ' হইয়া 'অপম্রিতত্ব' (অপমৃত্যু) ঘটিতে পারে। (শরীফ ৫৬)

ঞ বাদ দেওয়ার প্রস্তাবও মুহম্মদ এনামুল হকরা সমর্থন করছেন না। তাঁদের মতে, ঞ বাদ গেলে চ-বর্গ থেকে তালব্য নাসিক্যধ্বনি বাদ পড়ে যাবে। ৎ বাদ দেওয়ার প্রস্তাব অবশ্য তাঁরা সমর্থন করছেন।

৪। ঐ এবং ঔ যে উচ্চারণকে প্রকাশ করে, অই এবং অউ দ্বারা তা সম্ভব নয়।

৫। বাংলা লিপি সরলীকরণেরও কোনো আশু প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করেননি।

এই ভিন্নমত তিনজন মাত্র ব্যক্তির নামে প্রচারিত হলেও একে নিছক ব্যক্তিগত অভিমত বলে উপেক্ষা করা যায় না। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের আগে বাংলা বানান ও লিপি সংস্কারের যে-সব প্রয়াস লক্ষ করা যায়, তাদের প্রত্যেকটিই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। প্রত্যেকটি প্রস্তাবেরই মূলগত সমস্যা ছিল — ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুতি। উপরে আলোচিত ভিন্নমত সেই সমস্যাটিকে স্পষ্ট করে তোলে। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের পর অবশ্য বিষয়টি আরেক ধাপ জটিল হয়ে উঠল। নতুন রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের কিছু প্রায়োগিক সমস্যা দেখা দিল। অফিস-আদালত, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে কোন্ ধরনের বাংলা লেখা হবে? তার বানান কেমন হবে? শিক্ষাক্ষেত্রেই বা কোন্ বানান ও লিপি মান্যতা পাবে? এইসব সমস্যার সমাধান একটি নবগঠিত রাষ্ট্র কীভাবে খুঁজে নিল, তা পরবর্তী অংশে আলচিত হবে।

৬.৬ স্বাধীন বাংলাদেশে ভাষা-পরিকল্পনা

১৯৭১ সালের আগে পর্যন্ত যা ছিল ধর্মীয় প্রবণতায় জারিত বিক্ষিপ্ত উদ্যোগ, স্বাধীন বাংলাদেশে বানান ও লিপি সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রথমেই তা ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তির ওপর স্থাপিত হল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা ("গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান | ৩। রাষ্ট্রভাষা")। আইন মোতাবেক রাষ্ট্রের যাবতীয় সরকারি তথা

প্রশাসনিক কাজকর্মে বাংলা ভাষার প্রয়োগ আবশ্যিক। স্বয়ং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রয়োগে জোর দেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩ সালে *দৈনিক বাংলা*-য় প্রকাশিত এক সংবাদ প্রতিবেদনে লেখা হচ্ছে—

> জানা গেছে বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, অফিসের নথি ও অন্যান্য কাগজপত্র বাংলায় না লেখা হলে তাঁর কাছে উপস্থাপন করা যাবে না। সুতরাং যাবতীয় সরকারি নথিপত্রাদি বাংলায় লেখার জন্য কেবিনেট ডিভিশন এক পরিপত্রে সকল মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানিয়েছেন। (আলম, *প্রসঙ্গ: ভাষা বানান শিক্ষা* ২৫)

১৯৭২ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত একাধিকবার সরকারি নির্দেশ জারি করে, রাষ্ট্রীয় কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহার প্রচলনের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এইসব সরকারি নির্দেশ মেনে চলার আগে তিনটি প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া জরুরি ছিল —

ক. সাধু নাকি চলিত — সরকারি কাজে কোন্ বাংলা ব্যবহার্য?

খ. প্রমিত বাংলা বানান হিসাবে কোন্ নির্দেশাবলি মেনে চলা হবে?

গ. হস্তাক্ষর এবং মুদ্রণের সুবিধার্থে বাংলা লিপির কোনো পরিবর্তন বা সরলীকরণ করা হবে কি?

এই তিনটি প্রশ্নের মীমাংসাই সরকারের এক্তিয়ার-বহির্ভূত। এগুলির সমাধান করতে হবে ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তির পথ মেনে। বস্তুত, ভাষা-পরিকল্পনার একদিকে যদি থাকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, অন্যদিকে থাকতে হবে ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তি। *Can Language be Planned?* নামক গ্রন্থে সুইডেনের ভাষাবিজ্ঞানী জেরনুড ভাষা-পরিকল্পনায় ভাষাতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রের উভমুখী সম্পর্কের কথা জানিয়েছেন —

> The broadest authorization for planning is obtained from the politicians. A body of experts is then specifically delegated the task of preparing a plan... The logic of language planning is dictated by the recognition of language as a societal resource. The importance of this resource is due to the communicational and identific values attached by the community to one or more languages. (Jernudd and Gupta 1971, 186–87)

মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানী এইনার হাউগেনের গবেষণায় (Haugen 270) ভাষা-পরিকল্পনার আরেকটু বিস্তারিত চিত্র পাওয়া যায় —

	রূপ (নীতি পরিকল্পনা)[৭]	ভাষা পরিকর্ষণ
সমাজ	নির্বাচন	প্রয়োগ
ভাষা	কোড-নির্মাণ (প্রমিতকরণ)	কোড-প্রসারণ

[৭] মূল গবেষণাপত্রের norm এবং function শব্দের বাংলা হিসাবে এখানে যথাক্রমে 'রূপ (নীতি পরিকল্পনা)' এবং 'ভাষা পরিকর্ষণ' ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলা পরিভাষাগুলি (নাথ ২৭৮) থেকে গৃহীত।

উপরের ছকের তত্ত্ব অনুযায়ী, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে নির্বাচন এবং প্রশাসনিক স্তরে প্রয়োগ ১৯৭১ সালের পর থেকে শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখনও বাকি ছিল ভাষা প্রমিতকরণ (বানান, লিপি, ব্যাকরণ ইত্যাদি স্তরে) এবং প্রমিতকরণের সীমানা প্রসারণের (পরিভাষা নির্মাণ, রীতিগত উন্নয়ন ইত্যাদি) কাজ। বাংলাদেশের ইতিহাসে অবশ্য প্রশাসনিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক উদ্যোগের সীমানা প্রায়শই মুছে যেতে দেখা যায়। বাংলাদেশে ১৯৭১-পরবর্তীকালে ভাষা-পরিকল্পনার ইতিহাস নীচে পেশ করা হল।

৬.৬.১ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন (১৯৭২ খ্রি.)

২৬ জুলাই, ১৯৭২ সালে গঠিত হয় কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং বিজ্ঞানী মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন। কমিশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন। ৩ মে, ১৯৭৪ কমিশন সরকারের কাছে শিক্ষা বিষয়ক সুপারিশপত্র পেশ করে। এই রিপোর্টের চতুর্থ অধ্যায়ে শিক্ষার্থীদের বাংলা বানান-বোধ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আক্ষেপ প্রদর্শিত হয়েছে —

> The foundation of language teaching is laid at the school level but the method of teaching languages, specially Bengali, in our classes, is highly defective and unscientific. As a result the pupils show lamentable ignorance in matters of pronunciation, spelling and syntax. (Md. Qudrat-e-Khuda 13)

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন বাস্তবায়নে কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছিল। বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ) ওয়েবসাইট থেকে জানা যায় —

> এই কমিশনের সুপারিশের আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম এবং সিলেবাস প্রণয়নের জন্য দেশের ৪৭ জন সুনামধন্য শিক্ষাবিদকে নিয়ে প্রফেসর সামছুল হুদা কে প্রধান করে ১৯৭৬ সালে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি ১৯৭৬, ১৯৭৭ এবং ১৯৮৮ সালে মোট ৭টি ভলিউমে রির্পোট সরকারের নিকট দাখিল করে। ("মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ-শিক্ষা মন্ত্রণালয়")

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি ৭টি খণ্ডে ধাপে ধাপে তাদের প্রতিবেদন পেশ করে। প্রথম খণ্ড পেশ করা হয় ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে। এই কমিটি সুপারিশ করেছিল, পাঠ্যপুস্তকে চলিত বাংলা ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে এক শব্দের এক বানান লিখতে হবে। যে-সকল শব্দের একাধিক বানান ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ, সেখানে অধিকতর প্রচলিত বানান পাঠ্যপুস্তকে স্থান পাবে। সুনির্দিষ্ট বানান-বিধি প্রণয়নের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি একটি আলাদা বানান-কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন। যতদিন না সুনির্দিষ্ট বানান-বিধি তৈরি হচ্ছে, ততদিন চারটি অভিধান অনুসরণের সুপারিশ করেন —

১। ড. মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত *বাংলাদেশের ব্যবহারিক অভিধান*

২। কাজী আবদুল ওদুদের *ব্যবহারিক শব্দকোষ*

৩। রাজশেখর বসুর *চলন্তিকা*

৪। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*

সুপারিশকৃত অভিধানগুলির মধ্যেও বানান-বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। ফলে বানান-বিষয়ক ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত কমিটি কিছু সচেতনতা দেখালেও সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান তখনও পর্যন্ত হয়নি।

৬.৬.২ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (১৯৮৩ খ্রি.)

বাংলাদেশে আটের দশকে বরং বানান সমতাবিধানের কিছু সদর্থক উদ্যোগ নজরে পড়ে। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান এবং 'বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড' সম্মিলিত হয়ে ১৯৮৩ সালে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' নামে আত্মপ্রকাশ করে ("জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)")। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বোর্ডের গুরুত্ব সমধিক —

> পাঠ্যপুস্তক বোর্ড দেশের সর্ববৃহৎ প্রকাশনা সংস্থা। বোর্ড ২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বই ছাড়া কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য সর্বমোট ২১ কোটি বই ছাপার পরিকল্পনা নিয়েছে। সরকার ২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী স্তরের মতো মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ৮ কোটি ৮৭ লক্ষ বইও বিনামূল্যে দেশের সকল শিক্ষার্থীর কাছে বিতরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। (আলম, "জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড")

এই পরিসরে সমগ্র দেশের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের কাজ যথাযথভাবে করতে হলে বানান বিষয়ে সুষ্ঠু নীতি আগে প্রণয়ন করা আবশ্যক। বোর্ডের বিশেষজ্ঞ কমিটি ১৯৮৪ সালে পাঠ্যপুস্তকে অনুসৃতব্য বানান বিষয়ক ২৫টি নীতি সুপারিশ করেন। বোর্ডের বানান প্রবণতা বুঝে নেওয়ার জন্য নীচে নির্বাচিত কিছু নীতি উল্লেখ করা হল (আলম, *প্রসঙ্গ: ভাষা বানান শিক্ষা* ৫৯, ৬৭-৬৯)—

১। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশ করা চারটি অভিধানের সঙ্গে বোর্ড নতুন একটি অভিধান সংযুক্ত করল। সেটি হল — *পারসো আরাবিক এলিমেন্টস ইন বেঙ্গলি* (ড. গোলাম মকসুদ হিলালী সংকলিত)। উপর্যুক্ত পাঁচটি অভিধানের প্রথম শব্দভুক্তি পাঠ্যপুস্তকে গ্রহণ করা হবে।

২। পাঠ্যপুস্তকে যুক্তাক্ষরের স্বচ্ছ রূপ ব্যবহার করতে হবে। যেমন: ক্ক, ঙ্গা, ঞ্ছ, ন্ধ ইত্যাদি। তবে ট্র, ক্ষ, জ্ঞ, ভ্র ইত্যাদি কয়েকটি যুক্তাক্ষর অপরিবর্তিত থাকবে।

৩। অতৎসম শব্দে ণত্ব ও ষত্ব বিধান পালন করা হবে না।

৪। ভাষা ও জাতির নামের শেষে ই-কার হবে। যেমন: বাঙালি, ইংরেজি, জাপানি। কিন্তু স্ত্রী-প্রত্যয় হিসাবে -ঈ ব্যবহৃত হবে। যেমন: মুরগী, গাভী, বিড়ালী।

৫। রেফের পর দ্বিত্ব বর্জনীয়।

৬। ক্রিয়াপদের বানানে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার পার্থক্য বজায় রাখতে হবে। যেমন: তুমি দেখ (বর্তমান অনুজ্ঞা), তুমি দেখো (ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা)।

৬.৬.৩ কুমিল্লা কর্মশিবির (১৯৮৮ খ্রি.)

'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড'-এর এই সুপারিশপত্রের আট বছর পর বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হবে প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম। কিছু ব্যাকরণগত আপত্তির জায়গা থাকলেও এই বানান-নীতিকে যুগের নিরিখে অগ্রগামী বলা যায়। কিন্তু তত্ত্ব হিসাবে যা প্রশংসনীয়, বাস্তবে তা প্রয়োগে প্রযুক্তিগত সমস্যা ছিল। বোর্ডের সুপারিশ-মাফিক প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির বই স্বচ্ছ যুক্তাক্ষর সমন্বিত বাংলা হরফে ছাপাতে কোনো সমস্যা হয়নি। চতুর্থ শ্রেণির বই ছাপার ক্ষেত্রে স্বচ্ছ টাইপফেসের অভাব রয়েছে বলে মুদ্রণকর্মীরা জানান। শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়, প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির বইতে স্বচ্ছ যুক্তাক্ষর স্থান পেলেও চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণির বই প্রথাগত হরফেই মুদ্রিত হবে। পশ্চিমবঙ্গের আনন্দ পাবলিশার্স গত শতাব্দীর সাত এবং আটের দশকে স্বচ্ছ যুক্তাক্ষর ব্যবহারে উৎসাহী ছিল। বানান গবেষকদের একাংশের ধারণা, তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তক বোর্ডও স্বচ্ছ যুক্তাক্ষরের পক্ষে ঝুঁকেছিল। অধ্যাপক স্বরোচিষ সরকার জানাচ্ছেন —

> মনে হয়, বাংলা একাডেমির মতো আরেকটি স্ববিরোধী প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গের আনন্দ পাবলিশার্স । উনিশশো সত্তর ও আশির দশকে এই প্রতিষ্ঠানের 'দেশ' পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে স্বচ্ছ বর্ণ জনপ্রিয় করে। অনেকের ধারণা, ১৯৮৮ সালে এদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তক বর্ণস্বচ্ছতার দিকে ঝুঁকেছিলো। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, একুশ শতকে এসে সেই আনন্দ পাবলিশার্স আবার অস্বচ্ছ বর্ণে ফিরে যায়। (সরকার, স্বরোচিষ, *অকারণ ব্যাকরণ: ভাষা নিয়ে সরস কথা* ৩৪)

২৫ দফা সুপারিশপত্র প্রকাশের চার বছর পর, ১৯৮৮ সালের ২১-২৩ অক্টোবর কুমিল্লায় তিনদিন-ব্যাপী এক কর্মশিবিরের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক, অধ্যাপক, বাংলা একাডেমি, বাংলাভাষা বাস্তবায়ন কোষ ইত্যাদির প্রতিনিধিবৃন্দ, সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ এই কর্মশিবিরে যোগ দেন। মূল আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল পাঠ্যপুস্তকের বানানের সমতাবিধান, বাংলা লিপির স্বচ্ছ রূপ প্রচলন, বিদেশি শব্দ লিপ্যন্তরের নিয়ম ইত্যাদি। ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক বানান-সংস্কারের উদ্যোগের পর বানান বিষয়ে এই প্রথম এত বৃহৎ ও সামূহিক উদ্যোগ লক্ষ করা গেল। আর বাংলাদেশে ভাষা-পরিকল্পনার ইতিহাসে কুমিল্লার কর্মশিবিরকে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বলা যেতে পারে। এই কর্মশিবিরে বানান বিষয়ক ২৪টি সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছিল। তাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত কিছু বানান-নীতি নীচে উল্লেখ করা হল (আলম, *প্রসঙ্গ: ভাষা বানান শিক্ষা* ৭৩-৭৬)—

১। রেফের পর ব্যঞ্জনদ্বিত্ব বর্জনীয়।

২। ম্-এর সঙ্গে ক-বর্গের ধ্বনির সন্ধি হলে ং লিখতে হবে। যেমন: ভয়ংকর, সংগীত, অলংকার।

৩। অতৎসম ও বিদেশি শব্দের বানানে হ্রস্ব স্বর ব্যবহৃত হবে। যেমন: পাখি, বাড়ি, এমপ্লয়ি, ডিপ ইত্যাদি। ভাষা ও জাতির নামেও হ্রস্ব-ই ব্যবহৃত হবে। যেমন: জাপানি, ফরাসি, বাঙালি।

৫। নির্দেশক ভাবের ক্রিয়াপদের বানানে ও-বিভক্তি ব্যবহার করা হবে না। যেমন: করব, হল, বলব। কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ফারাক বজায় রাখতে ও-কার ব্যবহার্য। যেমন: করো এবং কোরো।

৬। উ-কার এবং ঊ-কারের একাধিক রূপের বদলে কেবল স্বচ্ছ রূপ ব্যবহার করতে হবে।

৭। নঞর্থক শব্দ আলাদাভাবে বসবে। যেমন: হয় না, বলি নি, দেখি নাই তারে।

৬.৬.৪ বাংলা একাডেমি এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (১৯৯২-২০১২)

কুমিল্লা কর্মশিবিরের সুপারিশপত্রের উপর ভিত্তি করে ১৯৯২ সালে ড. আনিসুজ্জামান সম্পাদিত 'পাঠ্য বইয়ের বানান' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। একই বছর ঢাকার বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয় 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম'। উভয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য ছিল লিপিগত। 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' যুক্তাক্ষরের স্বচ্ছ রূপ প্রচলনের পক্ষপাতী, অন্যদিকে একাডেমি অস্বচ্ছ যুক্তাক্ষরকেও স্বীকৃতি দিয়েছিল। ড. মোহাম্মদ আমীনের ব্লগ থেকে জানা যায় —

> অন্যদিকে, ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমি 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকা প্রকা(শ) করে। একাডেমির এই পুস্তিকায় এনসিটিবির কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কিছু বর্জন ও কিছু নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অধিকন্তু, একাডেমি কারচিহ্ন ও যুক্তবর্ণের স্পষ্টরূপ ব্যবহারের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে অভিধানে প্রচলিত 'অস্পষ্ট' রূপ চালু রাখে। ফলে এনসিটিবি ও বাংলা একাডেমির বানানবিধি পড়ে যায় সংঘর্ষের কবলে। (আমীন)

হরফ ব্যতিরেকে বানানের দিক থেকেও উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। ড. আব্দুর রহিমের গবেষণাগ্রন্থ (রহিম ৮৯-৯১) অবলম্বনে কয়েকটি পার্থক্যের কথা নীচে উল্লেখ করা হল —

১। /æ/ ধ্বনি বোঝানোর জন্য পাঠ্যপুস্তক বোর্ড শব্দের শুরুতে 'এ' ব্যবহারের পক্ষপাতী। যেমন: এসিড। বাংলা একাডেমি /æ/ ধ্বনি বোঝাতে 'অ্যা' লেখার পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন: অ্যাসিড।

২। পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের খ্রিস্ট, খ্রিস্টান ইত্যাদি বানান একাডেমির (১৯৯২) স্বীকৃতি পায়নি। এগুলিকে বাংলায় আত্তীকৃত শব্দ ধরে নিয়ে একাডেমি খ্রিষ্ট, খ্রিষ্টান ইত্যাদি বানানের পক্ষপাতী।

৩। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত শব্দে যোয়াদ এবং যালের জন্য য ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। উদা: আযান, ওযু, নামায ইত্যাদি। একাডেমি এইসব শব্দে বিকল্পে জ ব্যবহারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

২০০০ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর বাংলা একাডেমি 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকা সংশোধিত আকারে প্রকাশিত হয়। এখানেও যুক্তাক্ষরের অস্পষ্ট রূপ স্বীকৃতি পায়। ফলে পাঠ্যপুস্তকের বানানের সঙ্গে একাডেমির বানানের সমতাবিধান ঘটে না। ২০০৫ সালে 'পাঠ্য বইয়ের বানান' গ্রন্থের পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এখানে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' পূর্বের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে যুক্তাক্ষরের অস্বচ্ছ রূপকে পুনরায় পাঠ্য বইয়ে স্বীকৃতি দেয়। ফলে এখন আর একাডেমি আর বোর্ডের বানানের সেইভাবে কোনো বিশেষ পার্থক্য রইল না। পরবর্তীকালে, 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' সরকারি নির্দেশমাফিক বাংলা একাডেমির বানান-বিধি মোতাবেক পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে সম্মত হয়। 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' গ্রন্থের পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০১২ খ্রিস্টাব্দে। এই সংস্করণের মুখবন্ধে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান লিখেছেন —

> সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যপুস্তকে এবং সরকারি বিভিন্ন কাজে বাংলা একাডেমি প্রণীত বানানরীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে

‘বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম’ পর্যালোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় পরিমার্জনার পর পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

... সভাসমূহে ‘বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম’ শীর্ষক পুস্তিকা ছাড়াও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত বাংলা বানানের নিয়ম বিস্তারিত আলোচনার পর ‘বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম’-এর পরিমার্জিত সংস্করণ চূড়ান্ত করা হয়। (*বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* ৫)

বাংলা একাডেমির বানান-বিধি এখনও পরিমার্জনের অবকাশ রয়েছে। তবে সরকারি আনুকূল্য পাওয়ায় একাডেমির মান্যতা এখন অনেক বেশি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এবং সাহিত্য সংসদের বানান-বিধির সাপেক্ষেও ঢাকার বাংলা একাডেমির বানান-বিধির বিশেষ কোনো ফারাক নেই। বোধগম্যতার সুবিধার্থে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের বানান-সংস্কারের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য মাইলফলকগুলি একঝলকে দেখানো হল—

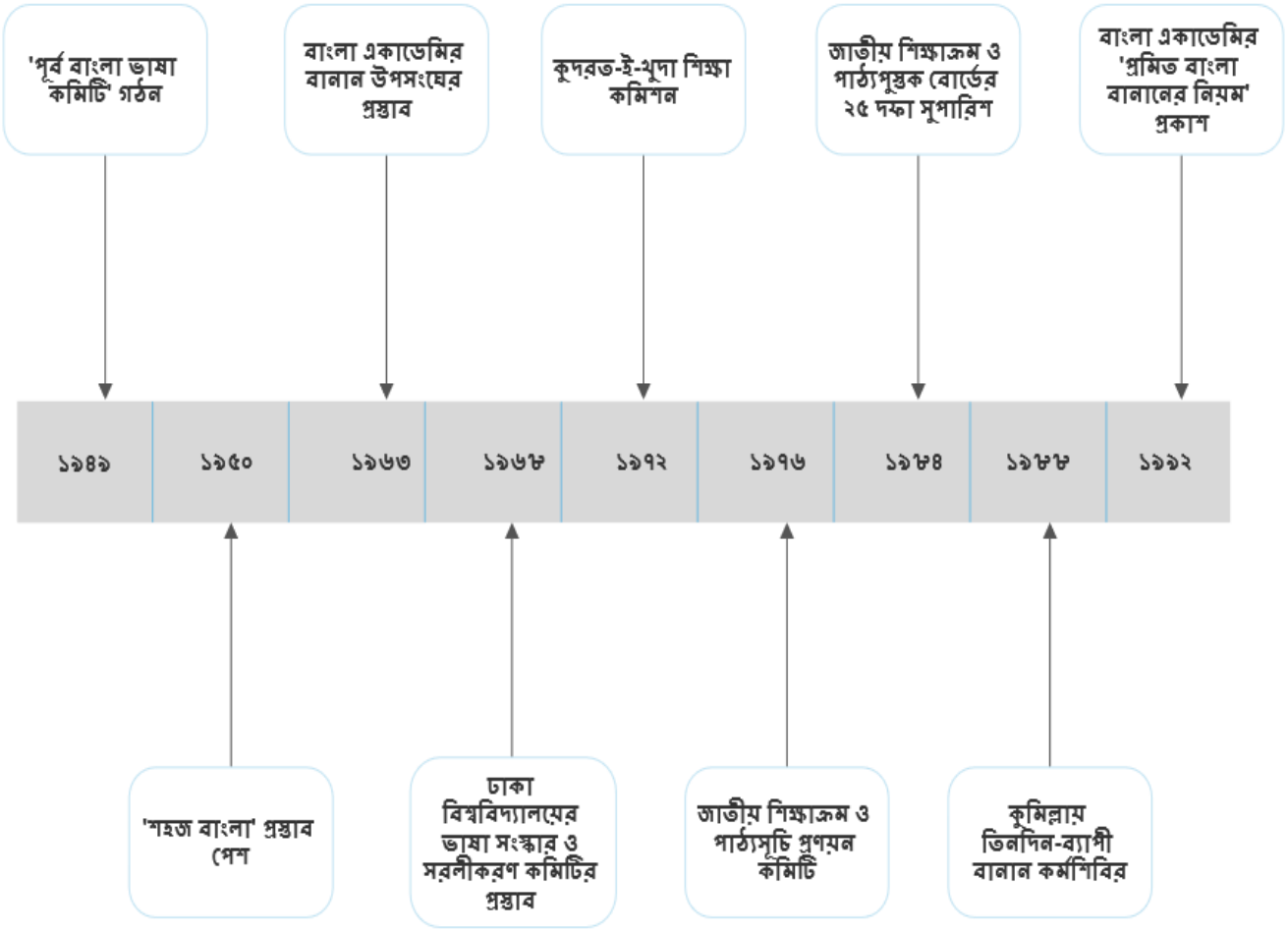

রেখাচিত্র ৬.১: বাংলাদেশে বানান-সংস্কারের সময়রেখা

৬.৭ বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বানানচর্চা

প্রমিত বানান মানে সর্বদা যুক্তিসংগত বানান নয়। এতদবধি আলোচনা থেকে মনে হতে পারে, বাংলাদেশে বানান-পরিস্থিতি বর্তমানে প্রায় বিতর্কহীন স্থিতিশীল অবস্থায় উপনীত। ঢাকার বাংলা একাডেমির বিধি সর্বজনমান্য। বিশেষত, 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' একাডেমির বানান-বিধিকে মেনে নেওয়ায় একাডেমির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। তবু একাডেমির বানান-বিধির যুক্তিগত ভিত্তি নিরঙ্কুশ নয়। বর্তমানে বাংলাদেশের বানান-চর্চা একাডেমিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। সাম্প্রতিক বানান-চর্চার ধারায় দুটি প্রবণতা লক্ষণীয়—

ক. একদল লেখক একাডেমিকে সমর্থন করে বানান-বিষয়ক বই লিখছেন। এই ধরনের বইয়ের সংখ্যাই বেশি। কিছু বইতে একাডেমির বানান-বিধির সরলীকৃত রূপ পেশ করা হচ্ছে সাধারণের বোধগম্য ভাষায়। সঙ্গে নমুনা হিসাবে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে সংক্ষিপ্ত বানান অভিধান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গল্পের ছলে, অল্পবিস্তর ব্যাকরণগত যুক্তি দিয়ে একাডেমির বানান-বিধির যাথার্থ্য ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

খ. বিরল কিছু বই এখনও লেখা হচ্ছে, যেখানে একাডেমির বাইরে বানান-বিষয়ক মৌলিক চিন্তাভাবনার ছাপ রয়েছে। কখনও বেসরকারি উদ্যোগে বানান-বিধি নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে। কখনও বা একাডেমির

'প্রমিত' বাংলার সংজ্ঞাটিকেই যুক্তিসহ অস্বীকার করা হচ্ছে। সেখানে কলকাতার প্রভাবকে অস্বীকার করে বাংলাদেশের নিজস্ব বানান-বিধি গড়ে তোলায় জোর দেওয়া হচ্ছে।

বর্তমান নিবন্ধের পরবর্তী অংশে এই দুই প্রকার গ্রন্থ সম্পর্কেই সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। এতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বানান-চেতনার ঝলকদর্শন পাওয়া যাবে। প্রথাগত গ্রন্থের বাইরেও অধুনা ডিজিটাল মাধ্যমে বানান-চর্চা হয়ে থাকে। সব ক্ষেত্রে হয়তো প্রত্যাশামাফিক গভীরতা পাওয়া যায় না। তবু সামাজিক মাধ্যম এবং ব্লগ, ওয়েবজিন ইত্যাদি থেকেও বাংলাদেশের বানান-চর্চার কিছু নমুনা পেশ করা হবে।

৬.৭.১ বাংলা একাডেমি অনুসারী গ্রন্থসমূহ

একাডেমি-অনুসারী গোষ্ঠীর মধ্যে কয়েকটি বইয়ের উদাহরণ দেওয়া যাক। নাছিমউদ্দিন মালিথার *বাংলা বানান ও টুকিটাকি* গ্রন্থটির উদ্দিষ্ট পাঠক সাধারণ বাংলাভাষী মানুষ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধ্যায়ে ভাগ করে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা বানান সম্পর্কে লেখক আলোচনা করেছেন। লিপিকেও লেখক যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছেন। ইতোপূর্বে আমরা দেখিয়েছি, বাংলা একাডেমি এবং 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড'-এর বানান-বিধির প্রধান পার্থক্য ছিল লিপিগত — যুক্তাক্ষরের স্বচ্ছ নাকি অস্বচ্ছ রূপ নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল। সংগত কারণে নাছিমউদ্দিন মালিথা যুক্তাক্ষরের আকৃতি একাধিক অধ্যায়ে গুরুত্ব সহকারে ব্যাখ্যা করছেন। তাঁর পক্ষপাত স্বচ্ছ যুক্তাক্ষরের দিকে। তবে একাডেমি এবং বোর্ডের মতবিরোধ তাঁর নজর এড়িয়ে যায়নি —

> ঋ – এই বর্ণটি বাংলা একাডেমি মাত্রাহীন লিখেছে। ... কিন্তু পরে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বইয়ে অর্ধমাত্রা দিয়ে লেখা হয়েছে। এই বিভ্রান্তি থাকা ঠিক নয়। ঋ-বর্ণটি মাত্রাবিহীন লেখার ব্যাপারে ক্ষেত্র বিশেষে কম্পিউটারে সমস্যা রয়েছে। তাই বর্ণটি অর্ধমাত্রা দিয়ে লেখাই ভালো। (মালিথা ৬১)

কারচিহ্নযুক্তব্যঞ্জন এর আগের ও বর্তমান রূপ, যুক্তব্যঞ্জনের আগের ও বর্তমান রূপ, যুক্তব্যঞ্জনের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা ইত্যাদি অধ্যায়ে প্রথাগত লিপির পরিবর্তে স্বচ্ছ যুক্তাক্ষরের সঙ্গে লেখক পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। *শব্দের শুদ্ধ বানান* নামক প্রায় ৩৫ পৃষ্ঠার দীর্ঘ অধ্যায়টিকে সংক্ষিপ্ত বানান অভিধান বলা যেতে পারে। নির্বাচিত এবং বহুল-ব্যবহৃত কিছু শব্দের শুদ্ধ বানানের তালিকা এখানে পাওয়া যাবে। শুধু একটি দুর্বলতা লক্ষণীয়। বাংলা একাডেমির প্রতি নিষ্ঠ থাকতে গিয়ে বিকল্প বানানসমূহকে লেখক 'অশুদ্ধ' বলে চিহ্নিত করেছেন। 'ইন্দ্রীয়' বা 'বিদ্যান' নিঃসন্দেহে ভুল বানান। কিন্তু 'পাখী' বা 'বাড়ী'-কেও লেখক 'অশুদ্ধ' বলে চিহ্নিত করেছেন (মালিথা ৫৮)। প্রতিষ্ঠানপন্থীরা হামেশাই প্রতিষ্ঠান-অসমর্থিত শুদ্ধ বানানকে ব্যাকরণগতভাবে ভুল বলে থাকেন। নাছিমউদ্দিন মালিথার গ্রন্থও সেই ত্রুটি কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

দেলওয়ার হোসেন মন্ডলের *আধুনিক বাংলা বানান ও লেখার নিয়ম কানুন* গ্রন্থটি বরং পূর্বোক্ত গ্রন্থের তুলনায় অনেক কম নির্দেশমূলক। সম্ভবত সেই কারণেই অপ্রাতিষ্ঠানিক বানানের প্রতি সহনশীল। সমগ্র গ্রন্থটি ৬৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত। তার মধ্যে ১২টি (৫০-৬১ সংখ্যক) অধ্যায় বানান সম্পর্কিত। লেখকের মূল উদ্দেশ্য ছিল 'ভালো বাংলা' লেখার একটি নির্দেশিকা রচনা। প্রথম অধ্যায়ে তিনি জানাচ্ছেন —

> ভালো বাংলা লেখার প্রথম শর্ত নির্ভুল বাংলা লেখা। তার মানে আপনাকে প্রথমেই শিখতে হবে কীভাবে নির্ভুল বাংলা লেখা যায়। কী কী করতে হবে তার জন্যে? নির্ভুল বাংলা লেখার জন্যে বাক্য তৈরির সাধারণ নিয়মটা শিখে

নিতে হবে। বাক্যে কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম কোন নিয়মে বসে এবং কার পরে কে বসে তা শিখতে হবে। জেনে নিতে হবে বাক্যে শব্দ কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, কীভাবে শব্দের সঙ্গে বিভক্তির চিহ্ন যোগ করে তাদের বাক্যে ব্যবহারের উপযোগী করতে হয়। শব্দের শুদ্ধ বানান শিখে নেওয়াটাও খুবই জরুরি। আর তা ছাড়া দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, প্রশ্ন এইসব বিরাম চিহ্ন ঠিকভাবে ব্যবহার করতেও শিখতে হবে। (মন্ডল ১১)

বাংলা লেখার নির্দেশিকা হিসাবে বানানের প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু বানান লেখকের মূল আলোচ্য নয়। বরং বইয়ের বেশিরভাগ জুড়ে শুদ্ধ বাক্য লেখার কলাকৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ক্রিয়াপদ, লিঙ্গ, বচন, যতিচিহ্ন ইত্যাদি সম্পর্কেও প্রথাগত ব্যাকরণ অনুসরণে আলোচনা করা হয়েছে। নাছিমউদ্দিন মালিথা অপ্রাতিষ্ঠানিক বানানকে ভুল বলার যে অসহিষ্ণুতা দেখিয়েছিলেন, এই গ্রন্থ সেই বিষয়ে সংযমী —

কিন্তু কেউ যদি লেখে ইংরেজী, সঙ্কীর্ণ, পূব, দাবী, বেশী — তা হলে? এগুলো কি ভুল? না, এসব বানানকে ভুল বলা ঠিক হবে না। এগুলো আসলে পুরোনো বানান। ... আবার অনেক শব্দের দুটো করে শুদ্ধ বানান আছে। ... যেমন সূচি/ সূচী, অন্তরিক্ষ/ অন্তরীক্ষ, নাড়ি/ নাড়ী, তরি/ তরী, রচনাবলি/ রচনাবলী, পল্লি/ পল্লী, পেশি/ পেশী। আমরা এর মধ্যে কোনটা লিখব? (মন্ডল ১০৩)

বানান বিষয়ক নিয়মে লেখক বাংলা একাডেমির সাপেক্ষে বিশেষ নতুন কিছু সংযোজন করেননি। এই বইতেও শুদ্ধ বানানের প্রায় ২০ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণানুক্রমিক তালিকা সংযোজিত হয়েছে। সচরাচর ভুল হয়ে থাকে এই ধরনের কিছু শব্দের তালিকাও আলাদাভাবে দেওয়া হয়েছে (৬৭ সংখ্যক অধ্যায়)। উদ্দেশ/ উদ্দেশ্য, অর্ঘ/ অর্ঘ্য ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগে বিভ্রান্তি যাতে না ঘটে, লেখক সে বিষয়ে যত্ন নিয়েছেন। তবে বানান-চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন কোনো তত্ত্বের অবতারণা না করায় *আধুনিক বাংলা বানান ও লেখার নিয়ম কানুন* একাডেমি-অনুসারী গ্রন্থ হিসাবে সংখ্যাবৃদ্ধি করেছে মাত্র।

দিলীপ দেবনাথের *বাংলা বানান ও শব্দের জগৎ* গ্রন্থটি প্রকৃতিতে নাছিমউদ্দিন মালিথার *বাংলা বানান ও টুকিটাকি* গ্রন্থটির অনুরূপ। বাংলা ব্যাকরণ ও বানানের বিভিন্ন বিষয় লেখক মোট ১৫টি অধ্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। *লেখকের কথা* নামক অংশ থেকে বইয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যাচ্ছে —

... এটি কেবল বানানের বই নয়, নয় অভিধানও। বইটি দুইয়ের সংমিশ্রণ। ... বইয়ে অশুদ্ধ অথচ প্রচলিত বানানের তালিকাও রয়েছে। বেশ কিছু শব্দ কেন ভুল ও কোনটি শুদ্ধ আর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও এখানে পাওয়া যাবে — যা অন্য ব্যাকরণ বা শব্দার্থ অভিধানে নেই। (দেবনাথ ৭)

বাংলা একাডেমি এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মধ্যে বাংলা অক্ষরের স্বচ্ছতা সম্পর্কিত বিতর্ক সাধারণ মানুষের কাছে কতটা বিভ্রান্তিকর ছিল, তা বোঝা যায় একাডেমি-অনুসারী প্রায় প্রত্যেকটি বইতেই যুক্তাক্ষর বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা দেখলে। দিলীপবাবুর বইটি শুরু হচ্ছে *যুক্তাক্ষরের বিচিত্র চেহারা* নামক অধ্যায় দিয়ে। অন্য একটি অধ্যায়ে *(বাংলা বানানের নিয়ম)* বাংলা একাডেমির বানান-বিধি অনুসারে প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই নিয়মসমূহ প্রায় সর্বত্র নির্দেশমূলক; ব্যাকরণগত যুক্তি বিশেষ আলোচনা করা হয়নি। দ্বাদশ অধ্যায়ে *(কেন শুদ্ধ কেন অশুদ্ধ)* কতিপয় বহুল-ব্যবহৃত শব্দের বিভ্রান্তিকর বানান আলোচিত হয়েছে। দেলওয়ার হোসেন মন্ডলের *আধুনিক বাংলা বানান ও লেখার নিয়ম কানুন* গ্রন্থের ৬৭তম অধ্যায়েও একই কাজ করা হয়েছিল। অঙ্ক/ অংক, অন্তরিন/ অন্তরীণ, অস্তমান/ অস্তায়মান ইত্যাদি শব্দের দ্বিত্ব সম্ভাবনার মধ্যে কোন্‌টি ব্যবহার্য, লেখক তা আলোচনা করেছেন। এইসব ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত আলোচনা অগভীর। একাদশ

অধ্যায়ে *(লিখবেন না, লিখুন)* প্রায় ৫৭ পৃষ্ঠা জুড়ে শুদ্ধ-অশুদ্ধ বানানের বর্ণানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হয়েছে। বিকল্প বানানের ব্যাকরণগত শুদ্ধতা লেখক অস্বীকার করেননি। তবে বিকল্প বানানের ভাষায় গুরুত্ব তিনি স্বীকার করেন না— "শব্দের বিকল্প বানান থাকলে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। ...বানানের এই বিভিন্নতা দূর করা জরুরি" (দেবনাথ ২০৫-২০৮)।

ড. মোহাম্মদ আমীনের *অফিস-আদালতে বাংলা লেখার নিয়ম* গ্রন্থটির নামকরণ বিষয়বস্তুর সঙ্গে পুরোপুরি সাযুজ্যপূর্ণ হয়নি। সমগ্র গ্রন্থটি ১৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত। লেখক সামগ্রিকভাবে শুদ্ধ বাংলা লেখার বিবিধ নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বানান ছাড়াও ক্রিয়াপদ এবং বচনের শুদ্ধ প্রয়োগ, সমাসবদ্ধ শব্দ লেখার নিয়ম, যতিচিহ্নের যথাযথ ব্যবহার ইত্যাদি প্রসঙ্গ গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রন্থের শিরোনামে 'অফিস-আদালতে' শব্দবন্ধ থাকায় মনে হতে পারে, বিশেষত দাপ্তরিক বানান এই গ্রন্থের আলোচ্য। বস্তুত, এটি আরেকটি একাডেমি-অনুসারী বানান-নির্দেশিকা মাত্র। লেখক কঠোরভাবে বাংলা একাডেমির বানান-বিষয়ক অনুশাসন মেনে চলার পক্ষপাতী। ভাষার ওপর নারীত্ব আরোপ করে যথেচ্ছ বানান লেখার প্রবণতাকে তিনি নারী-নির্যাতনের সঙ্গে তুলনা করেছেন—

> কেউ যদি মাতৃভাষার প্রচলিত রীতি-নীতি আত্মস্থ করাকে কষ্টকর গণ্যে নিজের ইচ্ছেমতো বানান ও শব্দচয়ন করেন সেটি ধর্ষণের মতোই বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। প্রেমিক বা প্রেমিকাকে নিজের প্রতি প্রেমমুগ্ধ করতে না-পারার কারণে তাকে জোরপূর্বক নিজের বাহুডোরে আনার চেষ্টা যেমন ঠিক নয়, তেমনি ভাষাকে শুধু আত্মস্থ করতে না পারার কারণে জটিলতার দোহাই দিয়ে ব্যাকরণের রীতিনীতি অগ্রাহ্যপূর্বক বদলিয়ে ফেলার চেষ্টাও স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। (ড. আমীন, *অফিস-আদালতে বাংলা লেখার নিয়ম* ১৫)

লেখকের ব্যবহৃত উপমা বিষয়ে আপত্তি উঠতে পারে। তবে একাডেমির 'প্রমিত' বানানের ধারণায় তিনি যে কঠোরভাবে বিশ্বাসী, তা স্পষ্ট। এমনকি অভিধান-স্বীকৃত বানানকেও শুদ্ধ বলে মানতে তিনি রাজি নন —

> অনেকে মনে করেন, অভিধানে কোনও একটি শব্দের যে কয়টি বিকল্প বানান থাকে সবগুলো শুদ্ধ। এ ধারণা ঠিক নয়। (ড. আমীন, *অফিস-আদালতে বাংলা লেখার নিয়ম* ১৩)

বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলা একাডেমির বানান-বিধি পুনরুদ্ধৃত করা হয়েছে। বানান সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিভাষা (অক্ষর, বর্ণ, মাত্রা, চৈতন, আঁকড়ি ইত্যাদি) আলোচনা করা হয়েছে সপ্তম অধ্যায়ে। এটি এই বইয়ের অভিনব তথা মৌলিক বৈশিষ্ট্য। প্রথম অধ্যায়ে লেখক ঘোষণা করেছিলেন, অভিধান-স্বীকৃত বিকল্প বানান শুদ্ধ নয়। নবম অধ্যায়ে *(একাধিক বানান-সিদ্ধে করণীয়)* লেখকের অবস্থানগত অস্বস্তি টের পাওয়া যায়। তথাকথিত 'সমতাবিধানের স্বার্থে' বিকল্প মানতে তিনি রাজি নন। কিন্তু এই সমতাবিধান কেন এত জরুরি, তা কোথায় ব্যাখ্যা করা হচ্ছে না। ত্রয়োদশ *(দুষ্ট বানান)* এবং চতুর্দশ অধ্যায়ে *(অফিস আদালতে বহুলব্যবহৃত কিছু শব্দের শুদ্ধ বানান)* প্রায় ৫০ পৃষ্ঠা ধরে শুদ্ধ বানানের দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হয়েছে। বইয়ের অন্তিম অধ্যায়ে প্রচলিত অশুদ্ধ শব্দের তালিকা পাওয়া যায়। লেখকের ভাষায় এই ধরনের শব্দ 'বেআইনি সন্তানের মতো' (ড. আমীন, *অফিস-আদালতে বাংলা লেখার নিয়ম* ২০৩)।

ড. মাহবুবুল হকের *বাংলা বানানের নিয়ম* লেখা শুরু হয়েছিল ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে। পরে কিছু পরিমার্জন ও সংযোজন ঘটেছে। এই বইতে বানান ব্যতিরেকে ব্যাকরণের অন্য কোনো প্রসঙ্গ আলোচিত হয়নি। মোট ২৪টি অধ্যায়ে বাংলা বানানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে লেখক আলোচনা

করেছেন। মূল আলোচনা শুরুর আগে বাংলা লিপি ও উচ্চারণের অসামঞ্জস্যের প্রকৃতি উন্মোচন করা হয়েছে। একই ধ্বনির জন্য একাধিক বর্ণের ব্যবহার (ই/ঈ, জ/য), একাধিক বর্ণ বা যুক্তব্যঞ্জন দ্বারা একই ধ্বনি বোঝানো (ত্ব, ত্ত, ত্য, ত্ত্ব), প্রয়োজনীয় বর্ণের অভাব (অ্যা, ज़, फ़), একই বর্ণের একাধিক রূপ ইত্যাদি কারণে বাংলা বানান উচ্চারণ-অনুগ নয়। বিভ্রান্তির উদাহরণ দিতে গিয়ে লেখক দেখিয়েছেন — "তুলি, রুচি, শুভ, হুতাশন, বস্তু ইত্যাদি শব্দের প্রত্যেকটিতে উ-কারের চিহ্ন আলাদা" (ড. হক, বাংলা বানানের নিয়ম ১২)। ভারত এবং বাংলাদেশে বাংলা বানান সংস্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত আলোচনা করার পর বানান বিষয়ক নীতিমালা ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছেন। ড. মাহবুবুল হক প্রথম অধ্যায়ে সবিস্তারে বিবিধ বর্ণ এবং যুক্তব্যঞ্জনের লিখনবৈচিত্র্যের (allograph) সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তা ছাড়া, দৃশ্যগত সাদৃশ্যপূর্ণ যুক্তব্যঞ্জনগুলি (ঞ্জ/ ঞ্জ, ঞ্চ/ ঞ্ছ/ ঞ্ঝ, ট্র/ ট্র) যাতে বানান ভুলের কারণ না হয় — সে বিষয়ে তিনি সচেতন। ড. হকের বানান-চেতনা ব্যাকরণগত যুক্তিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ব্যাকরণ-স্বীকৃত কিন্তু অপ্রাতিষ্ঠানিক বানানকে তিনি ভুল বলে চিহ্নিত করেননি। যেমন: অলংকার/ অলঙ্কার, সংকট/ সঙ্কট ইত্যাদি শব্দ বিকল্প ব্যবহার সম্পর্কে ড. হক জানাচ্ছেন —

> কিন্তু বানানে সরলতা আনার লক্ষ্যে এ-সব ক্ষেত্রে কেবল *অনুস্বার* ব্যবহারই প্রাধান্য পাচ্ছে। ... এদের বানানে /ঙ/ ব্যবহার ভুল নয়। তবে *অনুস্বার* বর্তমানে অধিকতর প্রচলিত বলে এ-সব শব্দের বানান *অনুস্বার* দিয়ে দেখানো হল ... (ড. হক, *বাংলা বানানের নিয়ম* ৬০)

একবিংশতিতম অধ্যায়ে *(একই শব্দের একাধিক বানান)* বিকল্প বানান সৃষ্টির বিবিধ কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যাকরণের ভিন্ন নিয়ম, সর্বজনমান্য বানান-বিধির অভাব, বিদেশি শব্দ লিপ্যন্তরে যথাযথ নিয়মের অপ্রতুলতা, সংস্কৃত শব্দের বাংলাকরণ (ষড়্‌যন্ত্র> ষড়যন্ত্র, অন্ততঃ> অন্তত) ইত্যাদি কারণে বিকল্প বানানের সৃষ্টি হয়। গ্রন্থের শেষ তিনটি অধ্যায়ে প্রচলিত অশুদ্ধ শব্দ, অপপ্রয়োগ এবং বিভ্রান্তিকর বানান ('দুইশোটি পাজি শব্দের বানান') তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে।

বাংলা বানানের নিয়ম গ্রন্থের শেষ তিনটি অধ্যায়ে যা ছিল অপরিস্ফুট পরিকল্পনা মাত্র, ড. মাহবুবুল হকের *খটকা বানান অভিধান* গ্রন্থে তা পূর্ণাঙ্গ বিকশিত রূপ পেল। এই দুই গ্রন্থ পরস্পরের পরিপূরক বলা যায়। *খটকা বানান অভিধান* বানান-বিষয়ক নীতি, বানান ভুলের কারণ, লিপিগত সমস্যা ইত্যাদি প্রসঙ্গে একেবারে প্রবেশ করেনি। বরং প্রায়োগিকভাবে পাঠকের হাতে শুদ্ধ বানানের একটি সুদীর্ঘ তালিকা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সম্ভবত এটি অভিধান বলেই বিকল্প বানান কম প্রশ্রয় পেয়েছে। ভূমিকায় ড. হক বলেছিলেন —

> এই অভিধানে বানান-নির্দেশনার লক্ষ্য কোনোভাবেই হুকুমদারি নয়। প্রমিত বানান ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে নির্দেশনা উপস্থাপন করা হয়েছে, তা করা হয়েছে ভাষাবিশেষজ্ঞ, বানানবিশারদ, অভিধানকারদের অভিমত বিবেচনায় নিয়ে এবং 'বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' অনুসরণ করে। (ড. হক, *খটকা বানান অভিধান* ৭-৮)

কার্যক্ষেত্রে অবশ্য দেখা যাচ্ছে, দুটি বিকল্প বানানের মধ্য থেকে এই অভিধানে হ্রস্বস্বরযুক্ত বানানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। বাংলা একাডেমির বানান-নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে কখনও কখনও সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে। যেমন: -ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ সমাসবদ্ধ হলে প্রাতিপদিক রূপে ফিরে যায়নি। অর্থাৎ, গুণিজন নয়, গুণীজন; প্রাণিবিদ্যা নয়, প্রাণীবিদ্যা। চক্ষূরোগ, চক্ষুর্লজ্জা ইত্যাদি সংস্কৃত ব্যাকরণসিদ্ধ বানান *খটকা বানান অভিধান*-এ স্বীকৃতি পায়নি। ঐতিহাসিক কারণে যে-সব শব্দ বানানভেদ সৃষ্টি হয়েছে, সেখানেও

সাম্প্রতিক বানানকে প্রমিত বলে মেনে নেওয়া হয়েছে । যেমন: ক্রমশ, ক্রমশঃ নয় (ড. হক, "ক্রমশ" ৪৭); বিপদকাল, বিপৎকাল নয় (ড. হক, "বিপদকাল" ১২৪)।

ড. আব্দুল আলীমের *বাংলা বানান ও উচ্চারণ শিক্ষা* গ্রন্থটি দুই ভাগে বিভক্ত। গ্রন্থের প্রথমাংশে বানান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শেষাংশে রয়েছে উচ্চারণ সম্পর্কিত আলোচনা। বর্তমান আলোচনায় উচ্চারণ বিষয়ে আলোকপাত করা হবে না। গ্রন্থের ভূমিকায় হায়াৎ মামুদ বাংলাদেশের প্রমিত বাংলার সংজ্ঞা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন—

> প্রমিত বাংলা বা মান (standard) বাংলা ভাষা পূর্ববঙ্গীয় অঞ্চলে অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশে কোনো অঞ্চলেই লোকের মুখের ভাষা নয়। আমরা এখানে সবাই কথা বলি কোনো-না-কোনো আঞ্চলিক ভাষায়। পশ্চিমবঙ্গে তা নয়। প্রকৃতপক্ষে প্রমিত বাংলা যে শিক্ষিত ব্যক্তির লেখাপড়া ও কথা বলার ক্ষেত্রে চালু হয়েছে তা এক কালে সমগ্র বঙ্গদেশের রাজধানী (ব্রিটিশ আমলে) কলকাতা ও তার আশেপাশের জায়গার মুখের বুলি অনুসরণ করেই হয়েছে। ... তার ফলে শুদ্ধ বাংলা বলতে বা লিখতে গেলে তা পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করে চর্চা করতে হয়। ... তাই বাংলা ভাষার পরিশীলিত এই রূপ কথা বলা এবং লেখার জন্যে শিখতে আমরা বাধ্য হই। (আলীম ৫)

এই প্রসঙ্গটি ড. আলীমের মূল গ্রন্থে কিন্তু আর বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। বর্তমান আলোচনার পরবর্তী অংশে (উপ-অধ্যায় ৬.৭.২) ড. মোহম্মদ আজমের গ্রন্থ প্রসঙ্গে প্রমিত বাংলার সংজ্ঞা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বানানের নিয়ম শেখাতে গিয়ে বাংলা লিপির উৎপত্তি, বাংলাদেশে বানান-সংস্কারের ইতিহাস ইত্যাদি প্রসঙ্গ লেখক সংক্ষেপে উত্থাপন করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে *(লিখতে কেন ভুল হয়?)* বানান ভুলের বিভিন্ন কারণ তিনি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন। *বাংলা বর্ণের পরিচয়* নামক অধ্যায়ে যুক্তাক্ষরগুলির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এই অধ্যায়গুলিতে নতুনত্ব কিছু নেই। গড়পরতা আলোচনা। একাডেমি-অনুসারী অন্য যে-কোনো বইতেও পাওয়া যাবে। এই বইয়ের মৌলিক পর্যবেক্ষণ — সামাজিক পরিসরে বানান ভুলের ব্যাপ্তি সম্পর্কে লেখকের পর্যবেক্ষণ। দোকানের নামফলক, বাংলাদেশে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তার চিঠি, 'ভাষাশহিদ আবুল বরকত স্মৃতি জাদুঘর ও সংগ্রহশালা'-র পাথরে খোদিত বানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খাতার বানান ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে ছড়িয়ে থাকা বানান-ভুলের নিদর্শন লেখক যত্নের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন (ড. আলীম ১৯, ২৫-২৬)। এছাড়াও ১২টি অধ্যায়ে ভাগ করে বাংলা বানানের বিবিধ খুঁটিনাটি (জ/য, ঙ/ং, শ/ষ/স ইত্যাদির ব্যবহার, ণত্ব-ষত্ব বিধান, রেফ ও য-ফলা, ৎ ও ত প্রয়োগ, হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরবর্ণের ফারাক ইত্যাদি) তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। এই অধ্যায়গুলিতে সযত্ন পরিশ্রম রয়েছে, তবে মৌলিক তত্ত্বের অবতারণা করা হয়নি। গ্রন্থের প্রথম ভাগের অন্তিম অধ্যায়ে *(বহুল ব্যবহৃত শব্দ: শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ)* বানানের বর্ণানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হয়েছে।

অধ্যাপক স্বরোচিষ সরকারের *অকারণ ব্যাকরণ: ভাষা নিয়ে সরস কথা* মোটামুটিভাবে বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম মেনে নিয়েছে। কিন্তু পরিবেশনভঙ্গিটি অভিনব। লেখক লতিফ মাস্টার নামে একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তিনি একটি গ্রামীণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ভাষা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেন। বইয়ের ২৬টি অধ্যায়ই লতিফ মাস্টারের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত। এই গ্রন্থে প্রায় কখনোই সরাসরি, নির্দেশমূলকভাবে প্রমিত বানানের নিয়ম ব্যাখ্যা করা হয়নি। বরং লেখক গল্পের ছলে ভাষা বিষয়ক বিভিন্ন অন্তর্ভেদী প্রশ্ন উসকে দিয়েছেন। তার সঙ্গে হিউমর বা সরসতার পরশ যুক্ত হয়েছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। 'সম্মানীয় সভাপতি' ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ, বলা উচিত 'সম্মাননীয় সভাপতি' — এই মূল বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করার জন্য লেখক কিন্তু

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিবিড় অন্ধিসন্ধিতে প্রবেশ করেননি। সাধারণ পাঠকের কথা ভেবে মজার ভঙ্গিতে জানিয়েছেন (সরকারস্বরোচিষ, অকারণ ব্যাকরণ: ভাষা নিয়ে সরস কথা ১১-১৪), 'মান' মানে কচু। 'মানীয়' মানে কচু সম্পর্কিত। 'সম্মানীয় (সম্+ মানীয়) সভাপতি' মানে 'বিশেষ কচুর তৈরি' সভাপতি! পরিবর্তে বলা উচিত ছিল 'মাননীয়/ সম্মাননীয়/ সম্মানিত সভাপতি'! ব্যাকরণের সূক্ষ্ম কিছু প্রসঙ্গ — যেগুলি প্রায়শই প্রমিতকরণের আগ্রহাতিশয্যে উপেক্ষিত থেকে যায় — এই বইতে আলোচিত হয়েছে। *বর্ণমালা কোট বদলায়* নামক অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, বাংলা বর্ণমালার ক্রম শিশুপাঠ্য গ্রন্থ এবং অভিধানে আলাদা —

> শিশুরা প্রথম যে বর্ণমালা শেখে, সেখানে প্রথমে স্বরবর্ণ, তারপরে ব্যঞ্জনবর্ণ, তারপরে ড়, ঢ়, য়, ৎ, এবং সবশেষে ং ঃ এবং ঁ। ... বড়োদের এসব বইয়ে ং ঃ এবং ঁ আসে স্বরবর্ণের পরে, ড় আসে ড-এর পরে, ঢ় আসে ঢ-এর পরে, য় আসে য-এর পরে। ৎ-টি আবার সরাসরি ত-এর পরে বসে না। তার নিয়ম আলাদা। তাকে মনে করা হয় ত-এ হসন্তের (ত্) মতো। (সরকার, স্বরোচিষ, *অকারণ ব্যাকরণ: ভাষা নিয়ে সরস কথা* ২৫-২৬)

বানান-সংস্কারের সময়ে কেউই বর্ণানুক্রমে সমতাবিধানের কথা ভেবে দেখেননি। এই সমস্যার ফলে অভিধান, নির্ঘণ্ট, তথ্যকোশ, গ্রন্থাগারের বর্ণানুক্রমিক তথ্য অনুসন্ধানে অসুবিধা ও বিভ্রান্তি দেখা যায়। বিরল কিছু ক্ষেত্রে লতিফ মাস্টারের বকলমে লেখক বাংলা একাডেমির বানান-বিধির বিরোধিতা করেছেন। করত, পড়ল, যাব, শুনেছিল ইত্যাদি ক্রিয়াপদের বানানে একাডেমি অ-কারান্ত রূপে লেখার পক্ষপাতী। অন্যদিকে, হুমায়ুন আজাদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হক, সেলিনা হোসেন প্রমুখ লেখকের বই থেকে প্রাপ্ত উদাহরণের ভিত্তিতে অধ্যাপক সরকার ও-কারান্ত বানানে ক্রিয়াপদ লেখার পক্ষপাতী।[৮] একদিকে লেখক যেমন একাডেমির বিরোধিতা করছেন, অন্যদিকে আবার তিনিই নির্বিকল্প বানানের পক্ষে সওয়াল করছেন —

> সমকালীন বানান-রীতি না জানাটাও বানান-ভুলের কারণ। ... এক সময়ে 'পূর্ব' বানানে দুটো ব থাকতো, যেমন পূর্ব্ব। পুরনো বানান হিসেবে তা ভুল নয়, কিন্তু বর্তমানের বানান হিসেবে এই বানান ভুল। (সরকার, স্বরোচিষ, *অকারণ ব্যাকরণ: ভাষা নিয়ে সরস কথা* ৭৯)

এই অবস্থান কারও কাছে স্ববিরোধী বলে মনে হতে পারে। তবে মনে রাখা দরকার, আলোচ্য গ্রন্থ হুবহু প্রমিত বানান বা ব্যাকরণের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত হয়নি। বরং সমমনস্ক ভাষা-ভাবুকদের জন্য লেখা হয়েছে এই গ্রন্থ। ফলে প্রধানত একাডেমি-অনুসারী একটি গ্রন্থ হলেও ক্ষেত্রবিশেষে একাডেমির পথ থেকে সরে আসা বেমানান হয়নি বলেই আমাদের মনে হয়। অধ্যাপক স্বরোচিষ সরকারের *সর্বস্তরে বাংলা ভাষা: আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতা* গ্রন্থটির কথাও এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। এই গ্রন্থের মূল বিষয়

---

[৮] অধ্যাপক সরকারের বক্তব্যের প্রতিযুক্তি হতে পারে — আলোচ্য অধ্যায়ে নির্দেশক এবং অনুজ্ঞা ভাবের কোনো পার্থক্য তিনি বিবেচনা করেননি। 'চলো চলো ঢাকা চলো' লিখলে ক্রিয়াপদ অবশ্যই ও-কারান্ত হবে, কারণ এটি অনুজ্ঞাবাচক। কিন্তু নির্দেশক ভাবের ক্রিয়াপদের বানানে (যেমন: তুমি হাঁট-চল বলে সুস্থ আছ) ও-কার হবে না। তা ছাড়া, -ছো, -লো, -বো ইত্যাদিকে 'ক্রিয়াবিভক্তি' বলে তিনি চিহ্নিত করেছেন। এদের মধ্যে -ল এবং -ব কালবাচক বিভক্তি। -ছ (< আছ্) কিন্তু অতীতে যৌগিক কালের উপস্থিতি দ্যোতিত করে। এটি কালবিভক্তি নয়, আছ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন (সেনসুকুমার ২২৬-২৩০, ২৪০-২৪১)। আমরা একে প্রকার বিভক্তি বলার পক্ষপাতী (উপ-অধ্যায় ৩.২ দ্রষ্টব্য)। -ছ, -ল, -ব বিভক্তির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে পুরুষবাচক বিভক্তি -অ। নির্দেশক ভাবে এই -অ বিভক্তির পূর্বরূপ চর্যাগানে পাওয়া যায় (দাক্ষী ১৬৮)। -অ বিভক্তির লেখ্যরূপ নেই। -ও বিভক্তি কিন্তু ও-কাররূপে লিখতে হবে। ফলে শ্রমের সুরাহার বিষয়টিও ভেবে দেখা দরকার।

বাংলাদেশে প্রশাসনিক স্তরে ভাষা-পরিকল্পনা। গ্রন্থের অন্তিম অধ্যায়টি *(প্রমিত বাংলা বানান: দুই বাংলার সংযোগ)* বর্তমান নিবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এবং ঢাকার বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম প্রায় একই। লেখক কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে উভয় প্রতিষ্ঠানের মূলগত ঐক্যের বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছেন (সরকার, স্বরোচিষ, *সর্বস্তরে বাংলা ভাষা: আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতা* ১৫০-১৫১)। যেমন: ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ সালে কলকাতার রবীন্দ্র-ওকাকুরা ভবনে উভয় প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে ব্যাকরণ বিষয়ক একটি কর্মশালা আয়োজিত হয়। বানান এই কর্মশালার মূল আলোচ্য না হলেও আকাদেমির তৎকালীন সভাপতি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বাংলা ভাষা বিষয়ক কর্মকাণ্ডে উভয় বাংলার যৌথ উদ্যোগের গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন। ২০১২ সালে বাংলা একডেমির বানান-বিধি পরিমার্জনের সময় খসড়া বিধি অনানুষ্ঠানিকভাবে দেখে দিয়েছিলেন অধ্যাপক পবিত্র সরকার। -ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ সমাসবদ্ধ রূপে লেখার সময় 'ঈ-কারের ব্যবহারও চলতে পারে' বলে বাংলা একাডেমি স্বীকৃতি দিচ্ছেন (*বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* ১৬)। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ১৯৯৭ সালে শশীভূষণ, মন্ত্রীসভা ইত্যাদি বানানকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই ধরনের পরোক্ষ প্রভাবে আর সন্তুষ্ট না থেকে লেখক ভারত-বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রমিত বানান-বিধি নির্মাণে আশাবাদী —

> বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ত্রিপুরা সেখানে যেমন ভূমিকা রাখতে পারে, একইভাবে পারে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, বিহার একাডেমি, ঝাড়খন্ড বঙ্গভাষী সমন্বয় সমিতি, লনডন-নিউইয়র্কের ডায়াস্পোরা বাংলাভাষী। সকলকেই গুরুত্বের সঙ্গে দেখা উচিত। (সরকার, স্বরোচিষ, *সর্বস্তরে বাংলা ভাষা: আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতা* ১৬০)

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ইতোমধ্যে লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছে। উভয় দেশের সামূহিক বানান-চেতনাও গত শতকের নয়ের দশকের পর থেকে ক্রমশ কাছাকাছি এসেছে। যৌথ একটি বানান-বিধি নির্মিত হলে তাতে উভয় দেশের বাঙালিই উপকৃত হবেন।

ড. আব্দুর রহিমের *বাংলাদেশের ভাষা-পরিকল্পনা* গ্রন্থটি আসলে তাঁর পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভের পরিবর্ধিত রূপ। ভাষা-পরিকল্পনার দুটি ভাগ: মর্যাদা পরিকল্পনা (status planning) এবং অবয়ব পরিকল্পনা (corpus planning)। ক্লস অবয়ব পরিকল্পনার সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে —

> Planning with regard to languages is usually understood to mean that some agency, person, or persons are trying to change the shape or the corpus of a language by proposing or prescribing the introduction of new technical terms, changes in spelling, or the adoption of a new script. Occasionally (as in the case of Norwegian Bokmal) even changes in morphology may be initiated, new endings prescribed and a new gender admitted. These innovations have one thing in common, that they modify the nature of the language itself, changing its corpus as it were. We may thus speak of languagecorpus planning. (Kloss 81)

বানান-সংস্কার ভাষার অবয়ব পরিকল্পনার অন্তর্গত। প্রমিত বানান নির্ণয় কিংবা ব্যাকরণগত বিতর্ক লেখকের গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল না। চতুর্থ অধ্যায়ে *(বাংলাদেশে ভাষাসমূহের অবয়ব পরিকল্পনা)* তিনি বাংলাদেশে

বানান-সংস্কারের যে-সব প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস দেখা গেছে, সংক্ষেপে তাদের বিবরণ নথিভুক্ত করেছেন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (১৯৮৪ খ্রি.), কুমিল্লা কর্মশিবির (১৯৮৮ খ্রি.), বাংলা একাডেমির বানান-বিধি ইত্যাদির কথা তিনি সবিস্তারে বললেও ১৯৭১-পূর্ববর্তী বানান পরিস্থিতির কথা বিশেষ উল্লেখ করেননি। বাংলাদেশে একাডেমি-উত্তরকালে বানান-চর্চার পরিস্থিতি সম্পর্কেও তিনি নীরব। বাংলাদেশে বানান-পরিস্থিতির বিহঙ্গদর্শনে ড. রহিমের গ্রন্থ সাহায্য করে। তবে ব্যাকরণের নিবিড় তাত্ত্বিক আলোচনা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।

সৌরভ সিকদারের *বাংলাভাষা ও বাংলাদেশের ভাষা* ২৯টি ক্ষুদ্র নিবন্ধের সংকলন। এগুলির মধ্যে বেশিরভাগ লেখা ২০১০ সালে *প্রথম আলো* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিকল্প বানানের ব্যবহারকে লেখক তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেছেন (সিকদার ১৪) — "এই একুশ শতকে আমাদের ব্যবহারিক বাংলা বানান ভুলের প্রধান কারণ নিঃসন্দেহে 'অজ্ঞতা'। না-হলে 'ষ্টেডিয়াম', 'গ্রীণ' লেখা হবে কেন?" ভাষা ব্যবহার সম্পর্কিত অন্যান্য বিবিধ প্রসঙ্গও লেখক আলোচনা করেছেন। অ-সংস্কৃতনির্ভর খাঁটি বাংলা ব্যাকরণের অভাব, ডিজিটাল মাধ্যমে বাংলা ভাষা, মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা, বাংলাদেশের সংবিধানের বাংলা ভাষা, সাধু-চলিত দ্বন্দ্ব ইত্যাদি নানা বিষয়ের ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে। *বাংলা লিপি সংস্কার: সিদ্ধান্ত এখনই* নামক নিবন্ধে বাংলা লিপি সংস্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যায়। বাংলা লিপিকে যুগোপযোগী করে তুলতে লেখকের পরামর্শ —

> আমরা মনে করি, ভাষার লিখিত রূপ যেমন সহজ, সরল ও স্পষ্ট হতে হবে তেমনি অনিবার্য বা বোঝা না হলে ঐতিহ্যময় প্রচলিত বাংলা লিপি বাদ দেয়ার প্রয়োজন নেই। একই সঙ্গে লিপির সৌকর্যের দিকটিও বিবেচ্য। (সিকদার ৩৩)

সামগ্রিকভাবে, সৌরভ সিকদারের গ্রন্থটি বিবিধ বিষয় স্পর্শ করে গেলেও আলোচনার গভীরতা বা তাত্ত্বিক অভিনবত্ব নজরে পড়ে না। এটি একাডেমি-অনুসারী আরেকটি গড়পরতা গ্রন্থ মাত্র। বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে একাডেমি-অনুসারী আরও অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। উদা: মাহমুদ শফিকের *প্রমিত বাংলা বানান,* ড. রতন সিদ্দিকীর *প্রমিত বাংলা বানান অভিধান,* ড. বেগম জাহান আরার *প্রমিত বাংলা বানান সমাচার,* ড. মোহাম্মদ আমীনের *সহজ সূত্রে প্রমিত বাংলা বানান,* রণজিৎ বিশ্বাসের *ব্যবহারিক বাংলা: যত ভুল তত ফুল* ইত্যাদি। এগুলির প্রত্যেকটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকটি একাডেমি-অনুসারী গ্রন্থ নিয়ে এতদবধি আলোচনা করা হল। বোঝার সুবিধার্থে একঝলকে তাদের বৈশিষ্ট্য একটি সারণিতে পেশ করা হল —

ক্রমিক সংখ্যা	লেখক	বই	বিকল্প বানানকে স্বীকৃতি	শুদ্ধ বানানের তালিকা	বানান ব্যতিরেকে আলোচিত বিষয়
১	নাছিমউদ্দিন মালিথা	বাংলা বানান ও টুকিটাকি	না	৩৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী	স্বচ্ছ যুক্তাক্ষর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা
২	দেলওয়ার হোসেন মন্ডল	আধুনিক বাংলা বানান ও লেখার নিয়ম কানুন	হ্যাঁ	২০ পৃষ্ঠা ব্যাপী	ক্রিয়াপদ, লিঙ্গ, বচন, যতিচিহ্ন
৩	দিলীপ দেবনাথ	বাংলা বানান ও শব্দের জগৎ	হ্যাঁ	৫৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী	অক্ষর, ক্রিয়াপদ, অব্যয়, সর্বনাম, লিঙ্গ
৪	ড. মোহাম্মদ আমীন	অফিস-আদালতে বাংলা লেখার নিয়ম	না	৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী	ক্রিয়াপদ, বচন, যতিচিহ্ন, বানান বিষয়ক পরিভাষা
৫	ড. মাহবুবুল হক	বাংলা বানানের নিয়ম	হ্যাঁ	১০ পৃষ্ঠা	বানান সংস্কারের ইতিহাস, বিকল্প বানানের কারণ, বানান শেখার পন্থা
৬	ড. মাহবুবুল হক	খটকা বানান অভিধান	না	সমগ্র গ্রন্থ	নেই
৭	ড. আব্দুল আলীম	বাংলা বানান ও উচ্চারণ শিক্ষা	না	১০ পৃষ্ঠা	উচ্চারণের নিয়ম, সামজিক পরিসরে বানান ভুলের দৃষ্টান্ত
৮	স্বরোচিষ সরকার	অকারণ ব্যাকরণ: ভাষা নিয়ে সরস কথা	না	নেই	ব্যাকরণের বিবিধ প্রসঙ্গ
৯	ড. আব্দুর রহিম	বাংলাদেশের ভাষা-পরিকল্পনা	নিরপেক্ষ	নেই	ব্যাকরণ, অভিধান, উচ্চারণ, পরিভাষা ইত্যাদি
১০	সৌরভ সিকদার	বাংলাভাষা ও বাংলাদেশের ভাষা	না	নেই	লিপি, সাধু-চলিত, উচ্চশিক্ষার ভাষা, আদিবাসীদের ভাষা

সারণি ৬.১: বাংলা একাডেমি (ঢাকা) অনুসারী গ্রন্থসমূহ

৬.৭.২ বাংলা একাডেমি বিরোধী গ্রন্থসমূহ

সাম্প্রতিক অতীতে বাংলাদেশে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানের প্রভাব ক্রমবর্ধমান। বিশেষত, পাঠ্যপুস্তক বোর্ড একাডেমির বানান-বিধি মেনে নেওয়ার পর একাডেমি-অনুসারী বানান-চিন্তকদের একটি গোষ্ঠী

গড়ে উঠেছে। পূর্ববর্তী অংশে তাঁদের লেখালিখি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তবে এখনও কিছু বিরুদ্ধ স্বর রয়েছে। এই বিরুদ্ধতার মাত্রা ও প্রবণতা যথাযথভাবে বুঝে নেওয়া জরুরি।

বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানান-বিধির বিকল্প পথে যাঁরা এগোতে চেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম। ব্যাকরণগত বিতর্ক তুলে নির্দিষ্ট একটি-দুটি শব্দের বানান পরিবর্তনে তাঁর আগ্রহ নেই। বাংলা একাডেমি-কথিত 'প্রমিত'-র ধারণাকে অধ্যাপক আজম যাচাই করে নিতে চান। কাকে বলে প্রমিত? *বাংলা ও প্রমিত বাংলা সমাচার* গ্রন্থে লেখক অভিমত প্রকাশ করছেন, স্বাধীন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্মের পর প্রমিত বাংলার সংখ্যা কমপক্ষে দুই। কলকাতার বাংলা এবং ঢাকার বাংলা। অথচ, বাংলাদেশের বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে প্রমিত বাংলার নামে আসলে কলকাতার বাংলার চর্চা চলছে। বাংলাদেশের মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে প্রমিত ভাষার দূরত্ব এত বেশি বেড়ে গেছে যে, তাঁদের রীতিমতো পরিশ্রম করে প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে ব্যবহার্য প্রমিত বাংলা আয়ত্ত করতে হচ্ছে। ড. আব্দুল আলীমের *বাংলা বানান ও উচ্চারণ শিক্ষা* বইয়ের ভূমিকায় হায়াৎ মামুদ এই সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন (অধ্যায় ৬.৭.১ দ্রষ্টব্য)। অধ্যাপক আজমের মতে (আজম, *বাংলা ও প্রমিত বাংলা সমাচার* ১০২-১০৬), বাংলাদেশের টেলিভিশন-নাটকে অপ্রমিত বাংলার বহুল প্রয়োগ আসলে এক ধরনের বি-উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া। টেলিভিশন-নাটকে অপ্রমিত বাংলা সংলাপের জনপ্রিয়তার কারণ, একাডেমি-নির্দিষ্ট প্রমিত বাংলার প্রতি বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির সামষ্টিক অস্বস্তি। ঢাকার প্রমিত বাংলার সংকটের আরেকটি মাত্রা রয়েছে। বাংলায় আত্তীকৃত তথা লোকপ্রচলিত ইংরেজি ও আরবি-ফারসি শব্দ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রমিত রীতিতে স্বীকৃতি পায়নি।[৯] তা ছাড়া বাংলাদেশের ভাষা-চিন্তকদের একাংশের ধারণা, প্রমিত বাংলা হবে নিত্যদিনের বাংলার থেকে আলাদা। এই ধারণার পিছনে লেখক উপনিবেশায়নের প্রভাব খুঁজে পেয়েছেন —

> প্রচলিত বাংলা অশুদ্ধ — এই ধারণা গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উপনিবেশিত কলকাতায়। হ্যালহেড, কেরি প্রমুখের প্রযোজনায়। কলকাতার উপনিবেশিত ভদ্রলোক সমাজ এই ধারণা পুরোপুরি মেনে নিয়েছিল। (আজম, *বাংলা ও প্রমিত বাংলা সমাচার* ১০৩)

দৈনন্দিন এবং প্রমিত ভাষা আলাদা হয়ে যাওয়ায়, বাংলাদেশের বাংলা ভাষার উচ্চারণ ও বানানে কলকাতার আধিপত্য মেনে নিতে হচ্ছে। বাংলা একাডেমির বানানের প্রতি অধ্যাপক আজমের মূল আপত্তি এখানেই। ব্যাকরণের কূটতর্কের থেকে বেশি ভাষার উপনিবেশায়ন নিয়ে তিনি ভাবিত। অন্যত্রও একটি সাক্ষাৎকারে বাংলা একাডেমির নির্দেশমূলক আধিপত্য বিষয়ে তিনি অস্বস্তি প্রকাশ করেছেন[১০] —

> (তালাশ) তালুকদার: উল্লেখ্য, 'মানভাষার বাইরে কিছু করা যাবে না' — এ কথা যখন বাংলা একাডেমি কর্তৃক ঘোষণা করা হয়, তখন এটাকে কী বলবেন? এই যে চাপিয়ে দেওয়া, জনগণকে বাধ্য করা, এটা কি ফ্যাসিস্ট আচরণ নয়?...

---

[৯] এই বক্তব্য সর্বাংশে মেনে নেওয়া যায় না। বাংলা একাডেমির *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* নামক নির্দেশিকার ২.২, ২.৬, ২.৮, ২.৯, ২.১০ সংখ্যক নিয়মে বেশ কিছু লোকপ্রচলিত বিদেশি শব্দ স্থান পেয়েছে। (*বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* ১৮, ২০-২৩)

[১০] উদ্ধৃতির মধ্যে ব্যবহৃত প্রথম বন্ধনীর স্পষ্টীকরণ বর্তমান নিবন্ধকার-কৃত।

> আজম: ... অন্তত আমি তাঁর (বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের) কথাকে আক্ষরিক অর্থে নিইনি। তবে কথাটা — আপনি ঠিকই বলেছেন — ভাষার ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ট উচ্চারণের মতোই মনে হয়েছিল। (আজম, *বাংলা ও প্রমিত বাংলা সমাচার* ১৬৬-১৬৭)

ঢাকার প্রমিত বাংলার এই সংকট কাটিয়ে ওঠার বিষয়ে অধ্যাপক আজমের অন্যতম অবলম্বন রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তা। সংস্কৃতের প্রভাব কাটিয়ে খাঁটি বাংলা বানানকে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, সেই বিষয়ে অন্যত্র অধ্যাপক আজম দীর্ঘ আলোচনা করেছেন (আজম, *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ* ৪৬২-৪৬৪)। বাংলা বানানের বি-উপনিবেশায়ন রবীন্দ্রনাথ তিনটি ধাপে করতে চেয়েছিলেন। প্রথমত, বাংলায় প্রচলিত অ-সংস্কৃত শব্দের বানানে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম পরিহার করা এবং এইসব শব্দের বানান যথাসাধ্য উচ্চারণ-অনুযায়ী করা। দ্বিতীয়ত, তৎসম শব্দভাণ্ডারের যে-সব শব্দ বাংলায় আত্তীকৃত হয়েছে, সেগুলির বানান বাংলা ব্যাকরণ দ্বারা নির্ধারিত হবে। তৃতীয়ত, ভবিষ্যতে হয়তো কোনোদিন তৎসম শব্দের বানানও বদলিয়ে বাঙালির উচ্চারণ অনুযায়ী ধ্বনি-সংবাদী বানান লেখা সম্ভব হবে। রবীন্দ্রনাথের এই আশা তথা পরিকল্পনা অদ্যাবধি বাস্তবায়িত করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তবে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মের বেড়াজাল কেটে খাঁটি বাংলা বানানের অনুসন্ধানে অধ্যাপক আজম এই পরিকল্পনাতেই ভরসা করেছেন বলে মনে হয়।

অধ্যাপক মনসুর মুসা — অধ্যাপক মোহাম্মদ আজমের মতোই — ব্যাকরণের কূটতর্কের বাইরে বিভিন্ন সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে একাডেমির প্রমিত বানানের যাথার্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর যুক্তি নিম্নরূপ —

প্রথমত, বিকল্প ভাষার স্বাভাবিক অঙ্গ। পৃথিবীর যে-কোনো প্রাকৃতিক ভাষাতেই বিকল্প থাকে। বিকল্প সৃষ্টির পিছনে বিবিধ কারণ কাজ করে। ব্যাকরণের নিয়মের শৈথিল্য, আর্ষ-প্রয়োগ, প্রাচীন বানান পরিবর্তন, আঞ্চলিক উচ্চারণ, হস্তাক্ষর থেকে মুদ্রণের যুগে প্রবেশ করার সময় প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি নানা কারণে বিকল্প বানান ভাষায় দেখা যায়। বাংলায় বিকল্পের সংখ্যা কিন্তু খুব বেশি হয় না। তাদের নির্বিকল্প করে তোলার জন্য ভাষাতাত্ত্বিকরা বৃথা শ্রম করছেন। অধ্যাপক মুসা জানাচ্ছেন —

> বাংলায় লক্ষ লক্ষ শব্দের মধ্যে কয়েক শত শব্দের বিকল্প বানান আছে। ... ভাষা বিকল্পধর্মী, বাহুল্যধর্মী ও বৈচিত্র্যধর্মী একটি প্রপঞ্চ। ভাষা জানতে হলে, শিখতে হলে, বুঝতে হলে বিকল্প, বাহুল্য ও বৈচিত্র্য বিনাশ করতে চাইলে নতুন বৈচিত্র্যের আবির্ভাব হবে। ... বাংলা ভাষায় বানান পদ্ধতিকে যাঁরা অবিকল্প করার দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ করেন তাঁরা তাত্ত্বিক দিক থেকে সঠিক পদক্ষেপ নেন না। (মুসা ২০-২১)

দ্বিতীয়ত, বাংলা বানান নির্ধারিত হয় শব্দটি তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি নাকি বিদেশি — তার ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু এই বিভাজন সর্বদা সুস্পষ্ট নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিক থেকে বাংলাদেশের কাছে ভারত বিদেশ। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের দিক রাঢ়বঙ্গে প্রচলিত 'ডিংলা' (কুমড়ো) শব্দটিকে বাংলাদেশের মানুষ কি বিদেশি বলে গণ্য করবেন? বাংলায় কয়েকশ বছর ধরে যে-সব আরবি-ফারসি, পোর্তুগিজ এবং ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে, তাদের কি আর বিদেশি শব্দ বলা চলে? কিছু শব্দ শ্রেণিবদ্ধকরণে সমস্যাও রয়েছে[১১]। যেমন: 'ইংরেজি' শব্দটি কি বিদেশি, নাকি দেশি? ভারতের সংবিধানে 'India' শব্দটি স্বীকৃতি পেয়েছে (*The Constitution of India* Article 1.1)। একে ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে আর কি বিদেশি শব্দ বলা যায়? সংবিধানের স্বীকৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে একে

[১১] প্রথম উদাহরণটি অধ্যাপক মুসার বই থেকে গৃহীত। দ্বিতীয়টি আমাদের মৌলিক সংযোজন।

যদি ভারতীয় শব্দ বলেই আমরা গ্রহণ করি, তাহলে ভারতীয়রা কি 'ইণ্ডিয়া' বানান লিখবেন? আর বাংলাদেশিদের কাছে এটি বিদেশি শব্দ বলে তাঁরা লিখবেন 'ইন্ডিয়া'? শব্দের কুলজি নির্ণয় সম্পর্কিত এইসব প্রশ্নের মীমাংসা না-হওয়া পর্যন্ত নির্ভুলভাবে বানান লেখাও সমস্যাজনক।

তৃতীয়ত, কিছু বানানের দালিলিক তথা আইনগত বৈধতা থাকে। মানুষের নামের বানান, গ্রন্থের শিরোনাম, দেশের সংবিধানের বানান ইত্যাদি পরিবর্তন করা হলে সুদূরপ্রসারী আইনি এবং অর্থনৈতিক সমস্যা তৈরি হতে পারে।

চতুর্থত, বাংলাদেশে বিশেষত প্রচলিত শব্দের আরবিকরণের অত্যুৎসাহ বানান-বিশৃঙ্খলার জন্ম দিয়েছে (মুসা ২৬, ৫৮)। সাম্প্রতিক কিছু নিদর্শন: রহমান> রাহমান, রহিম> রাহিম, সৈয়দ> সাইয়েদ, শেখ> শইখ, রোজা> রোযা, নামাজ> নামায, জাকাত> যাকাত, রসুল> রাসূল, জামাত> জামায়াত ইত্যাদি। অধ্যাপক মুসা এই ধরনের পরিবর্তনকে 'শুদ্ধতাবাদিতার বিকার' বলে অভিহিত করেছেন। একই প্রবণতা অতিরিক্ত সংস্কৃতায়নের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। বাংলায় সুপ্রচলিত ইতিমধ্যে, চলমান, সমসাময়িক ইত্যাদি শব্দকে বাতিল করে ইতোমধ্যে, চলৎ, সামসময়িক ইত্যাদি লেখার উদ্যোগ ভাষাকে অকারণ বিপর্যস্ত করবে।

পঞ্চমত, স্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার অধ্যাপক মুসা সমর্থন করেন না। তাঁর মতে, এর ফলে 'প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত স্পষ্টীকৃত রূপের বাংলা লিপির সঙ্গে সমাজসম্পৃক্ত সাহিত্যে রক্ষিত প্রথাগত যুক্তাক্ষর সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাবে একটি প্রাজন্মিক বিচ্ছেদ সৃষ্টি হবে' (মুসা ৭৫)।

অধ্যাপক মনসুর মুসা বানান প্রমিতকরণ বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ সমর্থন না-করার পিছনে আরও কিছু কারণ দর্শিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির মাত্রাতিরিক্ত প্রভাব (মুসা ১৪), প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের বানান-চেতনায় স্ববিরোধ, বানান পরিবর্তনের অর্থনৈতিক দায়ভার ইত্যাদি বিবিধ কারণে তিনি বানান বিষয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষপাতী।

অধ্যাপক মুসা কিংবা অধ্যাপক আজমের মতো মুষ্টিমেয় কিছু বিরুদ্ধ স্বরের কথা বাদ দিলে বাংলাদেশে একাডেমি-নির্দিষ্ট বানানের পক্ষেই জনমত। সংবাদপত্রগুলিও প্রধানত একাডেমির বানান অনুসরণ করে থাকে। *প্রথম আলো* সংবাদপত্রগোষ্ঠীর নিজস্ব বানানবিধি থাকলেও তা একাডেমি থেকে খুব ভিন্ন কিছু নয়।

৬.৮ সিদ্ধান্ত

বাংলাদেশে বানান সংস্কারের ইতিহাস রাষ্ট্রিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সমান্তরাল হারে অগ্রসর হয়েছে। গত শতাধিক বছরের ইতিহাসকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে —

১। প্রথম পর্যায় (১৯৪৭ পূর্ববর্তী): উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্র তৈরির আগে পর্যন্ত আরবি অক্ষরে বাংলা লেখার বিক্ষিপ্ত কিছু উদ্যোগ নজরে পড়ে। তবে এই ধরনের উদ্যোগ বিশেষ জনপ্রিয়তা পায়নি।

২। দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৪৭-১৯৭১ খ্রি.): পাকিস্তানি শাসকদের উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাকে ঐতিহ্য-বিচ্যুত করার সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বাংলা লিপি পরিত্যাগ করা, আরবি-ফারসি শব্দের বহুল

ব্যবহার, যুক্তাক্ষর ভেঙে দেওয়া ইত্যাদি প্রয়াসে শাসকের মদত ছিল। বাঙালি ভাষা-চিন্তকদের একাংশ এর প্রতিবাদও করেছিলেন।

৩। তৃতীয় পর্যায় (১৯৭২- ১৯৯২ খ্রি.): স্বাধীন বাংলাদেশে বানান-সংস্কারের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় এটিই। রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে উন্নত ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে ব্যবহার্য করে গড়ে তোলার বাসনায় বানান-সংস্কারের একাধিক সদর্থক উদ্যোগ এই কালসীমায় লক্ষ করা যায়। এই পর্যায়ে বাংলাদেশের বর্তমান প্রমিত বানান-বিধির কাঠামো পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও বাংলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে গড়ে উঠেছে।

৪। চতুর্থ পর্যায় (১৯৯৩-): এই পর্যায়ে বাংলাদেশের সর্বস্তরে বাংলা একাডেমি-নির্দিষ্ট বানানের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। একাডেমি-অনুসারী গ্রন্থের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

উপর্যুক্ত চারটি পর্যায় সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনার পর মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বাংলাদেশের বাংলা বানানে সামাজিক উপাদানের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। অন্তত, ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানান-বিধি প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যন্ত ব্যাকরণগত যুক্তি কম গুরুত্ব পেত। তার বদলে ব্যক্তিগত প্রবণতা, ধর্মীয় আবেগ, রাষ্ট্রিক হস্তক্ষেপ ইত্যাদি দ্বারাই প্রধানত বাংলা বানানের গতিপথ নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু ব্যাকরণকেন্দ্রিক তর্ক-বিতর্ক বানান-আলোচনার প্রধান নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে সামাজিক উপাদানগুলির প্রভাব কমে আসায় পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তাদের বানান প্রায় অভিন্ন হয়ে উঠেছে। অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম বা অধ্যাপক মনসুর মুসার মতো বিরুদ্ধ স্বর যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা কিন্তু ব্যাকরণগত কারণে একাডমির বানান-বিধির সমালোচনা করছেন না। তাঁদের আপত্তি সমাজতাত্ত্বিক।

পশ্চিমবঙ্গের সাপেক্ষে বাংলাদেশের বানান-সংস্কারের ইতিহাস অনেক বেশি জটিল। আর সেই কারণেই চিত্তাকর্ষক। অনেক উত্থান-পতন এবং বিকৃতি পেরিয়ে সেখানকার বানান বর্তমানে স্থিতিশীল অবস্থায় উপনীত হয়েছে। ভবিষ্যতে বাংলা বানান কোন্‌পথে এগোবে, এই ইতিহাস থেকে তারও খানিক আন্দাজ পাওয়া যায়। অসম, ত্রিপুরা, দিল্লি, ঝাড়খণ্ড, আন্দামান-সহ ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এবং বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিদের সামষ্টিক উদ্যোগে বাংলা বানান-সংস্কারের আগামী পর্যায় লিখিত হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এবং ঢাকা বাংলা একাডেমির বানান-বিধির ১৯৯২-উত্তর কালে নৈকট্য সেই দিকেই ইঙ্গিত দেয়।

তথ্যসূত্র

Haugen, Einar. "The Implementation of Corpus Planning: Theory and Practice." *Progress in Language Planning*, edited by Juan Cobarrubias and Joshua A. Fishman, De Gruyter Mouton, 2012, https://doi.org/10.1515/9783110820584.269.

JERNUDD, BJÖRN H., and JYOTIRINDRA DAS GUPTA. "TOWARDS A THEORY OF LANGUAGE PLANNING." *Can Language Be Planned?*, edited by BJÖRN H. JERNUDD and JOAN RUBIN, University of Hawai'i Press, 1971, pp. 185–204, https://doi.org/10.2307/j.ctv9zckn9.15. JSTOR.

Kloss, Heinz. *Research Possibilities on Group Bilingualism: A Report*. International Centre for Research on Bilingualism, 1969, https://eric.ed.gov/?id=ED037728.

Md. Qudrat-e-Khuda. *Bangladesh Education Commisssion Report*. May 1974.

Report of the East Bengal Language Committee, 1949. Officer on Special Duty (Home Deptt.), East Pakistan Govt. Press, 1958.

The Constitution of India. 9 Sept. 2020, https://legislative.gov.in/constitution-of-india.

আজম, মোহাম্মদ. *বাংলা ও প্রমিত বাংলা সমাচার*. প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, অক্টোবর, ২০১৯.

---. *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ*. দ্বিতীয় সংস্করণ, আদর্শ, ২০১৯.

আনোয়ার, শাকিল. "যে বৈষম্যের কারণে বাঙালিরা পাকিস্তান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়." *BBC News বাংলা*, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২১. *www.bbc.com*, https://www.bbc.com/bengali/news-55803132.

আমীন, মোহাম্মদ. *অফিস-আদালতে বাংলা লেখার নিয়ম*. প্রথম প্রকাশ, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৫.

---. "বাংলা বানান সংস্কার: প্রমিত বানান কথার জন্ম ও বর্তমান হালচাল (১৯৩০ থেকে ২০২০)." *Dr. Mohammed Amin*, https://draminbd.com/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be-%e0%a6%ac%e0

%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%ae/. Accessed 23 June 2022.

আলম, শফিউল. "জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড." বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ৮ ডিসেম্বর, ২০১৪, https://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE_%E0%A6%93_%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%95_%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1.

---. *প্রসঙ্গ: ভাষা বানান শিক্ষা.* প্রথম প্রকাশ, কাকলী প্রকাশনী, ২০০২.

আলীম, আব্দুল. *বাংলা বানান ও উচ্চারণ শিক্ষা.* প্রথম প্রকাশ, গতিধারা, ২০১১.

উমর, বদরুদ্দীন. *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি.* আনন্দধারা প্রকাশন, ১৯৭০.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান | ৩। রাষ্ট্রভাষা. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957/section-29340.html. Accessed 21 June 2022.

ঘোষ, বিশ্বজিৎ. "পূর্ববাংলা ভাষা কমিটির প্রতিবেদন ও বাস্তবতা." *Risingbd Online Bangla News Portal*, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, https://www.risingbd.com/opinion/news/214750.

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি). http://www.nctb.gov.bd/. Accessed 22 June 2022.

দাক্ষী, অলিভা. *চর্যা-গীতি ভাষা ও শব্দকোষ.* প্রথম সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১১.

দেবনাথ, দিলীপ. *বাংলা বানান ও শব্দের জগৎ.* দ্বিতীয় মুদ্রণ, আলেয়া বুক ডিপো, ২০১৮.

নাথ, মৃণাল. *ভাষা ও সমাজ.* নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৯.

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার. *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত.* মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮-২০১৯.

বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম. পরিমার্জিত সংস্করণের প্রথম মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৫.

মন্ডল, দেলওয়ার হোসেন. *আধুনিক বাংলা বানান ও লেখার নিয়ম কানুন.* প্রথম প্রকাশ, আফসার ব্রাদার্স, ২০১৯.

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ-শিক্ষা মন্ত্রণালয়. http://www.shed.gov.bd/. Accessed 22 June 2022.

মালিথা, নাছিমউদ্দিন. *বাংলা বানান ও টুকিটাকি.* দ্বিতীয় মুদ্রণ, অনন্যা, ২০১৫.

মুসা, মনসুর. বানান: *বাংলা বর্ণমালা পরিচয় ও প্রতিবর্ণীকরণ.* প্রথম প্রকাশ, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৭.

রহিম, আব্দুর. *বাংলাদেশের ভাষা-পরিকল্পনা.* প্রথম প্রকাশ, অবসর, ২০১৭.

শরীফ, আহমেদ. *বাঙলাভাষা-সংস্কার আন্দোলন.* আগামী প্রকাশনী, ২০১৮.

সরকার, পবিত্র. *ভাষা, দেশ, কাল.* প্রথম সংস্করণ, জি.এ.ই. পাবলিশার্স, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ.

---. *ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ.* দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮.

সরকার, স্বরোচিষ. *অকারণ ব্যাকরণ: ভাষা নিয়ে সরস কথা.* কথাপ্রকাশ, ২০১৯.

---. *সর্বস্তরে বাংলা ভাষা: আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতা.* দ্বিতীয় মুদ্রণ, কথাপ্রকাশ, ২০১৬.

সিকদার, সৌরভ. *বাংলাভাষা ও বাংলাদেশের ভাষা.* প্রথম প্রকাশ, অবসর, ২০১৪.

সেন, অরুণ. *দুই বাঙালি, এক বাঙালি.* প্রথম প্রকাশ, অবভাস, ২০০৬.

সেন, সুকুমার. *ভাষার ইতিবৃত্ত.* ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১.

হক, মাহবুবুল, সম্পা. "ক্রমশ." *খটকা বানান অভিধান,* ষষ্ঠ মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ২০২০.

---, সম্পা. *খটকা বানান অভিধান.* ষষ্ঠ মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ২০২০.

---. *বাংলা বানানের নিয়ম.* দশম মুদ্রণ, সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৮.

---, সম্পা. "বিপদকাল." *খটকা বানান অভিধান,* ষষ্ঠ মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ২০২০.

সপ্তম অধ্যায়: আকাদেমি বানানবিধির প্রায়োগিক সাফল্য: সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন

৭.১ প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাংলা বানান

ভাষা প্রমিতকরণের প্রয়াস অনেক সময় সর্বজনগ্রাহ্য হয় না। অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রমিত বানান সর্বদা সাধারণ্যে স্বীকৃতি পায় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানানবিধি যে সামাজিক স্তরে সর্বোচ্চ ৬১%-এর বেশি মান্যতা পায়নি, তা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই পরিসংখ্যান তৈরি করা হয়েছিল ১৯৫৬ সালের পত্রপত্রিকা এবং অভিধানের বানানের ওপর ভিত্তি করে। গত প্রায় ৭০ বছরে বাংলা বানানের গতিপ্রকৃতি আরও অনেক পালটে গেছে। উচ্চারণ-অনুগ বানা— অন্ততপক্ষে তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে— নিকট ভবিষ্যতে মান্যতা যে পাবে না, তা প্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু ঐতিহ্যকে অনেকাংশে মেনে নিয়ে বাংলা বানান সরলীকরণ এবং সমতাবিধানের যে প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি শুরু করেছিল গত শতকের অন্তিম দশকে, গত ২০-২৫ বছরে তা জনমানসে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারল? বর্তমান অধ্যায়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে আকাদেমি-প্রস্তাবিত বাংলা বানানের গ্রহণযোগ্যতা খতিয়ে দেখা হবে।

৭.২ গবেষণা-প্রশ্ন

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা প্রধানত যে-প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে পেতে চাইছি —

- বাংলা ভাষায় 'বৌদ্ধিক' তথা 'মননশীল' পত্র-পত্রিকার জগতের বাইরে আকাদেমির বানানবিধি কতটা গৃহীত হয়েছে?
- সাহিত্যিক পত্রপত্রিকা (বাণিজ্যিক এবং অবাণিজ্যিক অণুপত্রিকা উভয়ই বিবেচ্য), জনপ্রিয় সংবাদপত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে আকাদেমির বানান কি মেনে চলা হচ্ছে?
- সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত বিবিধ সরকারি প্রচার, বেসরকারি ই-পত্রিকা, ওয়েব-পোর্টাল ইত্যাদি ডিজিটাল ক্ষেত্রে আকাদেমির বানানবিধির প্রভাব কীরকম?
- পূর্বোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে আকাদেমি-প্রস্তাবিত 'স্বচ্ছ' বাংলা লিপি অনুসৃত হচ্ছে কি?

লক্ষণীয়, আকাদেমি বানানবিধির যাবতীয় নিয়মগত জটিলতা গণপরিসরে সর্বদা দৃশ্যমান না-থাকাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে মূলত নিম্নোক্ত ১০টি বিষয়ের ওপর নজর দেওয়া হয়েছে —

১। তৎসম শব্দে বিকল্পে সিদ্ধ ই/উ-যুক্ত বানান ব্যবহার,

২। -ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ সমাসবদ্ধ বা প্রত্যয়যুক্ত হলে ই-কারযুক্ত বানানে পরিবর্তন,

৩। রেফের নীচে ব্যঞ্জনদ্বিত্বের প্রবণতা,

৪। সন্ধিযুক্ত শব্দে ঙ-এর বিকল্পে অনুস্বার ব্যবহার,

৫। অতৎসম শব্দে ঈ/ঊ-কার বর্জন বা রক্ষণ,

৬। কি/কী- এর পার্থক্য,

৭। ঐ/ঔ-কারের স্থানে বিশ্লিষ্ট দ্বিস্বর ব্যবহার,

৮। অতৎসম শব্দে ণ ব্যবহার,

৯। /æ/ ধ্বনির লিপ্যন্তর,

১০। Z-এর উচ্চারণ বোঝাতে ज़ অক্ষর প্রয়োগ,

১১। মুদ্রণে আকাদেমি-প্রস্তাবিত স্বচ্ছ যুক্তাক্ষর ব্যবহার।

৭.৩ সমীক্ষার মূল নীতি

বাংলা ভাষা সামাজিক স্তরে যেখানে যেখানে দৃশ্যমান, প্রায় সমস্ত জায়গা থেকেই বঙ্গাক্ষরে লিখিত বাংলা বানান নিরীক্ষা করা যেতে পারে। ক্ষেত্রসমীক্ষা-ভিত্তিক বাস্তবে দৃশ্যমান বানানের পাশাপাশি পত্রপত্রিকা এবং ডিজিটাল মাধ্যমে ব্যবহৃত বানানের কথাও বর্তমান আলোচনায় বিবেচনা করা হয়েছে। প্রথমে ক্ষেত্রসমীক্ষার কথা বলা যাক।

৭.৩.১ ক্ষেত্রসমীক্ষার বিবরণ

আঞ্চলিক উপভাষা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের জন্য 'NORM'-নীতি অনুসরণ করা হয়। এখানে Non-mobile, Old, Rural, Male — এই চারটি শব্দের আদ্যক্ষর তথ্য সংগ্রহের আদর্শ উৎস সম্পর্কে প্রাথমিক একটি ধারণা দেয় (নাথ ১৫১)। বানানের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা বাঙালির লিখিত বাংলা বানান সমীক্ষায় ব্যবহার করেছি। অর্থাৎ, প্রথম শর্তটি লঙ্ঘিত হয়নি। লিখনের কালসীমা কোনো ক্ষেত্রে ৩০ বছরের পুরাতন নয়। রাস্তার হোর্ডিং, ব্যানার, মন্দিরগাত্রের প্রকাশ্য লিখন ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুতে ৩০ বছরের বেশি টিকে থাকবে না। অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি প্রণয়নের পর এই সমস্ত নিরীক্ষিত বানান লেখা হয়েছিল। তাই ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল নবদ্বীপ শহরের সামাজিক পরিসরে প্রকাশ্যে দৃশ্যমান বিবিধ বাংলা বানান (নবদ্বীপ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)। ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য বেছে নেওয়া এলাকাটি কলকাতা থেকে রেলপথে ন্যূনাধিক ১০৫ কিমি দূরে অবস্থিত। ফলে গ্রামীণ হওয়ার শর্তও পূরণ করেছে। সামাজিক পরিসরে দৃশ্যমান বানানের ক্ষেত্রে লেখকের লিঙ্গ-পরিচয় অপ্রাসঙ্গিক। ফলে পূর্বোক্ত 'NORM' শর্তাবলির একটি বাদে বাকি সবকটিই আলোচ্য সমীক্ষায় মেনে চলা হয়েছে।

নবদ্বীপ শহরের যে-সকল সামাজিক পরিসরের বানান বর্তমান অধ্যায়ে নিরীক্ষা করা হয়েছে, তাদের তালিকা নিম্নরূপ —

১। মন্দিরগাত্রের পরিচয়জ্ঞাপক ফলক ও স্মৃতিফলক

২। মন্দির ও আশ্রমের প্রাচীরে স্থায়ীভাবে লিখিত প্রচারমূলক ধর্মীয় বার্তা। মহাপুরুষের বাণী এবং বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিও এর অন্তর্গত।

৩। আসন্ন ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি

৪। মন্দির, আশ্রম-মঠ, ধর্মীয় প্রদর্শনী ইত্যাদির নিয়মাবলি ও নির্দেশিকা

৫। ধর্মীয় বিজ্ঞাপন, দানের আহ্বান, মন্দির-সেবকের পদে কর্মখালি, স্থানমাহাত্ম্য ইত্যাদি

৬। তিনটি বিদ্যালয়ের প্রাচীরলিখনে মহাপুরুষদের বাণী

৭। পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন দ্বারা প্রচারিত 'ঐতিহ্যশালী সম্পদ' চিহ্নক বোর্ড এবং স্থানিক পরিচয়

৮। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, নবদ্বীপ পৌরসভার তরফে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি

৯। ব্যাংকের বিজ্ঞপ্তি

১০। শহরের বিভিন্ন দোকানের নামফলক

১১। ডাক্তারখানা, মাল্টিজিম, কোচিং সেন্টার, বিদ্যালয়, তথ্য মিত্র কেন্দ্র ইত্যাদির বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন। এগুলি হোর্ডিং, ব্যানার এবং দেওয়াল-লিখন থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

উল্লিখিত বিবিধ সামাজিক পরিসর থেকে নবদ্বীপ শহরে সর্বমোট ২৮৪টি ছবি তোলা হয়েছে। বর্তমান গবেষক ১১ জুলাই, ২০২২ থেকে ৩০ জুলাই, ২০২২-এর মধ্যে ধাপে ধাপে এই ছবিগুলি তুলেছেন। তাদের মধ্যে নির্বাচিত কিছু ছবি বানানের দৃষ্টান্ত হিসাবে বর্তমান অধ্যায়ে ব্যবহার করা হয়েছে। ছবিগুলিতে সর্বমোট আনুমানিক ১০ হাজার শব্দের বানান নিরীক্ষা করা হয়েছে।

৭.৩.২ সাহিত্যিক নিদর্শন সমীক্ষার বিবরণ

ক্ষেত্রসমীক্ষার পাশাপাশি সাম্প্রতিক কালের মান্য কিছু পত্র-পত্রিকায় বাংলা বানানের নিদর্শন নিরীক্ষা করা হয়েছে। সমীক্ষার জন্য ২০১০-২২ কালসীমার মধ্যে প্রকাশিত যে-সব লেখা আমরা বেছে নিয়েছিলাম —

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* থেকে কল্যাণব্রত চক্রবর্তীর লেখা 'ভারতের মন্দির ভাস্কর্য — নব দৃষ্টিতে' (চক্রবর্তী ১২-২৪)

২। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত *আকাদেমি পত্রিকা* থেকে আবীর করের প্রবন্ধ 'সচিত্র বাংলা বর্ণমালা বৃত্তান্ত' (কর ৫৩-৭১)

৩। *অনুষ্টুপ* পত্রিকার 'বিশেষ বাংলা পুঁথি সংখ্যা ১৪২২'-এ প্রকাশিত 'পত্রিকার কথা', 'সম্পাদকীয়' এবং 'অতিথি সম্পাদকের নিবেদন' (আচার্য পৃষ্ঠাসংখ্যা অনুল্লিখিত)

৪। দৈনিক সংবাদপত্রের[১] মধ্যে দেখা হয়েছে: *আনন্দবাজার পত্রিকা*

৭.৩.৩ ডিজিটাল নমুনা সমীক্ষার বিবরণ

গত দু'দশকে প্রথাগত মুদ্রণের পাশাপাশি ডিজিটাল মাধ্যমে বাংলা ভাষার ব্যবহার ক্রমশ বেড়েছে। ব্লগ, ফেসবুক-টুইটারের মতো সামাজিক মাধ্যম, ই-পত্রিকা (ইজ়িন), ব্যক্তিগত ইমেল, বার্তালাপ, সরকারি-বেসরকারি ওয়েবসাইট ইত্যাদি বিবিধ ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা এখন ব্যবহৃত হচ্ছে। সেইসব জায়গায় কী ধরনের বাংলা বানান অনুসৃত হচ্ছে, তাও আমাদের আলোচ্য। বর্তমান সমীক্ষায় যে-সব ডিজিটাল উৎস থেকে বাংলা বানানের নমুনা চয়ন করা হয়েছে, সেগুলি হল —

১। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'Egiye Bangla' নামক দাপ্তরিক (official) ফেসবুক পৃষ্ঠা ("Egiye Bangla")। নমুনা সংগ্রহের কালসীমা: ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ থেকে ১৮ অক্টোবর, ২০২২।

২। কলকাতা পুলিশের দাপ্তরিক ফেসবুক পৃষ্ঠা ("Kolkata Police")। নমুনা সংগ্রহের কালসীমা: ১৯ জুলাই, ২০২২ থেকে ১৯ অক্টোবর, ২০২২।

৩। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের দাপ্তরিক ফেসবুক পৃষ্ঠা ("West Bengal Police")। নমুনা সংগ্রহের কালসীমা: ১ অক্টোবর, ২০২২ থেকে ১৯ অক্টোবর, ২০২২।

৪। ই-পত্রিকা 'পরবাস'-এর ১০টি সংখ্যার[২] সম্পাদকীয় ("পরবাস")

৫। বাংলা ওয়েব-পোর্টাল 'বাংলালাইভ ডট কম' ("Banglalive")। বানান নিরীক্ষার জন্য বিশেষ ক্রোড়পত্র 'শতবর্ষে বিশ্বভারতী'-র ৪টি প্রবন্ধ[৩] দেখা হয়েছে।

এই পাঁচটি ডিজিটাল সূত্র থেকে আনুমানিক ২৪৭৫০টি শব্দের বানান নিরীক্ষা করা হয়েছে।

৭.৪ তথ্য বিশ্লেষণ

সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলি চিত্র সহযোগে বিশ্লেষণ করার আগে, এ-কথা জানানো দরকার যে —

- বর্তমান গবেষণায় বেসরকারি তথা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, দোকান, পরিসেবা প্রদানকারী সংস্থা ইত্যাদির নামোল্লেখ (বা চিত্র ব্যবহার) কেবল শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এইসব সংস্থার প্রচার গবেষকের লক্ষ্য নয়।

---

[১] দৈনিক সংবাদপত্রগুলির ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিনের সংবাদের নমুনা আপতিকভাবে চয়ন করা হয়েছে। আলোচ্য কালসীমা লঙ্ঘন করা হয়নি। তবে প্রাসঙ্গিক বানানের নমুনা খুঁজে পাওয়ার জন্য কোনো নির্দিষ্ট তারিখের সংবাদপত্রে বর্তমান সমীক্ষা সীমাবদ্ধ থাকেনি।

[২] সংখ্যা ৭৯ (জুলাই ২০২০) থেকে সংখ্যা ৮৮ (অক্টোবর ২০২২) ("পরবাস")

[৩] পবিত্র সরকারের 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' (সরকার), সুশোভন অধিকারীর 'কলাভবন: প্রতিষ্ঠা ও বিবর্তন' (অধিকারী), অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বিশ্বভারতীতে শরীরচর্চার ঐতিহ্য' (মুখোপাধ্যায়), কুন্তল রুদ্রের 'বিশ্বভারতী: অঙ্কুর থেকে বৃক্ষ' (রুদ্র)।

- দোকানের নামফলকে কোথাও চল-ভাষ নম্বর বা ই-মেল আইডি উল্লেখ থাকলে, গোপনীয়তার স্বার্থে তা অস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।
- মন্দির বা আশ্রমের ক্ষেত্রে যেখানে ছবি তোলা নিষিদ্ধ, তা মান্য করা হয়েছে। কেবল অনুমোদিত স্থানের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে।
- সমীক্ষিত মুদ্রিত এবং ডিজিটাল উপাদানের বক্তব্যের সত্যাসত্য বিচারের দায় গবেষকের নয়। এখানে কেবল ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখাগুলির বানান নিরীক্ষা করা হয়েছে।

৭.৪.১ ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

নবদ্বীপ শহর থেকে সংগৃহীত বানানের নমুনার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ —

১। তৎসম শব্দে বিকল্পে সিদ্ধ ই/উ-যুক্ত বানানের যথেষ্ট সংখ্যক নমুনা পাওয়া যায়নি।

২। -ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ সমাসবদ্ধ হওয়ার নমুনাও অলভ্য।

৩। রেফের নীচে দ্বিত্ববর্ণের নমুনা (কীর্ত্তণীয়া, মূর্ত্তি, ধর্ম্ম, সার্ব্বজনীন, সংকীর্ত্তন, প্রবর্ত্তিত, পূর্ব্বক) কতিপয় পাওয়া গেছে। কীর্তন, কীর্তনীয়া, সংকীর্তন ইত্যাদি শব্দ — সম্ভবত ধর্মীয় গুরুত্বের কারণেই — প্রায় সর্বত্র পুরাতন বানানে লিখিত হয়েছে।

চিত্র ৭.১: 'কীর্ত্তন'-আদি শব্দে রেফের নীচে দ্বিত্বপ্রয়োগ

অন্যত্র মূর্তি, ধর্ম, দুর্দশা, দুর্দিন, পূর্বে, জর্জরিত ইত্যাদি বানানের সংখ্যাই বেশি। তবে রেফের নীচে র্য্য কতিপয় ক্ষেত্রে আশ্রম-প্রাচীরে লিখিত হয়েছে। উদা. কার্য্যকরী, ব্রহ্মচর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, আচার্য্য।

চিত্র ৭.২: রেফের নীচে দ্বিত্ববর্ণ রক্ষিত

চিত্র ৭.৩: রেফের নীচে দ্বিত্ববর্ণ বর্জিত (ভারত সেবাশ্রম সংঘ, নবদ্বীপের প্রাচীর-লিখন)

৪। সন্ধিযুক্ত শব্দের ক্ষেত্রে ক-বর্গের পূর্ববর্তী ঙ অনুস্বারে পরিণত হতে দেখা যায়নি। যেমন- সঙ্গম।

চিত্র ৭.৪: সন্ধিযুক্ত শব্দে অনুস্বার অব্যবহৃত

৫। বিশেষণ নির্মাণের ক্ষেত্রে -ঈ প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়েছে। উদা. অঙ্গনওয়াড়ী, শান্তিপুরী, পাইকারী, সরকারী, নামী-দামী, বেনারসী, ফ্যান্সী। বিশেষ্য শব্দের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা লক্ষণীয়। উদা. পাঞ্জাবী, লটারী, এজেন্সী, লাকী, মেশিনারী, কোম্পানী, বাড়ী, কিংবদন্তী, ফেব্রুয়ারী, গাড়ী। সমীক্ষিত নমুনায় সর্বত্র 'নদীয়া' বানান পাওয়া গেছে। আকাদেমি-সমর্থিত 'নদিয়া' বানান কোথাও ব্যবহৃত হতে আমরা দেখিনি। একাধিক ক্ষেত্রে 'তৈরী' বানান পাওয়া গেছে।

চিত্র ৭.৫: অতৎসম শব্দে দীর্ঘ ঈ-কার

৬। কি এবং কী-এর পার্থক্য কোথাও মেনে চলা হয়নি।

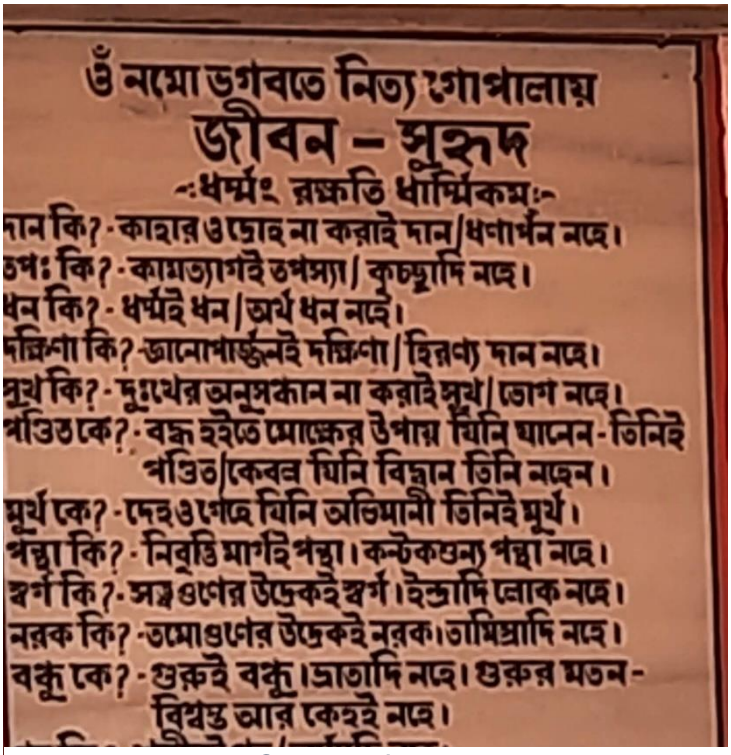

চিত্র ৭.৬ কি/কী-এর পার্থক্য

৭। দ্বিস্বরযুক্ত শব্দের ক্ষেত্রে 'বৌ বাজার' বানান সর্বত্র পাওয়া গেছে।

৮। আকাদেমি অসমর্থিত 'রাণী' বানানের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়নি। উদা. রাণীর ঘাট, রাধারাণী, আরতিরাণী। এক জায়গায় 'রানী' বানান পাওয়া গেছে। ইংরেজি শব্দে ণত্ব-বিধান মেনে একাধিক স্থানে 'মডার্ণ', 'কর্ণার', 'ফার্ণিচার' ইত্যাদি বানান লেখা হয়েছে। একজায়গায় মন্দিরের প্রবেশক নামফলকে 'সোণার গৌরাঙ্গ' বানান পাওয়া গেছে।

চিত্র ৭.৭: গণপরিসরে ণত্ব-বিধান

৯। গণপরিসরে /æ/ ধ্বনি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বিশেষ পাওয়া যায়নি। ফলে তার লিপ্যন্তর সম্পর্কিত বিতর্ক অমীমাংসিত রয়েছে।

১০। ज़ হরফের ব্যবহার কোথাও দেখা যায়নি।

১১। ঙ্ক (ব্যাঙ্ক, জলের ট্যাঙ্ক), ণ্ড (পণ্ডিত, মণ্ডল, সাউণ্ড, কুণ্ডু, ভাণ্ডার, বাসস্ট্যাণ্ড), ঙ্গ (গৌরাঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, সঙ্গিনী), ঞ্চ (শ্রীপঞ্চানন), ষ্ণ (কৃষ্ণ) ইত্যাদি 'অস্বচ্ছ' যুক্তাক্ষর দোকানের নামফলকে যথেচ্ছ ব্যবহৃত হচ্ছে। আকাদেমি প্রস্তাবিত ঙ্ক, ণ্ড, ঙ্গ, ঞ্চ, ষ্ণ ইত্যাদি 'স্বচ্ছ' যুক্তাক্ষর কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। তবে 'কুন্ডু' বানান একটি ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন দ্বারা প্রচারিত 'ঐতিহ্যশালী সম্পদ' চিহ্নক বোর্ডে 'রূপ', 'উদ্ধার' ইত্যাদি অস্বচ্ছ যুক্তাক্ষর এবং স্বরবর্ণের রূপ পাওয়া গেছে। লক্ষণীয়, কিছু কিছু বিদেশি শব্দেও ণ্ড ব্যবহৃত হচ্ছে।

চিত্র ৭.৮: 'অস্বচ্ছ' যুক্তাক্ষর

১২। ষ্টোর, স্টকিষ্ট, রেষ্টুরেন্ট, সিষ্টার । অবশ্য স্ট-যুক্ত বিদেশি শব্দও গণপরিসরে অপ্রতুল নয়। যেমন- ফাস্ট ট্যাগ, স্টুডিও, জিমন্যাস্টিক, পোস্টপেড ইত্যাদি।

১৩। নিছক ভুল বানানের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন- আকাঙ্খা, চশমা ঘড়, লক্ষী স্টোর, সংমিশ্রন, নথিভুক্তকরন, জনসাধারন, নূন্যতম, রাশপূর্ণিমা, পুত ('পূত' অর্থে), সত্ত্বর ('দ্রুত' অর্থে), অঞ্জলী, বধু, দণ্ডর্কারন্য, ধনুর্বান, উদ্দেশ্যে ('উদ্দেশে' অর্থে), পুতনা, শুভদ্রা ইত্যাদি।

চিত্র ৭.৯: গণপরিসরে ভুল বানান

১৪। কোনও, কোন দু'রকমের বানান পাওয়া গেছে।

চিত্র ৭.১০: কোনো/ কোনও বিকল্প বানানের স্বীকৃতি

১৫। ইংরেজি শব্দের ভুল লিপ্যন্তরণ কোথাও কোথাও দেখা গেছে। যেমন- কেটিং (knitting), এণ্ড (and), সন্ (son), কন্ট্রাক (contract)।

চিত্র ৭.১১: ভুল লিপ্যন্তরণ (কেটিং, কন্ট্রাক)

৭.৪.২ সাহিত্যিক নিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

৭.৩.২ উপ-অধ্যায়ে উল্লেখ-করা সাহিত্যিক নমুনাগুলিতে[৪] বানানের প্রবণতা নিম্নরূপ[৫] —

তৎসম শব্দে বিকল্পে সিদ্ধ ই-কার সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বিশেষ গ্রহণ করেনি। উদা. দৃশ্যাবলী (পৃ. ২০), শ্রেণী (পৃ. ১৭), পত্রাবলী, পেশী (পৃ. ২৩), যজ্ঞবেদী (পৃ. ১৫)। ইংরেজি শব্দের (এবং ব্যক্তিনামের) লিপ্যন্তরণে *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* আকদেমির নীতি প্রায়শই লঙ্ঘন করেছে। উদা. মুন্সী, পানিগ্রাহী, গাঙ্গুলী (পৃ. ১৩)। *আকাদেমি পত্রিকা*-তে উত্তরসূরী (পৃ. ৬১), শিকারী (পৃ. ৬১), পূর্বসূরী (পৃ. ৬৫), শ্রেণী (পৃ. ৭০) ইত্যাদি বানান পাওয়া গেলেও সামগ্রিক বানান-প্রবণতা বিকল্পে সিদ্ধ ই-কারের দিকে। অনুষ্টুপ[৬]-এ শুভঙ্করী (পৃ. ঙ), জমাবন্দী (পৃ. ঙ), জাপানী (পৃ. চ) ইত্যাদি কিছু ঈ-কারযুক্ত বানান পাওয়া গেলেও সেগুলি ব্যতিক্রম বলে ধর্তব্য। আবাপ[7] কিছু তৎসম শব্দে বিকল্পে সিদ্ধ ই-কার ব্যবহার করেছে। উদা. শ্রেণি, চিত্রাবলি, পেশি[৮], পদবি ইত্যাদি।

---

[৪] সা-প-প= সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, আ-প = আকাদেমি পত্রিকা, অনু = অনুষ্টুপ, আবাপ= আনন্দবাজার পত্রিকা

[৫] সব পত্রিকায় সমস্ত ধরনের নিয়মের উদাহরণ পাওয়া যায়নি। সেক্ষেত্রে সেই পত্রিকার নাম সংশ্লিষ্ট নিয়মের আলোচনায় অনুল্লিখিত রয়েছে।

[৬] *অনুষ্টুপ*-এর আলোচ্য লেখাত্রয়ের কোনো পৃষ্ঠাসংখ্যা পত্রিকার তরফে উল্লেখ করা হয়নি। আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে *পত্রিকার কথা* নামক লেখাটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ক ধরে নিয়ে বাকি লেখাগুলির পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়া হয়েছে।

[৭] *আনন্দবাজার পত্রিকার* বানান প্রবণতা বুঝে নেওয়ার জন্য *আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন* ওয়েবসাইটের (https://www.anandabazar.com/) অন্তর্গত সার্চ অপশন ব্যবহার করা হয়েছে।

[৮] ২০ নভেম্বর ২০২০ তারিখে কৃত অনুসন্ধানে 'পেশি' বানান ৮০টি এবং 'পেশী' বানান ২০টি পাওয়া গেছে। পরিসংখ্যানগতভাবে মূল প্রবণতা ই-কারের দিকেই।

তবে অনেক শব্দেই সিদ্ধ বিকল্পে হ্রস্ব-স্বরধ্বনি উপেক্ষিত রয়ে গেছে। নীচের সারণি থেকে আবাপ-তে বিকল্প বানানগুলির কোন্‌টি কতবার ব্যবহৃত হচ্ছে তার ঝলকদর্শন পাওয়া যাবে —

শব্দের বানান	২০/১১/২০২২ পর্যন্ত ব্যবহারের সংখ্যা
শ্রেণী	২
শ্রেণি	৫১২
পেশী	২০
পেশি	৮০
বেণী	১৩
বেণি	২
রজনী	৯৭
রজনি	১
তরী	৬৩
তরি	১০
ধমনী	১৪
ধমনি	২
ধরণী	১৬
ধরণি	০

সারণি ৭.১: আবাপ-তে বিকল্পে সিদ্ধ হ্রস্ব-স্বরধ্বনি ব্যবহারের প্রবণতা

২। -ইন্‌ প্রত্যয়ান্ত শব্দ সমাসবদ্ধ হলে *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* ই-কারযুক্ত বানান লেখেনি। যেমন: পরবর্তীকাল। *আকাদেমি পত্রিকা*তেও উপরি-উক্ত ক্ষেত্রে ই-কারের আগমন ঘটেনি। একাধিকবার ‘পরবর্তীকাল’ (পৃ. ৫৫) বানান পাওয়া গেছে। আবাপ কিন্তু আকাদেমির ছাড়পত্র থাকা সত্ত্বেও -ইন্‌ প্রত্যয়ান্ত শব্দে ঈ-কার ব্যবহারে অনিচ্ছুক। নীচে এই ধরনের শব্দ ব্যবহারের একটি হিসাব দেওয়া হল —

শব্দের বানান	২০/১১/২০২২ পর্যন্ত ব্যবহারের সংখ্যা
আগামীকাল	৮৪
আগামিকাল[৯]	৩৯০
মন্ত্রীসভা	২
মন্ত্রিসভা	৪৩৮
মন্ত্রীত্ব	৭
মন্ত্রিত্ব	১৫০

সারণি ৭.২: আবাপ-তে -ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের বানান

৩। রেফের নীচে দ্বিত্ববর্ণ তিনটি পত্রিকাতেই সম্পূর্ণ বর্জিত। বর্জিত। র্য বানান র্য্য দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়নি। যেমন —

সা-প-প: ভাস্কর্য (পৃ. ১২), পর্যবেক্ষণ, আশ্চর্য (পৃ. ১২)

আ: ভট্টাচার্য, পর্যন্ত

অনু: চর্যা (পৃ. গ), আর্যা (পৃ. ঙ), অবধার্য (পৃ. ঙ), আশ্চর্য (পৃ. ঙ), আর্যভট্ট (পৃ. জ)

আনন্দবাজার পত্রিকায় কোথাও রেফের নীচে ব্যঞ্জনদ্বিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় না।

৪। সন্ধিযুক্ত শব্দে ঙ-এর বিকল্পে অনুস্বার সা-প-প সাধারণত ব্যবহার করেননি। উদা. সঙ্গম (১৩), অলঙ্করণ (পৃ. ১৬) শঙ্করাচার্য (পৃ. ২০), ভয়ঙ্কর (পৃ. ২৩), অসঙ্গত (পৃ. ২৩)। ব্যতিক্রম — অলংকার (১৪), সংঘটক (পৃ. ১৪)। পক্ষান্তরে, *আকাদেমি পত্রিকায়* এই ধরনের শব্দে অনুস্বার-বিহীন বানান পাওয়া যায়নি। আবাপ সন্ধিযুক্ত শব্দে অনুস্বার ব্যবহারের নিয়ম মেনে নেয়নি। এই নিয়ম বস্তুত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধিতেও পাওয়া যায় — "যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ্ বিধেয়" (মজুমদার ১০২)। প্রায় ৮৫ বছর পরেও এই নিয়ম সাধারণ্যে স্বীকৃতি পায়নি। নীচের সারণিতে আবাপ-তে এই ধরনের শব্দ ব্যবহারের পরিসংখ্যান পেশ করা হল —

[৯] এখানে কাল (< কল্য) তদ্ভব শব্দ। তবু একটি তৎসম এবং একটি তদ্ভব শব্দের সমাসের ক্ষেত্রেও আবাপ ঈ-কার ব্যবহার করেনি।

শব্দের বানান	২০/১১/২০২২ পর্যন্ত ব্যবহারের সংখ্যা
ভয়ঙ্কর	১১৯৬
ভয়ংকর	২৫
অলঙ্কার	১৩৪
অলংকার	৫
সঙ্গীত	৭১১
সংগীত	৫০

সারণি ৭.৩: আবাপ-তে বিকল্পে সিদ্ধ অনুস্বার ব্যবহার

আবাপ-তে অনুস্বারযুক্ত বানান অল্প যে-কয়টি পাওয়া যাচ্ছে, তাদের মুদ্রণপ্রমাদ বা ব্যতিক্রম বলে গণ্য করাই শ্রেয়।

৫। অতৎসম শব্দে তিনটি পত্রিকাতেই দীর্ঘ স্বরচিহ্ন বর্জিত হয়েছে। সা-প-প বিদেশি ব্যক্তিনাম রোমক অক্ষরে মুদ্রিত করেছে। ফলে বিদেশি শব্দের উদাহরণ বেশি পাওয়া যায়নি। আকাদেমি পত্রিকায় এবং আবাপ-তে বিদেশি শব্দে দীর্ঘ স্বরধ্বনি প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়নি। যেমন —

সা-প-প: খ্রিস্ট (পৃ. ১২)

আ-প: খ্রিস্টাব্দ (পৃ. ৫৩), গোলাপি (পৃ. ৫৯), সিটি (পৃ. ৬০), সোসাইটি (পৃ. ৬০), হিন্দি (পৃ. ৬৯), ইংরাজি (পৃ. ৬৯), লাইব্রেরি (পৃ. ৬৯)

অনু: লাইব্রেরি (পৃ. খ), কেরি (পৃ. খ), সোসাইটি (পৃ. গ)

আবাপ: খ্রিস্ট, হিন্দি, লাইব্রেরি

৬। সা-প-প কী (পৃ. ১৬) এবং কি (পৃ. ১৬, ১৮, ২১) উভয় বানান ব্যবহার করেছে সর্বনাম হিসাবে। ‘কিভাবে’ (পৃ. ২১, ২২) বানানও পাওয়া যায়। তবে সংখ্যাগতভাবে ‘কি’-এর পরিমাণ বেশি। অন্যদিকে, আবাপ কি/কী সংক্রান্ত আকাদেমির নিয়ম মেনে নিয়েছে। তবে কিঞ্চিৎ গরমিল দেখা যায় আবাপ-তে ব্যবহৃত ‘এমনকী’ বানানে। ২০ নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ‘এমনকী’ এবং ‘এমনকি’ বানান আবাপ-তে ব্যবহৃত হয়েছে যথাক্রমে ২০৪৮ এবং ৯২২ বার।

৭। সা-প-প অতৎসম শব্দের বানানে দ্বিস্বর বিশ্লিষ্ট করে লেখার প্রবণতা দেখায়নি। তবে আকাদেমি পত্রিকায় ওই (পৃ. ৫৪, ৫৬) এবং ঐ (পৃ. ৫৫) উভয় বানান পাওয়া গেছে। আবাপ একদলীয় (monosyllabic) শব্দের ক্ষেত্রে দ্বিস্বরের বিশ্লিষ্ট রূপ ব্যবহার করেছে। উদা. বউ, মউ, দই। কিন্তু একাধিক দলযুক্ত শব্দে ঐ এবং ঔ-কার সাধারণত বজায় থেকেছে। নীচের সারণি দ্রষ্টব্য —

শব্দের বানান	২০/১১/২০২২ পর্যন্ত ব্যবহারের সংখ্যা
মৌমাছি	৪৩
মউমাছি	০
মৌলবি	১৯
মউলবি	০
পৈতে	৬
পইতে	০

সারণি ৭.৪: আবাপ-তে দ্বিস্বরের বানান

৮। অতৎসম শব্দে ণ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় পাওয়া যায় না। একই নিয়ম আকাদেমি পত্রিকাও মেনে চলেছে। উদা. ক্যালেন্ডার (পৃ. ৫৪), বাইন্ডিং (পৃ. ৬৩), ইন্ডিয়া (পৃ. ৬৬)। আবাপ-তেও অতৎসম শব্দে ণ বর্জিত হয়েছে। অতৎসম শব্দে ণ্ট, ণ্ড ইত্যাদি যুক্তাক্ষরের প্রয়োগ নগণ্য —

শব্দের বানান	২০/১১/২০২২ পর্যন্ত ব্যবহারের সংখ্যা
ঠাণ্ডা	৯৩
ঠান্ডা	১২৩৯
ঝাণ্ডা	১৫
ঝান্ডা	৯৮
লণ্ডভণ্ড	৫৫
লন্ডভন্ড	১৭২

সারণি ৭.৫: আবাপ-তে অতৎসম শব্দে ণ ব্যবহার

৯। /æ/ ধ্বনি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এ্যা-রূপে লিপ্যন্তরিত হয়েছে। উদা. এ্যামোনাইট (পৃ. ২০)। আকাদেমি পত্রিকায় এই বিষয়ে উপযুক্ত উদাহরণ পাওয়া যায়নি। *অনুষ্টুপ* অ্যা অক্ষর ব্যবহার করেছে। উদা. অ্যাকাডেমিক (পৃ. ক), অ্যালজেব্রা (পৃ. জ), অ্যাড্রিয়ান (পৃ. ড)। আবাপ /æ/ ধ্বনি অ্যা-রূপে লিখেছে। উদা. অ্যাসিড, অ্যান্টি ইত্যাদি বানান।

১০। সা-প-প থেকে জ় অক্ষরের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়নি। এমনকি, *আকাদেমি পত্রিকা*-তেও সম্ভাব্য ক্ষেত্রে জ় অক্ষরের ব্যবহার নজরে পড়েনি। বরং সিরিজ (পৃ. ৫৫), সাইজ (পৃ. ৬২) ইত্যাদি বানান পাওয়া যায়। *অনুষ্টুপ*ও জ় বর্জন করে 'সিজারিয়ান' (পৃ. ঙ), ম্যাগাজিন (পৃ. ঝ) ইত্যাদি বানান লিখেছে। আবাপ জ় অক্ষর নিয়মিতভাবে ব্যবহার করলেও এখনও বেশ কিছু ক্ষেত্রে z-এর উচ্চারণ বোঝাতে জ ব্যবহৃত হয় —

শব্দের বানান	২০/১১/২০২২ পর্যন্ত ব্যবহারের সংখ্যা
কুইজ	২০
কুইজ়	৭
ম্যাগাজিন	২৩৬
ম্যাগাজ়িন	৬
সিরিজ	২৩৫৭
সিরিজ়	১৬৯

সারণি ৭.৬: আবাপ-তে জ় ব্যবহার

দেখা যাচ্ছে, জ় নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হলেও z-এর লিপ্যন্তর হিসাবে জ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আবাপ-তে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১১। *আকাদেমি পত্রিকা* নিজেই আকাদেমির স্বচ্ছ অক্ষরপদ্ধতি অবলম্বন করে মুদ্রিত হয়নি। সা-প-প এবং অনুষ্টুপ স্বচ্ছ যুক্তাক্ষরের নীতি একইভাবে বর্জন করেছে। একই কথা আবাপ-র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৭.৪.৩ ডিজিটাল নিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

৭.৩.৩ উপ-অধ্যায়ে উল্লিখিত ডিজিটাল নমুনাগুলিতে আকাদেমি-প্রস্তাবিত বানানের নিয়ম মেনে চলার প্রবণতা নিম্নরূপ —

১। তৎসম শব্দে বিকল্পে সিদ্ধ হ্রস্ব-স্বরধ্বনি ব্যবহারের প্রবণতা অত্যন্ত কম। শ্রেণি, আবলি, রজনি ইত্যাদি অপ্রচলিত কিন্তু শুদ্ধ বানানের দেখা পাওয়া যায়নি। তবে কলকাতা পুলিশের ফেসবুক পোস্টে একাধিকবার ‘সরণি’ বানান পাওয়া গেছে।

২। -ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ সমাসবদ্ধ হওয়ার সময় ই-কার ব্যবহৃত হওয়ার পর্যাপ্ত সংখ্যক নমুনা পাওয়া যায়নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘এগিয়ে বাংলা’ ফেসবুক পৃষ্ঠায় ‘আগামীকাল’ এবং ‘আগামিকাল’ উভয় বানানই লিখিত হয়েছে।

৩। রেফের নীচে দ্বিত্ববর্ণ ডিজিটাল নমুনায় পাওয়া যায়নি।

৪। সমীক্ষিত নমুনায় ‘সংগীত’ এবং ‘সঙ্গীত’ বানান পাওয়া গেছে যথাক্রমে ৩ বার ও ৫ বার। ‘শঙ্কর’ বানান ৩ বার পাওয়া গেলেও ‘শংকর’ একবারও পাওয়া যায়নি।

৫। অতৎসম শব্দে ঈ-কার ব্যবহারের প্রবণতা কম। নৈহাটী, টীম-ওয়ার্ক ইত্যাদি কয়েকটি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে অতৎসম শব্দে মূলত ই-কার প্রাধান্য পেয়েছে।

৬। ডিজিটাল নমুনায় কি এবং কী-এর পার্থক্য বজায় থেকেছে। তবে আকাদেমি-প্রস্তাবিত 'এমনকি' বানানের বদলে 'এমনকী' বানান বাংলালাইভ ই-পত্রিকায় দু'বার পাওয়া গেছে।

৭। অতৎসম শব্দে দ্বিস্বরের বানান সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট সংখ্যক নমুনা পাওয়া যায়নি।

৮। অতৎসম শব্দে ণ প্রায় ব্যবহৃত হয়নি। উদা. স্টুডেন্ট, পেমেন্ট, সার্জেন্ট, ম্যানেজমেন্ট, ল্যান্ড, সেকেন্ড ইত্যাদি।

৯। /æ/ ধ্বনি বোঝানোর জন্য ডিজিটাল মাধ্যমে অ্যা সর্বজনীন স্বীকৃতি পেয়েছে। উদা. অ্যাপ, অ্যাকাউন্ট, অ্যান্ড, অ্যাওয়ার্ড ইত্যাদি। সমীক্ষিত নমুনায় কোথাও এ্যা অক্ষর পাওয়া যায়নি।

১০। ज़ অক্ষরের দৃষ্টান্ত কোথাও পাওয়া যায়নি।

১১। ডিজিটাল নমুনায় অক্ষরের স্বচ্ছতার প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক।

৭.৫ সিদ্ধান্ত

আকাদেমির বানান-বিধি মূলত দুটি নীতির ওপর স্থাপিত —

- বানানে বিকল্প পরিহার[১০]
- বাংলা বানানকে বাঙালির উচ্চারণের যথাসম্ভব কাছাকাছি নিয়ে আসা। অর্থাৎ, ব্যাকরণ উল্লঙ্ঘন না-করে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে হ্রস্ব স্বরধ্বনি ব্যবহার[১১], ঋ-৯ বর্জন, ণ-এর কম ব্যবহার ইত্যাদি

এই দুটি নীতি পরস্পরবিরোধী। বাঙালির উচ্চারণকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে আকাদেমি এমন কিছু বিকল্পে সিদ্ধ হ্রস্ব-স্বরযুক্ত বানানকে স্বীকৃতি দিয়েছে, যারা এতদিন পর্যন্ত অপ্রচলিত ছিল। ফলে বাংলা বানানের জগতে তৈরি হচ্ছে একদল নতুন বিকল্প বানানের সম্ভাবনা, যা পূর্বোক্ত প্রথম নীতির পরিপন্থী। বর্তমান অধ্যায়ের সমীক্ষায় এই সমস্যা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। ৭.৪.২ উপ-অধ্যায়ের পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়, শ্রেণি, পেশি ইত্যাদি বানান সাধারণ্যে যতটা স্বীকৃতি পেয়েছে; রজনি, ধরণি ইত্যাদি বানান সেই নিরিখে গৃহীত হয়নি। অথচ উভয় প্রকার বানান একই ব্যাকরণের নিয়মে বিকল্পে সিদ্ধ।

এই পরিস্থিতি থেকে ভবিষ্যতের বাংলা বানান নিম্নোক্ত যে-কোনো একটি অভিমুখে যেতে পারে —

সম্ভাবনা ১: আকাদেমি বানানবিধির গ্রহণযোগ্যতার সীমানা বাড়ল। এতদবধি অপ্রচলিত রজনি, তরি, ধরণি ইত্যাদি বানান ব্যবহৃত হতে লাগল। ক্রমশ এইসব শব্দের দীর্ঘ স্বরবর্ণযুক্ত বানানগুলির ব্যবহার কমে এল। আকাদেমির নির্বিকল্প 'এক শব্দ — এক বানান' নীতি সফল হল।

---

[১০] "কিন্তু এই অভিধানেই একেবারে নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বানান, যথাসম্ভব কম বিকল্প নিয়ে হাজির" (সরকার প্রমুখ "মুখবন্ধ," পৃষ্ঠাসংখ্যা অনুল্লিখিত)

[১১] "তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে যেখানে হ্রস্ব ই উ/ ই-কার উ-কার এবং দীর্ঘ ঈ ঊ/ ঈ-কার ঊ-কার দুটি রূপই প্রচলিত ও গৃহীত, সেখানে সাধারণভাবে হ্রস্ব বিকল্পটি গ্রহণীয়" (সরকার প্রমুখ ৫২১)

সম্ভাবনা ২: আকদেমির বানানবিধি প্রকাশের পর প্রায় ২৫ বছর অতিক্রান্ত। অদ্যাবধি যখন বিকল্পে সিদ্ধ হ্রস্ব স্বরবর্ণ সামাজিকভাবে গৃহীত হয়নি, ভবিষ্যতেও স্বীকৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা কম। বরং মুষ্টিমেয় কতগুলি তৎসম শব্দের হ্রস্ব স্বরবর্ণযুক্ত বিকল্প বানান প্রচলিত হওয়ার ফলে, বিকল্পহীন তৎসম শব্দের বানান সম্পর্কে বিভ্রান্তি বাড়তে থাকবে। 'তরি' বিকল্পে সিদ্ধ বানান; অথচ 'নদি' ভুল বানান — এই জটিলতা ভাষাতাত্ত্বিক নন এমন কাউকে বিভ্রান্ত করাই স্বাভাবিক। রজনি, অবনি ইত্যাদি বিকল্পে সিদ্ধ এবং অপ্রচলিত বানানের সাদৃশ্যে মেদিনি, বাহিনি ইত্যাদি বানানের প্রাদুর্ভাব ঘটবে। সামগ্রিকভাবে, বিকল্পহীন বাংলা বানান গড়ে তোলার স্বপ্ন দুরাশাই থেকে যাবে।

আমাদের মতে, এই দ্বিতীয় সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হতে চলেছে। এই অনুমানের পিছনে পূর্বদৃষ্টান্ত রয়েছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির ব্যর্থতা। বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের ১.৫.৫ উপ-অধ্যায়ে আলোচিত বানানের একটি নিয়মের দিকে ফিরে তাকানো যেতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধিতে সন্ধিযুক্ত শব্দে পদান্তে ম্-এর স্থানে (পরে ক খ গ ঘ থাকতে হবে) অনুস্বার লেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঙ এখানে বিকল্পে সিদ্ধ। অর্থাৎ, অহঙ্কার (অহম্ + কার) না লিখে অহংকার লেখার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষপাত। বাস্তবে অবশ্য এই নিয়ম চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সমকালীন, দেশ, প্রবাসী, সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* — প্রথম অধ্যায়ে সমীক্ষিত এই পাঁচটি ক্ষেত্রের কোথাওই পূর্বোক্ত সন্ধিজাত অনুস্বার ব্যবহার করা হয়নি (১.৫.৪ উপ-অধ্যায়ে প্রদর্শিত সারণির ২ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য)। আকাদেমি সমর্থিত হ্রস্ব স্বরযুক্ত বিকল্প বানানের পরিণতি কী হতে চলেছে, তা এই পূর্বদৃষ্টান্ত থেকে সহজে অনুমেয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সন্ধিযুক্ত শব্দে ম্-এর স্থানে অনুস্বার লেখার পক্ষপাতী আকাদেমিও। তবে এই বিষয়ে আকাদেমির নিয়ম — কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মের মতোই — ব্যর্থতায় পর্যবসিত। নবদ্বীপ শহরে এইসব ক্ষেত্রে অনুস্বার ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়নি। পত্রপত্রিকাতেও (সা-প-প, আবাপ) অনুস্বারযুক্ত বানান বর্জিত। ডিজিটাল নমুনায় অনুস্বারের বদলে ঙ-যুক্ত বানান প্রাধান্য পেয়েছে।

যে-সব ক্ষেত্রে আকাদেমির নিয়ম বিকল্প বা ব্যতিক্রমের জটিলতা এড়িয়ে যেতে পেরেছে, সেখানে অবশ্য কিঞ্চিদধিক সাফল্য পাওয়া গেছে। রেফের নীচে দ্বিত্ব-বর্জনের নিয়ম ১৯৫৬ সালে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। *প্রবাসী,* সা-প-প, *সমকালীন* ইত্যাদি তৎকালীন মান্য পত্রপত্রিকায় দ্বিত্ব বজায় ছিল। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি অন্যরকম। মুদ্রিত ক্ষেত্রে এবং ডিজিটাল লেখাপত্রে রেফের নীচে দ্বিত্ব সম্পূর্ণ বর্জিত। সা-প-প পূর্বের অভ্যাস থেকে সরে এসে রেফের নীচে দ্বিত্ব পরিত্যাগ করেছে। *অনুষ্টুপ, আকাদেমি পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা* ইত্যাদিও এক্ষেত্রে আকাদেমির নির্দেশ মেনে নিয়েছে। তবে নবদ্বীপে মন্দিরগাত্র এবং আশ্রমপ্রাচীরের লিখনে রেফের নীচে দ্বিত্ববর্ণ যথেষ্ট সংখ্যক পাওয়া গেছে। এইসব ক্ষেত্রে ব্যাকরণের নিয়মের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে প্রথাগত বানানের প্রতি ধর্মীয় আবেগ। নবদ্বীপে যা ধর্মীয় আবেগ, আনন্দবাজার পত্রিকার ক্ষেত্রে তা-ই সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধা। তার ফলে আকাদেমির অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও -ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ সমাসবদ্ধ হলে ঈ-কারযুক্ত বানান ব্যবহার করা হয়নি। পরিবর্তে মন্ত্রিত্ব, মন্ত্রিসভা ইত্যাদি বানান আনন্দবাজার পত্রিকা গ্রহণ করেছে। ডিজিটাল পরিসরে ব্যাকরণের আধিপত্য অনেক শিথিল হওয়া সত্ত্বেও 'আগামিকাল' বানান পাওয়া গেছে।

সংস্কৃত শব্দের বানান পরিবর্তনে গণমানসের সায় না থাকলেও, অতৎসম শব্দের বানানে হ্রস্ব-স্বরবর্ণের ব্যবহার পত্রপত্রিকা ও ডিজিটাল প্রকাশনায় প্রায় স্বীকৃতি লাভ করেছে। তবে নবদ্বীপে ক্ষেত্রসমীক্ষায় অতৎসম

বিশেষণে ঈ-কারের প্রাচুর্য আমরা লক্ষ করেছি। নবদ্বীপ শহর যে-জেলায় অবস্থিত, তার বানান আকাদেমি-মতে ‘নদিয়া’ হওয়া সত্ত্বেও; বাস্তবে সর্বত্র নদীয়া বানান আমরা লক্ষ করেছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জেলাভিত্তিক সরকারি ওয়েবসাইটেও (নদীয়া জেলা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার | বাংলার অক্সফোর্ড | ভারত) আকাদেমির বানান অনুসরণ করা হয়নি। পূর্বোক্ত তিনটি ক্ষেত্র বিচার-বিশ্লেষণ করে শেষপর্যন্ত মনে হয়, এখনও পর্যন্ত নির্বিকল্প বাংলা বানানের আদর্শ বাস্তবায়িত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বরং আকাদেমির বানানবিধি কিছু ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি বাড়িয়েছে। নির্বিকল্প বানানের আদর্শ নিকট ভবিষ্যতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম।

তথ্যসূত্র

"Banglalive." *Banglalive*, https://banglalive.com/visva-bharati/. Accessed 20 Oct. 2022.

"Egiye Bangla." *Facebook*, https://www.facebook.com/wb.gov.in/. Accessed 19 Oct. 2022.

"Kolkata Police." *Facebook*, https://www.facebook.com/kolkatapoliceforce. Accessed 19 Oct. 2022.

"West Bengal Police." *Facebook*, https://www.facebook.com/WBPolice. Accessed 19 Oct. 2022.

অধিকারী, সুশোভন. "কলাভবন: প্রতিষ্ঠা ও বিবর্তন." *Banglalive*, 24 Dec. 2021, https://banglalive.com/kala-bhavan-in-santiniketan/.

আচার্য, অনিল. "অনুষ্টুপ." অনুষ্টুপ (বিশেষ বাংলা পুঁথি সংখ্যা ১৪২২), ৪৯ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ২০১৫, পৃষ্ঠাসংখ্যা অনুল্লিখিত.

কর, আবীর. "সচিত্র বাংলা বর্ণমালা বৃত্তান্ত." আকাদেমি পত্রিকা, সম্পা. শাঁওলী মিত্র, খণ্ড ৪০, জানুয়ারি ২০১৮.

চক্রবর্তী, কল্যাণব্রত. "ভারতের মন্দিরে ভাস্কর্য — নব দৃষ্টিতে." *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, সম্পা. উৎপল ঝা, খণ্ড ১২১, সংখ্যা. ১-৪, ১৪২১ (প্রকাশিত: মাঘ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ).

নদীয়া জেলা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার | বাংলার অক্সফোর্ড | ভারত. https://nadia.gov.in/bn/. Accessed 30 Nov. 2022.

নবদ্বীপ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত. https://goo.gl/maps/UU1yDCyWyBqk2yZH7.

নাথ, মৃণাল. *ভাষা ও সমাজ*. নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৯.

"পরবাস." পরবাস — বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, https://www.parabaas.com/. Accessed 19 Oct. 2022.

মজুমদার, পরেশচন্দ্র. *বাঙলা বানান বিধি.* দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪.

মুখোপাধ্যায়, অশোককুমার. "বিশ্বভারতীতে শরীরচর্চার ঐতিহ্য." *Banglalive*, 26 Dec. 2021, https://banglalive.com/jujutsu-training-and-tagore/.

রুদ্র, কুন্তল. "বিশ্বভারতী: অঙ্কুর থেকে বৃক্ষ." *Banglalive*, 29 Dec. 2021, https://banglalive.com/viswabharati-foundation-day/.

সরকার, পবিত্র, প্রমুখ. আকাদেমি বানান অভিধান. চতুর্থ সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, নভেম্বর, ২০০৩.

---. "যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্." *Banglalive*, https://banglalive.com/the-ideal-called-viswa-bharati/. Accessed 11 Dec. 2022.

উপসংহার

এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভ শুরু হয়েছিল বাংলা বানান সংক্রান্ত একটি মৌল অস্বস্তির কথা বলে। একটি ভাষার বানান নির্দিষ্ট কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে রচিত হওয়া উচিত নয়। 'নিবেদন' অংশে সেই অস্বস্তির কথা বিস্তারে বলা হয়েছিল। তারপর একের পর এক সাতটি অধ্যায় জুড়ে দেখা গেল— অস্বস্তির রকমফের বিবিধ। বানানের প্রতর্ক কেবল ব্যাকরণগত আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকতে চাইছে না। তা চলে আসছে সমাজতত্ত্বের আঙিনায়। পণ্ডিতেরা বানানের নিয়ম তৈরি করছেন, বিখ্যাত সাহিত্যিকেরা তাতে মান্যতার সিলমোহর দিচ্ছেন। অথচ সমাজ সেই বানানবিধি প্রত্যাখ্যান করছে। বিদেশি শব্দের উচ্চারণ হুবহু প্রকাশের আত্যন্তিক তাগিদে বাংলা লিপিতে যথেচ্ছ নতুন বর্ণ সংযোজন করা হয়েছে। একেও এক ধরনের ঔপনিবেশিক হীনম্মন্যতা বলা যায়। ক্রিয়াপদের বানান বিষয়ে বানানবিধিগুলো প্রায় নীরব। বানান পরিবর্তনের সহসা উদ্যোগ প্রকাশকদের বাণিজ্যিক ক্ষতিসাধন করছে। বানান প্রণেতারা নিজেদের ব্যক্তিগত বানান-অভ্যাস পরিত্যাগ করছেন না। সরকারি নির্দেশে পাঠ্যপুস্তক একধরনের বানানে মুদ্রিত হচ্ছে। অথচ সরকারি বিজ্ঞপ্তি, সরকারি ওয়েবসাইট, সরকারি সামাজিক মাধ্যম ইত্যাদিতে সেই বানানবিধি উপেক্ষিত। আমাদের লক্ষ্য ছিল, এবম্বিধ বহুমুখী বানান-নৈরাজ্যের কারণ অনুসন্ধান এবং সম্ভব হলে সমাধানসূত্র নির্দেশ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা বানান যবে থেকে প্রমিত রূপ ধারণ করতে শুরু করেছে, তখনও বাংলায় আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান-চর্চা বিদ্যায়তনিক শাখা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভাষাচর্চা বলতে বোঝাত প্রথাগত ব্যাকরণ কিংবা সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে বাংলার ঐতিহাসিক-তুলনামূলক ব্যাকরণ সবে যাত্রা শুরু করেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে। এমতাবস্থায় একটি সামাজিক উপাদান হিসাবে ভাষাকে বিশ্লেষণ করা এবং প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম প্রণয়নের আশা সুদূরপ্রসারী ছিল। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ প্রণীত 'চ'ল্‌তি ভাষার বানান' (১৯২৫ খ্রি.) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির (১৯৩৬ খ্রি.) মূল সমস্যা ব্যাকরণগত নয়, বরং একটি সুসংহত ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। তৎসম শব্দের বানানে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত শব্দের বানান পালটাতে চেয়েছে (উপ-অধ্যায় ৫.৫ দ্রষ্টব্য), অজস্র ব্যতিক্রম এই বানানবিধিতে স্থান পেয়েছে, নির্ধারিত বানানের প্রয়োগক্ষেত্র সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো গণ্ডি টেনে দেওয়া হয়নি। এই বানান কি কেবলই শিক্ষার্থীদের জন্য? ধ্রুপদি বাংলা সাহিত্য কি নতুন বানানে মুদ্রিত হবে? মধ্যযুগের পুথি সম্পাদনার ক্ষেত্রে কী করণীয়? সাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত বানান-অভ্যাস সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিমত কী? এইরকম আরও অজস্র প্রশ্নের কোনো সদুত্তর এই বানানবিধিতে পাওয়া যায় না। ফলে এই বানানবিধির সর্বজনমান্যতা আদৌ তৈরি হয়নি। প্রথম অধ্যায়ে একটি সমীক্ষার মাধ্যমে এই বক্তব্যের পরিসংখ্যানগত প্রমাণ দেওয়া হয়েছে।

এইসব ভুল সংশোধনের সুযোগ ছিল পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির কাছে। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে যখন আকাদেমির বানান সংক্রান্ত সুপারিশপত্র প্রকাশিত হচ্ছে ততদিনে বাংলায় আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান-চর্চা পুরোদস্তুর শুরু হয়ে গেছে। সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের বিবিধ তত্ত্বও বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব সহকারে অধীত হচ্ছে। অথচ আকাদেমি এই নব-আবিষ্কৃত জ্ঞানমার্গের সুবিধা নিতে পারল না। ঠিক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই প্রথাগত ব্যাকরণের ওপর ভিত্তি করে বানানবিধি নির্মাণ করতে চাইল। তার চেয়েও বিপজ্জনক — আপতিকভাবে প্রথাগত

ব্যাকরণের কিছু নিয়মকেও লঙ্ঘন করল। স্পষ্টত, আকাদেমির বানানবিধি সুদৃঢ় ব্যাকরণের ভিত্তির ওপর স্থাপিত নয়। ফলে একে সর্বজনমান্য করে তোলার তাগিদে আকাদেমির তরফে হঠকারী কিছু পদক্ষেপ করা হয়। সরকারি নির্দেশমাফিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে বাধ্যতামূলকভাবে আকাদেমির বানান ও 'স্বচ্ছ' হরফ প্রচলন সাধারণ বাংলাভাষীকে আকাদেমি-বিরূপ করে তোলে। এই বানানবিধিও — কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির মতোই — ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বর্তমান অভিসন্দর্ভের সপ্তম অধ্যায়ে তার বিস্তারিত প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। বর্তমানে আকাদেমির বানানবিধির প্রণেতারা নিজেই এই বিধি পরিত্যাগ করে নিজের নিজের ব্যক্তিগত বানানে ফিরে গেছেন। তথাকথিত 'স্বচ্ছ' হরফ এমনকি *আকাদেমি পত্রিকা*-তেও দেখা যাচ্ছে না। কেবল সরকারি নিয়মের বাধ্যতায় পাঠ্যপুস্তকে আকাদেমির বানান ব্যতিরেকে যাবতীয় শুদ্ধ বানান ও হরফ এখনও ব্রাত্য!

অতঃ কিম্? আকাদেমির বানানবিধির ব্যর্থতার পর কিছু প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। বানান প্রমিতকরণের প্রয়াস তাহলে কি পণ্ডশ্রম মাত্র? ভবিষ্যতে বাংলা বানান নিয়মানুগ করার সমবেত প্রয়াস কোন্ অভিমুখে এগোবে? বর্তমান গবেষণা-অভিসন্দর্ভে প্রস্তাবিত বানানের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের তত্ত্ব এইসব প্রশ্নের ভাষাবিজ্ঞানসম্মত উত্তর দিতে পারে। আমাদের বিনম্র অভিমত, নতুন কোনো বানানবিধি প্রণয়নের আগে (কিংবা আকাদেমির বানানবিধি হালনাগাদ করার আগে) বানান পরিবর্তনের সামাজিক প্রভাব অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত। সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে একটি বানানবিধি প্রযুক্ত হয়। সেটি বাদ দিয়ে কেবল ব্যাকরণের যুক্তি কিংবা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণায় জনগণের বানান-অভ্যাস পালটানো যাবে না। পূর্ববর্তী বানানবিধিগুলির ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে —

১। নির্বিকল্প বানানের আদর্শ পরিত্যাজ্য। নির্ভুল বানান হতে পারে, কিন্তু নির্বিকল্প বানান হয় না। ভাষার ধ্বনি, রূপ, অন্বয়, বাগর্থ, শৈলী ইত্যাদি প্রত্যেক স্তরেই বিকল্প থাকে। ভাষার দৃশ্যমান বহিঃপ্রকাশ বানানের ক্ষেত্রেও বিকল্পের উপস্থিতি অনিবার্য। 'এক শব্দ — এক বানান' -এর কল্পিত ভাষাতাত্ত্বিক আদর্শ বাস্তবে পাওয়া যায় না।

২। ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ বানান কোনোভাবেই 'ভুল' আখ্যা পাবে না। ছন্দোগুরু, চক্ষূরোগ, সম্রাট্ ইত্যাদি বানান ব্যবহার করবেন কি না, তা ব্যক্তিবিশেষের পছন্দের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু আকাদেমি-গোত্রের কোনো সংস্থা তৎসম শব্দের শুদ্ধ বানান পরিত্যাজ্য বা অচলিত বলে দেগে না দেওয়াই শ্রেয়।

৩। কিছু দীর্ঘ ঈ বা দীর্ঘ ঊ-কার হ্রস্ব করে দিলে শিশুশিক্ষা সহজ হয়ে যায় না। শিশুর ভাষা আয়ত্ত করা এবং শেখার (acquiring and learning) ক্ষমতা বিবিধ সামাজিক উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সমাজ-বিবিক্ত বানানের নিয়ম শিশুর ভাষাশিক্ষা সহজ করে দিতে পারে না। একটি ভাষার বানান কেবল শিশুর বা বিদেশিদের শেখার সুবিধার কথা ভেবে রচিত হতে পারে না। তাতে আবার প্রাপ্তবয়স্ক ও শিক্ষিত ভাষা-ব্যবহারকারীর অসুবিধা হতে পারে। 'বর্ধমান' বানানের সাদৃশ্যে 'বুদ্ধিমান্'-এর হস্-চিহ্ন লোপ করলে শিশুর সুবিধা হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদিভাবে শানচ্ এবং মতুপ্ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দের বানানে পার্থক্য বজায় রাখা উচিত। নচেৎ প্রাপ্তবয়স্কের বিভ্রান্তি বাড়ে।

৪। বাংলা বানান ও বাংলা লিপির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। রোমক লিপি, আরবি লিপি, ভারতি লিপি ইত্যাদিতে বাংলা লেখার প্রয়াস বাঙালিকে সহস্র বছরের ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত করে। তা ছাড়া, লিপির পরিবর্তন

আবশ্যিকভাবে বানান পরিবর্তন ঘটায়। যুক্তাক্ষরের আকৃতি অল্পবিস্তর পরিবর্তন করে স্বচ্ছ করা যেতে পারে। কিন্তু লিপির আমূল পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। বিদেশি উচ্চারণ নির্ভুলভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে বাংলা বর্ণমালায় যথেচ্ছ নতুন অক্ষর সংযোজন না করাই শ্রেয়।

৫। মুদ্রণ-প্রযুক্তির সুবিধার কথা ভেবে বাংলা বানানবিধি রচিত হবে না। প্রযুক্তি ক্ষণস্থায়ী — ব্যাকরণ চিরায়ত। ব্যাকরণের উপযুক্ত প্রযুক্তি নির্মাণ করতে হবে। লাইনোটাইপ, মনোটাইপ, কম্পিউটারে মুদ্রণ ইত্যাদির নিরিখে বাংলা বানান স্বধর্ম পালটে ফেলবে না।

৬। রাষ্ট্রক্ষমতা, বানানবিধি প্রণয়নকারী সংস্থা এবং শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট হতে হবে। প্রত্যেকের অধিকারের সীমারেখা পৃথক। পাঠ্যপুস্তক নির্ভুল বানানে মুদ্রিত হওয়া উচিত। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সংস্থার বানান ও হরফ ব্যতিরেকে বাকি সমস্ত বানান ও হরফ পরিত্যাজ্য —এই নির্দেশ দেওয়ার অধিকার রাষ্ট্রের নেই।

৭। বাংলা বানানের বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যুৎপত্তি এবং ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। কিছু বানান ব্যুৎপত্তি অনুসারে হবে, কিছু আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে। সামাজিক স্তরে গ্রহণযোগ্যতার খাতিরে এই দ্বন্দ্ব মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

৮। ধ্রুপদি সাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত বানান অভ্যাস বজায় রাখতে হবে। পরবর্তীকালে রচিত বানানের নিয়ম পূর্ববর্তী লেখার ওপর প্রযুক্ত হতে পারে না। সমতাবিধান পাঠ্যপুস্তকের আদর্শ হিসাবে মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু বইয়ের পুনর্মুদ্রণ, রচনাবলি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অসমতা বজায় রাখলেই বরং ইতিহাস রক্ষা হয়।

৯। বাংলা বানান কেবল পশ্চিমবঙ্গের একার বিবেচ্য বিষয় নয়। ত্রিপুরা, অসম, মেঘালয়, দিল্লি, ঝাড়খণ্ড ইত্যাদি স্থানের বাঙালি এবং প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে সমবেতভাবে ভারতের বাংলা ভাষার বানান নির্ধারণ করতে হবে। সম্ভব হলে বাংলাদেশকেও এই উদ্যোগে সামিল করতে হবে।

১০। প্রণীত বানানবিধি নিয়মিত ব্যবধানে হালনাগাদ করার ব্যবস্থা করতে হবে। বানানবিধির দুটি সংস্করণের মধ্যবর্তী সময়ে প্রকাশ্য বিতর্ক, আলোচনাসভা, বিশেষজ্ঞদের মতামতগ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে বানানবিধির যৌক্তিক যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির তিনটি সংস্করণ স্বল্প সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়েছিল। গত ১৫ বছরে আকাদেমির বানানবিধির নতুন সংস্করণ আর প্রকাশিত হয়নি। বানান-সংস্কারে এই ধরনের বিশৃঙ্খলার ফলে বানানবিধির প্রামাণিকতা হ্রাস পায়।

বানান প্রণেতাদের অনেক সময়তেই একটি নিহিত উদ্দেশ্য থাকে। আপাতভাবে তাঁরা শিশুশিক্ষার সুবিধা কিংবা ‘বানান-নৈরাজ্যের অবসান’ গোত্রের কোনো যুক্তি দেখান। কিন্তু বস্তুত ব্যাকরণের বাইরে অন্য কোনো উদ্দেশ্য কাজ করে। জন মারডকের ক্ষেত্রে সেই উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের জন্য বাংলাশিক্ষা সহজসাধ্য করে তোলা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েছিল অতৎসম শব্দের বানান নিয়মানুগ করতে, আনন্দবাজার পত্রিকা ষাটের দশকে এবং জগন্নাথ চক্রবর্তী আশির দশকে মুদ্রণ-প্রযুক্তির নিরিখে বাংলা বানান বদলাতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে আবার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ‘এক শব্দ — এক বানান’ নামক কল্পিত ভাষাতাত্ত্বিক আদর্শের দিকে ধাবমান।

বানান বিষয়ক প্রতর্ক শুরু করার আগে কোনো নির্দিষ্ট শব্দের বানান পরিবর্তনের আদৌ প্রয়োজন আছে কি না, সেই প্রশ্নটিও খতিয়ে দেখা উচিত।

বর্তমান গবেষণা-অভিসন্দর্ভ বাংলা বানানের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে। বানান-নিয়ন্ত্রক নির্দিষ্ট কিছু সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদান আমরা চিহ্নিত করেছি। এর বাইরেও বিবিধ বানান-নিয়ন্ত্রক উপাদান থাকা সম্ভব। কোন্ কোন্ উপাদানের প্রভাবে একটি বানানবিধি সফল বা ব্যর্থ হচ্ছে, তা প্রথম এবং সপ্তম অধ্যায়ে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে। আমাদের ধারণা, এই ক্ষেত্রসমীক্ষার পরিধি যদি আরও বৃদ্ধি করা যায়, তাহলে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বানানের তত্ত্বের নতুন দিক উন্মোচিত হতে পারে। বিশেষত, প্রমিত বাংলা যে-সব জায়গার আঞ্চলিক উপভাষা নয়, সেখানে সাধারণ্যে ব্যবহৃত বানান নিরীক্ষা করা দরকার।

শেষ পর্যায়ে এই গবেষণার অন্তত দুটি সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা দরকার। সপ্তম অধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধির প্রায়োগিক গ্রহণযোগ্যতা ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে খতিয়ে দেখা হয়েছে। এই বানানবিধি এবং তৎসংলগ্ন লিপি-সংস্কারের নিয়মাবলি যে প্রধানত ব্যর্থ হয়েছে, তা আমরা দেখেছি। এই ক্ষেত্রসমীক্ষা আরেকটু বিস্তারিত আকারে করা যেতে পারত। বিশেষত, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরার কয়েকটি বিদ্যালয়ে সমীক্ষা চালিয়ে আকাদেমি বানানবিধির গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করার পরিকল্পনা আমাদের ছিল। তবে পরিকাঠামোগত অসুবিধার কারণে শেষপর্যন্ত বিদ্যালয়স্তরে ক্ষেত্রসমীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। আরেকটি অসম্পূর্ণতার কথা বলা দরকার। ডিজিটাল নমুনা সমীক্ষায় 'কর্পাস লিঙ্গুইসটিক্স'-এর প্রয়োগপদ্ধতি অবলম্বন করার কথা আমরা প্রাথমিকভাবে ভেবেছিলাম। কিন্তু ইংরেজি বা ইউরোপীয় ভাষাগুলির ক্ষেত্রে বৃহদায়তন কর্পাস (শব্দসম্ভার) সহজলভ্য। বাংলায় সাম্প্রতিককালের সে-রকম কোনো নির্ভরযোগ্য শব্দসম্ভারের সন্ধান আমরা পাইনি। ফলে বাধ্যত ডিজিটাল নমুনা সমীক্ষায় নিরীক্ষিত শব্দের সংখ্যা স্বল্পায়তন রাখতে হয়েছে।

এই ধরনের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, বাংলা বানানকে একটি সমাজ-ভাষাতাত্ত্বিক ঘটনা হিসাবে ব্যাখ্যা করা জরুরি ছিল। বাংলায় অতীতে বেশ কিছু বানানবিধি নির্মিত হয়েছে। ভবিষ্যতেও নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বানান ব্যাখ্যাত না হওয়ার ফলে এইসব বানানবিধি সর্বজনমান্য হয়ে উঠতে পারেনি। সময়, শ্রম আর অর্থের অপব্যয় ঠেকাতে হলে পূর্বোক্ত দশটি নীতি মাথায় রেখে ভবিষ্যতের বানানবিধি প্রণয়ন করতে হবে। বানান প্রমিতায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। আধুনিক বানানবিধি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানকে পরিহার করে কেবল প্রথাগত ব্যাকরণের যুক্তিতে নির্মাণ করলে তা স্বীকৃতি পাবে না। সরকারি নির্দেশে রাতারাতি জনগণের বানান-অভ্যাস বদলানো সম্ভব নয়। কামাল আতাতুর্কের পথে না হেঁটে সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে প্রমিতকরণে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়।

পরিশিষ্ট ১: অধ্যাপক পবিত্র সরকারের সাক্ষাৎকার

স্থান: পাটুলি, কলকাতা

সময়: ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৯

প্রশ্ন: প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য বানানের সমতাবিধান জরুরি। কিন্তু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিণতবয়স্ক শিক্ষার্থী কিংবা স্বাধীনভাবে যাঁরা বাংলা ভাষায় লেখালিখি করছেন, তাঁরাও কি প্রমিত বাংলা বানান ব্যবহার করবেন?

উত্তর: একটা দেশের ভাষার সম্মান তৈরি হয়, তার লিখিত রূপ থাকলে। তারই সঙ্গে শব্দগুলির লিখিত রূপের বানান নির্দিষ্ট করা হয়। একে ল্যাংগুয়েজ স্টান্ডার্ডাইজেশন বলে। এই প্রমাণীকরণ বা মান্যীকরণের মূল নীতি হচ্ছে— এক শব্দের এক বানান হবে। সেটা প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের যেমন বলা হবে, তেমনি বড়োদেরও বলা হবে যে, আপনারা এক শব্দের এক বানান লিখুন। না হলে সত্যিসত্যিই ভাষার, বিশেষ করে লিখিত রূপের, কোনো মর্যাদা দাঁড়ায় না। ফলে এটা প্রত্যাশিত যে, সকলে এক বানান লিখবেন। সেটা ছোটোদের ক্ষেত্রেও হোক, বড়োদের ক্ষেত্রেও হোক। প্রথম শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেও হোক, আবার পরিণতবয়স্ক শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও হোক। আস্তে আস্তে তাহলে নানারকম বিকল্পের বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে। কিন্তু এর সমস্যাটা আমি বুঝতে পারছি। ঐতিহাসিক সমস্যা হচ্ছে — আগে তো অনেকরকম বানান ছিল: শুদ্ধ বানান, ভুল বানান ইত্যাদি। শুদ্ধ বানানেরও অনেক রকম চেহারা ছিল। ফলে আগে যে বইগুলো ছাপা হয়েছে, সেই বইগুলোতে অন্যরকম বানান থাকবে। বয়স্করা আগের শুদ্ধ বানানে অভ্যস্ত। সেই শুদ্ধ বানানগুলো এখন সংস্কার করা হচ্ছে সমতাবিধানের জন্য। বয়স্কদের ক্ষেত্রে একটু একটু সমস্যা আছে। ছোটোদের ক্ষেত্রে তত সমস্যা নয়। তাদের বলা হবে, তোমরা এক শব্দের এক বানান শিখবে। কিন্তু প্রস্তুত থাকো যে, পুরোনো ছাপা বই বা হাতের লেখায় অনেকরকম বানান দেখবে। বয়স্কদের সেটা বলা একটু মুশকিল। কারণ, তাঁদের অনেকের নিজেদের মতামত তৈরি হয়েছে। একটা স্বাভাবিক অহংবোধ থেকে তাঁরা বলতেই পারেন, 'আমরা এতদিন এই বানান লিখে এসেছি, সেটা কেন বদলাব! যুক্তি দাও!' যুক্তি তৈরি করার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সকলে যে মানেন, তা নয়। কিন্তু অনেকসময় দেখা গেছে, বয়স্করাও আগের ছত্রে এক বানান লিখছেন, পরের ছত্রে আরেক বানান লিখছেন। আমরা যারা বানান নিয়ে কারিগরের কাজকর্ম করি, আমরা বলি, আপনি যা-ই লিখুন, একরকম লিখুন। এক শব্দের এক বানান — এই নীতি অনুসরণ করুন।

প্রশ্ন: দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরও আপনি অনেকটা দিয়ে দিলেন। বই পুনর্মুদ্রণ বিষয়টিই আরেকটু এগিয়ে বলা যায়, বইয়ের সঙ্গে আমাদের পুথিরও সুদীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। সেগুলো যখন পুনর্মুদ্রণ করা হবে, সেক্ষেত্রে কীরকম বানান অবলম্বন করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর: পুথির ব্যাপরটা আলাদা। পুথি মূলত গবেষকের বিষয়। পুথির যুগের ভাষা এখন আর আমরা ব্যবহার করি না। পুথি মূলে যেভাবে লেখা ছিল, গবেষকের জন্য সেভাবেই হয়তো পরিবেশন করা দরকার। কিন্তু আরেক ধরনের বই আছে — যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের বা বিদ্যাসাগরের বই। তুমি যদি পাঠকদের জন্য ছাপো,

গবেষণার জন্য নয় — পড়ার জন্য, তখন আমার মতে আধুনিক বানানে পরিবেশন করাই ভালো। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনাবলি করা হয়েছে। তখন সত্যজিৎ চৌধুরী আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, কোন্ বানানে ছাপব? আমি বললাম, আধুনিক বানানে ছাপুন। কারণ, আপনার আদর্শ হচ্ছে পাঠকের কাছে পৌঁছানো। শুধু গবেষকদের জন্য নয়। গবেষকদের জন্য পুরোনো সংস্করণ থাকতেই পারে।

প্রশ্ন: যে-সব লেখকের নিজস্ব বানানবিধি রয়েছে, যেমন বুদ্ধদেব বসু বা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, তাঁদের ক্ষেত্রেও কি একই কথা প্রযোজ্য?

উত্তর: আমার মতে, আমরা যদি একটু উদার হই শিশুদের কথা ভেবে, নিজস্বতার অহংকার ত্যাগ করাই ভালো। এই নিয়ে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে, এখনও ক্ষতি হয়ে চলেছে। খবরের কাগজগুলো একেকরকম বানানে খবর ছাপে। তাতে শিশুরা বিভ্রান্ত হয়। বড়োরাও বিভ্রান্ত হয়।

প্রশ্ন: মাইকেল ক্লসের স্টেটাস প্ল্যানিং এবং কর্পাস প্ল্যানিং-এর তত্ত্ব আপনি 'ভাষা দেশ কাল' বইতে আলোচনা করেছিলেন। এই দুটির জন্যই তো সরকারের তরফে উদ্যোগ করা আবশ্যক। বর্তমান সময়ে এই উদ্যোগ কতটা সফলভাবে গৃহীত হয়েছে বলে আপনার ধারণা?

উত্তর: স্টেটাস প্ল্যানিং মূলত সরকারি উদ্যোগে হয়। একটা ভাষাকে কী ভূমিকা দেওয়া হবে? সেটা প্রশাসনের বা শিক্ষার ভাষা হবে কি না, সেটা সরকারই ঠিক করে। যখনই প্রশাসন বা শিক্ষার ভাষা হয়, তখন তাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করে। একটি ভাষায় শব্দের সংখ্যা বাড়ানো, পরিভাষা নির্মাণ, বানাননীতি নির্ধারণ, ব্যাকরণ তৈরি — এগুলো হচ্ছে কর্পাস প্ল্যানিং, ক্লস যেটা বলেছেন। যখনই তুমি একটা ভাষার লিখিত রূপের মান্যীকরণ বা স্টান্ডার্ডাইজ়েশনের চেষ্টা করবে, তখন কাকে মানব কে বলবে? কার কথা আমরা শুনব? কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেয়ম্! তখন সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় — এরকম একটা প্রতিষ্ঠান থেকে সেটা বলা হলে ভালো হয়। আমাদের সমস্যা হচ্ছে, আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন একা ছিল প্রায় — একটিমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় — তখন তার যে মান্যতা ছিল, এখন তা নেই। বা সেখানে যাঁরা আছেন, তাঁদের কথা আমরা মানবার জন্য প্রস্তুত কি না, সেটা নিয়েও বাঙালিকে ভাবতে হবে। সরকার দেখছি এখন সেরকম কোনো উদ্যোগ নিচ্ছেন না। পশ্চিমবাংলা সরকার সেরকম কোনো উদ্যোগ নিচ্ছেন না। আগের সরকার নিয়েছেন। আগের সরকারের আমলেই যা কিছু কাজ হয়েছে। এখনকার সরকার বা তাঁদের পোষিত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সে ধরনের কোনো উদ্যোগ নিচ্ছেন না। কিন্তু বাংলাদেশে বাংলা একাডেমি ঢাকার মান্যতা প্রায় সর্বাঙ্গীণ। যদিও 'প্রথম আলো' গোছের কাগজ নিজেদের একটা বানাননীতি তৈরি করেছে। তবুও আমি বলব, ১৯৮০-এর পরে পিটিএস প্রযুক্তি আসার পর থেকে দুই বাংলার বানানের সমতাবিধানের ক্ষেত্রে অনেকটা এগোনো গেছে। হয়তো শতকরা ৯৫ ভাগ আমরা একরকম লিখি। ৫ ভাগ একটু অন্যরকম হয়। সেই অগ্রগতি হয়েছে। কোথাও আর বাড়ি বানান ঈ-কার দিয়ে লেখা হয় না। সেটা পুরোনো শিক্ষকদের, পুরোনো মানুষদের অভ্যেসে আছে। কিন্তু খবরের কাগজে বা ছাপা বইয়ে তুমি খুব কম দেখবে বাড়ি, শাড়ি, গাড়ি, বাঁশি এইসব শব্দ ঈ-কার দিয়ে লেখা হচ্ছে। পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ, শিলচর এইসমস্ত জায়গায় এটা লক্ষ করি। এমনকি যেখানে প্রবাসী বাঙালিরা আছেন, তাঁরাও যে কাগজপত্র বার করেন, চেষ্টা করেন।

প্রশ্ন: অসমে আমি দেখেছি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানই মোটামুটি অনুসৃত হয়।

উত্তর: অসমে তো শিলচরে আমি বানানের কর্মশালা করিয়েছি।

প্রশ্ন: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানান অভিধানের সঙ্গে আপনি সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আবার পরবর্তীকালে আপনি নিজেই একটি অভিধান প্রণয়ন করলেন 'বানান বিবেচনা' নামে। প্রচ্ছদে উল্লেখ রয়েছে সেটি 'অভিনব অভিধান'। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানের কিছু সীমাবদ্ধতা কি তাহলে আপনার নজরে পড়েছিল, যার জন্য অন্য একটি অভিধান প্রণয়নের আপনি প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন?

উত্তর: সীমাবদ্ধতা তো কিছুটা ছিলই। অনেক শব্দ ছিল না। 'বানান বিবেচনা'র পরেও কিন্তু আমার একটা বানান অভিধান বেরিয়েছে। 'ব্যবহারিক বানান অভিধান' নামে লতিকা প্রকাশনী থেকে বার করেছে। সীমাবদ্ধতা মানে সংখ্যার সীমাবদ্ধতা। অর্থাৎ, যে-সব বানানগুলো যাওয়া উচিত ছিল, সব যায়নি। এটা আমাকে তখনকার সভাপতি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেছিলেন, আরও কিছু শব্দ দেওয়া দরকার। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সেই বানান অভিধানটি এখন আর ছাপছেন না। তার ফলে তার একটা চাহিদা তৈরি হয়েছে। চাহিদা আছে বলে আমি আমার ওই বানাননীতির ওপর ভিত্তি করেই আরেকটি বানান অভিধান তৈরি করেছি। সেটি প্রকাশিত হয়েছে ও চলছে 'ব্যবহারিক বানান অভিধান' নামে। 'বানান বিবেচনা' ২০১৬-তে প্রকাশিত। এটা ২০১৮-তে প্রকাশিত। আমার কিছু কিছু তখনও সমস্যা ছিল । আমি ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে কিছু কিছু নতুন প্রস্তাব করেছিলাম। কিন্তু আমি এই বানান অভিধানেও নতুন কিছু প্রস্তাব করেছি। পরিশিষ্টে আছে যে, ক্রিয়াপদগুলোর বানান একটু অদলবদল করা দরকার। কিন্তু আমি মূলত বাংলা আকাদেমির বাননীতিকেই মেনে নিয়েছি। ওই অভিধানটা বাজারে নেই বলে আমাকে বলা হয়েছিল, সেটা আরেকটু বাড়িয়ে পেশ করা দরকার। সেটাই আমি করেছি।

প্রশ্ন: একটা উল্লেখযোগ্য তফাত আমরা লক্ষ করেছি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ষ-এ ণ যেভাবে লেখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আপনার বানান বিবেচনা গ্রন্থে সেটি পালটে গেছে। এটা কি আপনার সিদ্ধান্ত নাকি প্রকাশকের?

উত্তর: এটি প্রকাশকের সিদ্ধান্ত। লিপির ব্যাপারটা প্রকাশক করেছেন।

প্রশ্ন: বানানবিধি বিভিন্ন সময়ে যখন প্রণীত হয়েছে, বানান-বিধি প্রণয়নের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত অনেক সময়তেই তাঁরা আবার নিজেরাই নিজস্ব একটি বিধিতে লিখছেন। যেমন খুব উল্লেখযোগ্য উদাহরণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নিজস্ব বানানে লিখতে পছন্দ করেন। আবার নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি এবং আনন্দবাজার পত্রিকার 'বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন' নামক যে গাইডবুক, দুটোর সঙ্গেই তিনি যুক্ত। কিন্তু দুটো বই হুবহু এক নয়। অল্পবিস্তর ফারাক রয়েছে। একই ব্যক্তি যখন একটা বিধিতেও যুক্ত থাকছেন আবার নিজস্ব বানানেও লিখছেন, তখন বানানবিধির সর্বজনমান্যতা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে কি মনে হয়?

উত্তর: তুমি ঠিকই বলেছ। নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এইজন্য আমার মনে হয়, আগেও বললাম, এই ব্যক্তিগত প্রবণতাগুলো যথাসম্ভব পরিহার করে বা প্রত্যাহার করে আমাদের সকলের মিলিত সিদ্ধান্তটাকেই মেনে নেওয়া উচিত।

প্রশ্ন: একটা ঐতিহাসিক প্রশ্ন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির যে সুপারিশপত্র ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, সেটা শুরুই হচ্ছে লিপি বিষয়ক প্রস্তাব দিয়ে। প্রথমে লিপির কথা, তারপরে বানানের কথা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধিতে কিন্তু লিপি বিষয়ে আলাদা করে কোনো কিছু বলা হয়নি। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে একটা খুব সচেতন সিদ্ধান্ত ছিল এর পিছনে। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির যে ফন্ট, সেটাও আমরা ব্যবহার করি। এই ফন্ট তৈরির ইতিহাস বিষয়ে যদি কিছু বলেন।

উত্তর: এই লিপির সিদ্ধান্তটা সম্পূর্ণ আমার। ১৯৮৭-তে আমার বাংলা বানান সংস্কার সম্বন্ধে যে বইটি বেরোল, তাতেই আমি বাংলা লিপিতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা অধ্যায় লিখেছিলাম। সম্ভবত তৃতীয় অধ্যায়। তাতে বাংলা লিপিগুলোর আমি একটা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছিলাম, যেটা বিদেশি লিপিতত্ত্বের ধরনে। তাকে অনুসরণ করে আমি পড়েছিলাম একজন মাস্টারমশাইয়ের কাছে লিপিবিশারদ — আই জে গেল্‌ব বলে। এই গেল্‌বের *A Study of Writing* বইতে যে তত্ত্ব সেটাকে আমি গ্রহণ করেছিলাম। ফলে এই বাংলা বানান সংস্কার বইতে আমি বলেছিলাম... স্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জন, অর্ধস্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জন তাতে ভাগ করেছিলাম। কতগুলো অস্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জনকে স্বচ্ছ করে দিলে ছেলেমেয়েদের সুবিধা হবে। ধরো, ঙ-এ গ। এটা তো দীর্ঘ ঈ-এর নীচের অংশটা দিয়ে দেখানো হত, সঙ্গে ঙ আর গ আছে, তা কেউ বুঝত না। আমাদের আলাদা করে শেখাতে হত, দ্যাখো এটা কিন্তু ঙ-এ গ। কেমন? এইরকম ষ-এ ণ-তে পেছনে যে ঞ-এর মতো একটা বোঝা, সেইটা তো সত্যি সত্যি ছেলেমেয়েদের পরিষ্কার হয় না। এইরকম করে কয়েকটা অস্বচ্ছ (যুক্তব্যঞ্জনকে) পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলাম। শুধু তা-ই নয়, শ-এ হ্রস্ব উ-কার, গ-এ হ্রস্ব উ-কার এগুলোতে শ-কে দুমড়ে-মুচড়ে গুটিয়ে না দিয়ে আমরা সোজা করে স-এ হ্রস্ব উ-কার শ-এ হ্রস্ব উ-কার এটা করার (চেষ্টা করেছিলাম)। এটা পুরোটাই আমার প্রস্তাব ছিল এবং বাংলা আকাদেমি সেটা গ্রহণ করেছিল। বাংলা আকাদেমি সেই অনুযায়ী বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলে একজনকে ওদের দায়িত্ব দেয়। বিশ্বজিৎ এই ফন্টটা তৈরি করে। তারপরে সেটা বাংলা আকাদেমি ফন্ট হিসাবে গৃহীত হয়। তারপরে যেটা হয়, এখন যেটা অভ্র বলে পাওয়া যায়... অভ্রের মধ্যে বাংলা আকাদেমি নামে এ কে এ ডি ই এম আই ... অর্থাৎ আমরা যে ফন্টটা তৈরি করেছি, বাংলা আকাদেমি নামে এই ফন্টটা পাওয়া যাচ্ছে। একটা বৈশাখী ফন্ট আছে ... SNLTR বলে একটি সংস্থা — তাতেও এই বাংলা আকাদেমি ফন্টটা পাওয়া যাচ্ছে। এইটেই হচ্ছে ইতিহাস। এতে কখনও দেখতে পাচ্ছি, এখানকার ছোটোদের পাঠ্যপুস্তক যেমন হায়ার সেকেন্ডারি পর্যন্ত ছাপা হচ্ছে, বাংলাদেশেও পাঠ্যপুস্তকগুলোতে ছাপা হচ্ছে। পত্রপত্রিকাগুলোর মধ্যে *শুকতারা* সম্ভবত এই ফন্টটা গ্রহণ করেছে। মিত্র ও ঘোষের *কথাসাহিত্য* এই ফন্টে ছাপা হয়।

প্রশ্ন: আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আপনার *বানান বিবেচনা* বইটিতে আমরা দেখলাম, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির ক্ষেত্রেও দেখেছিলাম, কিছু ক্ষেত্রে যাকে আমরা সনাতন ব্যাকরণ মতে ভুল বানান বলে জানতাম, সেগুলোকে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। যেমন ধরা যাক, শশিভূষণ বানানটা ২০১৯ সালে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ ঈ-কার দিলে কোনো অসুবিধা নেই। *ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ* প্রবোধ সেন যা-ই বানান লিখুন না কেন, এখন আমরা ছন্দ শব্দ অর্ধ-তৎসম হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। এক্ষেত্রে যাঁরা ব্যাকরণকে কঠোরভাবে মেনে চলার পক্ষপাতী, আগেকার দিনেও আমরা দেখেছিলাম দেবপ্রসাদ ঘোষ ভগবান্ বানানে হস্-চিহ্ন বাদ দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, ব্যাকরণ ভুলের যে আশঙ্কা সেইটার সঙ্গে এটার কি কোনো বিরোধ তৈরি হচ্ছে না?

উত্তর: আমাদের মতে, শশী বানানে ঈ দিই। এই বানানে আমরা অভ্যস্ত। ফণী, শশী, গুণী। তার সঙ্গে আমরা যেটা বলেছিলাম, আরেকটা শব্দের সমন্বয়। তাহলে দুটো চেনা শব্দই পাশাপাশি আসবে। কিন্তু প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে -তা, -ত্ব যোগ হলে এটা বদল হতেই পারে। আমরা তফাতের এলাকা কমিয়ে আনতে চেয়েছিলাম। ব্যাকরণ ভুল হবে কি না খুব মুশকিল কথা। কারণ, শশী বানানটা যদি আমি শশী বানান হিসেবেই দেখি, তাহলে আমার ব্যাকরণ ভুলের যুক্তিটা কোথায়? এটা তো ব্যাকরণ ভুলের যুক্তি নয়। শশী বলে তো চিনতেই পারছি আমি। চাঁদ বলে চিনতেই পারছি তাকে। কাজেই মনে হয়, এই ব্যাকরণের দরকার ছিল ছেলেমেয়েদের সাহায্য করবার জন্য। যত বেশি জায়গায় শশী বানানটা দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে দেখবে। ব্যাকরণেও ওইটুকু সম্মান আমরা দিয়েছি — প্রত্যয় যোগ করলে। এটা নিয়ে সমস্যা আছে আমরা জানি। ছেলেমেয়েদের কতটা কীভাবে বোঝাব, সেটা নিয়ে সমস্যা আছে। সমস্যা যে নেই তা নয়।

প্রশ্ন: আমাদের ফাইনাল প্রশ্ন বাংলা বানানের ভবিষ্যৎ নিয়ে। একটা প্রবণতা আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, কিছু কিছু জিনিস অনেকসময় — আপনি 'কারিগর' শব্দটা ব্যবহার করলেন — বাংলা বানানের যারা কারিগর তারা চাইলেও হয়তো জনসমাজের কথা ভেবে সেই বানানের প্রস্তাব দিতে পারছেন না। যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধিতে আমরা দেখেছি প্রচুর বিকল্প রয়েছে। পরবর্তীকালে বাংলা আকাদেমি বিকল্পের সংখ্যা কমানোর পক্ষপাতী। বাংলা বানানের ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে বিকল্প আরও কমে গিয়ে একটি ... অভিনব প্রস্তাব দিয়েছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব ১৯৪৯ সালে যাকে আমরা 'শহজ বাংলা' বা 'শোজা বাংলা' বলে থাকি , আমরা কি ক্রমশ সেইদিকেই এগোচ্ছি?

উত্তর: উচ্চারণ অনুযায়ী বানানের প্রস্তাব আগে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধিও করেছিলেন। আমি জানি না উচ্চারণ অনুযায়ী বানান কখনও সম্ভব হবে কি না। কারণ পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষায় উচ্চারণ অনুযায়ী বানান নেই। দুটো একটা ভাষার কথা আমি জানি। চেক ভাষা, ইতালিয়ান ভাষা অনেকটা উচ্চারণের কাছাকাছি। এইদিকে যেতে যদি পারি তাহলে খুব ভালো হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সেটা শিখতে হবে না। কারণ ছাত্রছাত্রীরা স্বতঃসিদ্ধভাবে উচ্চারণ কী জানে না। অতএব উচ্চারণটাও তো একটা অক্ষর দিয়ে বোঝাতে হবে। বিশেষত — শ-এর পরেরটার (ষ-এর) উচ্চারণও যে শ, আমি তো জানি না! বানান লিখছি ষ কিন্তু উচ্চারণ যে শ, জানি না। ফলে আমি কী উচ্চারণ করছি সেটাই আমি জানি না। কী মানে সেটাকে কীভাবে লিখে দেখাব আমি। তার ফলে সেটাও একটা প্রকল্প নিতে হবে। আর তাতে কী হবে জান? লেখার পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে। ধরো, তুমি যদি মিত্র কথাটা বলো — তোমাকে লিখতে হবে মি ৎ র। একটা অক্ষর বেড়ে গেল। ত্রাণ কথাটাতে তুমি পাবে না। আমাদের উচ্চারণের অনেক সমস্যা আছে। উচ্চারণ অনুযায়ী লিখলে লেখার পরিমাণ ... হাতে তো মানুষ লিখবে দীর্ঘদিন ধরে। শুধু কম্পিউটারে হবে না। লেখার পরিমাণ বেড়ে যাবে। এটা একটা সমস্যা। দু নম্বর সমস্যা হচ্ছে, আমরা তো একটা সাধারণ উত্তরাধিকার বহন করছি। সেটা হচ্ছে সংস্কৃতের উত্তরাধিকার। ফলে আমি যদি উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখি, হিন্দি ওড়িয়া অসমিয়ার সঙ্গে তফাত হয়ে যাবে। কালচারাল ডিফারেন্স তৈরি হয়ে যাবে। উচ্চারণ অনুযায়ী বানান শিখতে হবে। আমরা কোন্ ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করছি। সূক্ষ্ম — ক আর খ আর তারপর একটা চন্দ্রবিন্দু। মানে নাসিক্যটা আসছে। এইগুলো শেখাতে হবে, এটা একটা বড়ো কাজ। জটিলতা হয়ে যাবে। কাজেই আস্তে আস্তে এগোনোই ভালো। আমরা এটা বলেছিলাম যে

সত্যি সত্যি এটাই চূড়ান্ত নয়। ইংরেজি তো এখনও বদলাতে পারেনি। ফরাসি এখনও বদলাতে পারেনি। তাদের উচ্চারণের সঙ্গে বানানের কোনো সংগতিই নেই। কিন্তু চালিয়ে যাচ্ছে তো।

পরিশিষ্ট ২: অধ্যাপক সুভাষ ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার

স্থান: বাগুইআটি, কলকাতা

কাল: ১২ জানুয়ারি, ২০২০

প্রশ্ন: পশ্চিমবঙ্গে বানান বিষয়ে যে তিনটি মান্য সংস্থা রয়েছে — পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, সাহিত্য সংসদ্, আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠী — প্রত্যেকটিরই বানান তৈরির প্রক্রিয়ার সঙ্গে আপনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আপনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কোন্ বিধি মেনে চলেন আপনার নিজস্ব লেখালেখির ক্ষেত্রে? এই তিনটি বিধির মধ্যে খুব অল্প হলেও ফারাক রয়েছে আমরা জানি।

উত্তর: অবশ্যই। ফারাক তো আছেই। আসলে ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে, এই তিনটির সঙ্গে আমার কিছু কিছু মতভেদ আছে। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে, ১৯৮৬ সাল থেকে বাংলা আকাদেমি তৈরি হয়েছিল। '৮৬ সাল থেকে আমরা ১২-১৪ জন যুক্ত ছিলাম। আর সেটা প্রথম বছরেই তৈরি হয়নি। পরে বানান সমিতি তৈরি হল। আমরা অনেকে তার সঙ্গে যুক্ত হলাম। এই বানান সমিতির কাজ কী? কাজ হচ্ছে মান্য বানান তৈরি করা। মান্য বানান তৈরি করার দরকারটা হল কেন? আসলে আমাদের মনে হয়েছিল, ১৯৩৬-৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে বানান সংস্কার (বানানবিধি) তৈরি হল সেটা একটা বড় পদক্ষেপ, কোনো সন্দেহ নেই। কারণ তার আগে বানান নিয়ে যে বিশৃঙ্খলা ছিল তার অনেকটা কিন্তু দূর করতে পেরেছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের যে রূপরেখা। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল সময় তো এগোচ্ছে, মানুষের অভ্যাস পাল্টাচ্ছে। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বানান পাল্টাবার একটা প্রয়োজন দেখা দিল। কোথায় কোথায়? বিশেষ করে মনে হল বড্ড বেশি বিকল্প রাখা হয়েছে — এক নম্বর। ১৯৩৬ সালে খুব বিকল্প রাখা হয়েছিল। দু'নম্বর হচ্ছে, সংস্কৃত বানান এবং সংস্কৃত থেকে আসা যে বানান এই দুইয়ের মধ্যে দুটোই সমান ভাবে একত্রে রাখা যায় না। কুমির বানানে হ্রস্ব ই-কার, বলা হল দীর্ঘ ঈ-কারও চলবে। কেন চলবে? আসলে বোধ হয় তখন অধিকাংশ মানুষের অভ্যাস ছিল 'বাড়ি'-তে দীর্ঘ ঈ কার দেওয়া, 'কুমির'-এ দীর্ঘ ঈ-কার দেওয়া, 'কুটির'-এ দীর্ঘ ঈ-কার দেওয়া। এইটাকে মান্যতা দেওয়ার জন্যই সম্ভবত ওঁরা বিকল্প হিসেবে দীর্ঘ ঈ-কার রেখেছিলেন। কিন্তু ১৯৮৬-৮৭ সালে আমাদের মনে হয়েছে এইখানে একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন দরকার। কারণ সত্যি কথা বলতে কী, ১৯৮৬-৮৭ সালে আমরা এসে দেখলাম কুমির বানানে আর কেউ দীর্ঘ ঈ-কার দিচ্ছে না। বিশেষ করে শিক্ষিত মানুষ দিচ্ছে না। মানে যারা বানান নিয়ে ভাবেন না, একটা লিখলেই হল — এরকম ব্যাপার, আমি তাদের ধরছি না। তারা যে-কোনো বানান লিখতে পারেন। কিন্তু যারা একটু মোটামুটি লেখাপড়া করেন, সচেতন, বানান সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা আছে, তাঁরা বাড়ি বানানে কুমির বানানে হ্রস্ব ই দেন। তা যদি হয় তাহলে আমরা কেন দীর্ঘ ঈ-কারকে বিকল্প হিসেবে রাখব? এরকম আরও কিছু কিছু ছিল। তার জন্যই মনে হয়েছিল যে... একটা নাম দেওয়া হয়েছিল যতদূর আমার মনে পড়ছে, ১৯৮৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সমতা বিধানের ব্যাপার। বানানের নানারকম বিকল্প আছে। তার মধ্যে একটা সমতা তৈরি করা যায় কি না... এবং দফায় দফায় আমাদের সভা হয়েছে এবং মোটামুটি একেবারে একমত সবাই হননি। কিন্তু মেজরিটির মত নিয়ে একটা রূপরেখা তৈরি করে বানানবিধি তৈরি করা হয়েছে। বানানবিধির বই বেরোল। একটা দুটো তিনটে করে বেরোল। এবং আমার নিজের ধারণা যেহেতু ওটা অনেকের ব্যাপার, আমার কথাটাই যে সবাই মেনে নেবে বা পবিত্রর কথাটাই যে সবাই মেনে

নেবে তা নয়। কিন্তু মোটামুটি একটা মেনে নেওয়া হয়েছিল। দেখা গেছে যে, মোটামুটি অনেকটাই এগিয়ে গেছে ওটা। এবার একটু আমি আনন্দবাজারের কথা বলি। আনন্দবাজারের একটা মস্ত বড় কৃতিত্ব হচ্ছে আনন্দবাজার প্রথম বোধহয় লাইনোটাইপ আনে। তার ফলে হয়েছে কি, বানানটা অনেক স্বচ্ছ হয় — অনেক ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যায়। এটা ইদানীংকালে কেউ করতে পারেনি। বহু বছর আগে বোধহয় হাজার ১৯০৬-০৭ সালে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি করেছিলেন। তাঁর যে অভিধান নাম হচ্ছে... সেখানে অদ্ভুত ব্যাপার। সেখানে যুক্তাক্ষরগুলো একদম স্বচ্ছ। ক্ত-তে ক-এর নীচে ত। এরকম অনেকগুলো উনি করেছিলেন। ভাবা যায় না! ওই সময় প্রেসের অবস্থা ভালো নয়, তা সত্ত্বেও কী করে উনি করতে পারলেন! যেটা পরবর্তীকালে কেউ করছে না। এমনকি আনন্দবাজার করছে না। আনন্দবাজার ব্যক্তি, ব্যক্ত এগুলোতে ও-তে আঁকুড়ি দিয়ে করছে। ক-এর নীচে ত লিখছে না। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কিন্তু সেটা করেছে। এই ট্রান্সপারেন্ট যে বানানটা এটা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ইদানীংকালে প্রথম করেছে, যেটা সবচেয়ে আগে করেছেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। এখন যেটা প্রশ্ন তোমার সেটা হচ্ছে আমি ব্যক্তিগতভাবে সবগুলো মানতে পারিনি। কিন্তু মিটিং যখন হচ্ছে আমি সেগুলো মেনে নিয়েছিলাম। মেনে নিয়েছিলাম কাজের স্বার্থে, নইলে কাজটা এগোবে না। আমি যদি বাগড়া দিই, এটা হয় না তো। কাজেই ওটা মেনে নিয়েছিলাম। পরবর্তীকালে পবিত্রও তাই। পবিত্র আমার খুব বন্ধু। পবিত্র যে পরে একটা বই লিখেছে *বানান বিবেচনা* নামে সেখানে ভূমিকায় লিখেছিল, আমরা অনেক চেষ্টা করেছি বাংলা আকাদেমি থেকে, কিন্তু অনেক কিছু করা যায়নি। যেটা করা যায়নি ব্যক্তিগত মতের জন্য, সেইটা এবার করছি। তাই বলে পবিত্র তার নিজের মত ব্যক্ত করেছে। আমি তো বানান নিয়ে পুরোপুরি অনেক কাজ করেছি, কিন্তু বানান নিয়ে আলাদা করে বই লিখিনি। আমার বইয়ের মধ্যে বানান নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। এখন কতগুলো ব্যাপার আমরা অনেকে বলেছিলাম, গোড়ার দিকে সবাই মানতে চাননি। সাহিত্য সংসদে যে কমিটি হয়েছিল সেই কমিটির মধ্যে ছিল আমি ছিলাম, পবিত্র ছিল, রমেন ভট্টাচার্য ছিলেন; অশোক মুখোপাধ্যায়, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় (ছিলেন)। তবে প্রথম দিকে দুই একটা মিটিং করে শমীক আর আসেননি। এঁরা মিলে একটা বিধি তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে অনেক মতভেদ হয়েছে। মতভেদ হওয়ার ফলে ওই বানান কমিটি আর থাকেনি। কিন্তু যাই হোক অশোক মুখোপাধ্যায় একটা বানান অভিধান করেছেন, কিন্তু তার সঙ্গে আমার অনেক মতের ফারাক আছে। যেমন একটা বলি — আঁতাঁত। আঁতাঁত একটা ফরাসি শব্দ —entante। আঁতাঁত মানে মৈত্রী এবং উচ্চারণটা হচ্ছে আঁতাঁত। আ-এ চন্দ্রবিন্দু, তা-এ চন্দ্রবিন্দু। কিন্তু সংসদের ওই সভায় অশোকবাবু বললেন, ওটা একটা চন্দ্রবিন্দু দেব। তার কারণ বাংলায় পরপর দুটো চন্দ্রবিন্দুর রেওয়াজ নেই তেমন। সেই সময়ে আমার চট করে মাথায় আসেনি, পরে ভেবে দেখলাম বাংলায় পাশাপাশি তো আছে। ধাঁ-ধাঁ করে ছুটে যাই আমরা। ভোঁ-ভোঁ করে উড়ছে। তাহলে পরপর দুটো চন্দ্রবিন্দু হবে না কেন? আর দ্বিতীয় কথা, বাংলায় দুটো চন্দ্রবিন্দু থাক বা না থাক, কথাটা এখনও পর্যন্ত বাংলা হয়ে যায়নি। একসময় বাংলা হয়ে যাবে, তখনও মূলের উচ্চারণটা রাখব না কেন যদি যদি রাখতে পারি? যাই হোক, আমি নিজে আঁতাঁতে দুটো চন্দ্রবিন্দু দিই। পবিত্রর যে লেটেস্ট বই *ব্যাবহারিক বাংলা অভিধান,* তাতেও দুটো চন্দ্রবিন্দু আছে। কাজেই এটা দাঁড়িয়ে গেছে। এইরকম বেশ কিছু ক্ষেত্রে আমাদের মতের অমিল রয়েছে। যেমন আমি ব্যক্তিগতভাবে কোষ বানান তালব্য-শ দিই। আনন্দবাজার দেয়, পবিত্র দেয়, আমি দিই। কিন্তু সাহিত্য সংসদ দেয় না। আমি সেখানে দীর্ঘকাল — ৩৫ বছর ধরে কাজ করছি। কিন্তু ওদের যে-কোনো কারণেই হোক মূর্ধন্য-ষ পছন্দ। এরকম কিছু কিছু বানানে ব্যক্তিগত মতভেদ আছে। আমি যখন ওদের হাউসে কাজ করি, তখন হয়তো তালব্য-শ লিখতে অসুবিধা হয়। কিন্তু আমি লিখি। যখন নিজের বই

লিখব, তখন আমি আঁতাঁতে দুটো চন্দ্রবিন্দু দেব, কোশ তালব্য-শ দেব, ব্যাবহারিকে আ-কার দেব, যেটা এখন অনেকে দেয় না। এই তফাতগুলো তো মানতেই হবে।

প্রশ্ন: এই যে বানানবিধিগুলো আপনারা প্রণয়ন করলেন, এর প্রয়োগক্ষেত্র কারা বলে আপনারা মনে করেন? প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা তো বটেই; যারা ধরুন বয়স্ক শিক্ষার্থী, স্বাধীনভাবে লেখালিখি করছেন, তাঁদের ওপরেও কি এই বানানবিধি প্রযুক্ত হবে?

উত্তর: অবশ্যই। আমাদের উদ্দেশ্য তো তা-ই। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, একটা শব্দের পাঁচরকম বানান যেন লেখা না হয়। ভুল বানানের কথা বলছি না। ভুলগুলো আলাদা। কিন্তু বেশি বিকল্প থাকলে হয় কী, মানুষের একটা ধাঁধা লেগে যায়। আমি কোন্‌টা লিখব তাহলে? সবাই তো পণ্ডিত হয়ে যায়নি। যে জাস্ট একটা গল্পের বই পড়ে, বা যে জাস্ট খবরের কাগজ পড়ে — তার বেশি কিছু পড়ে না, তার যদি একটা চিঠি লিখতে হয়, সে কোন্ বানান লিখবে? তাহলে তো ধাঁধায় পড়ে যাবে যে, আমি এই বানান লিখব নাকি? তিনটে বানান চলছে — জিনিস, জিনিশ, জিনিষ-!

প্রশ্ন: করছি শব্দটার ১১ রকম বানান দেখিয়েছিলেন মণীন্দ্রকুমার ঘোষ।

উত্তর: হ্যাঁ। এই ব্যাপারটাকেই বাংলা আকাদেমিতে প্রথম ইদানীংকালে আমরা চেষ্টা করেছি ইউনিফর্মিটি আনতে। কেন ইউনিফর্মিটি আনা সবচাইতে বড়ো দরকার? পণ্ডিতদের জন্য নয়। পণ্ডিতেরা ভেবেচিন্তে লিখবেন। যাঁরা এ নিয়ে আলোচনা করেন, যাঁরা এ নিয়ে চর্চা করেন, তাঁদের নিয়ে অত চিন্তা নেই। চিন্তাটা হচ্ছে মাঝারি এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য। তাদের একটা তো পথ দেখাতে হবে। তারা কোন্ বানান লিখবে? তাদের দিশা দেখাতে হবে। এটা আমাদের উদ্দেশ্যই ছিল যে, শিক্ষার্থীদের জন্যে এবং সাধারণ শিক্ষিত বাঙালিদের জন্যে একটা মান্য বাংলা বানান তৈরি করা দরকার। কাজেই প্রয়োগক্ষেত্র হচ্ছে এটা।

প্রশ্ন: মান্য বাংলা বানান তৈরি করার ক্ষেত্রে দুটো জায়গায় একটু আমারা সমস্যায় পড়ি অনেকসময়। সেটা হল পুনর্মুদ্রণ। একে আবার আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি — একটা ধরুন বাংলা যে-সব ধ্রুপদি গ্রন্থ রয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ তাঁদের গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ। আরেকটা হল যখন মধ্যযুগের বিভিন্ন পুথি পুনর্মুদ্রণ করা হয় প্রধানত সাহিত্যপাঠক এবং গবেষকদের জন্য। এই দুই রকমের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রেই কীরকম বানান অনুসরণ করা উচিত বলে আপনার অভিমত?

উত্তর: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি যেটা করেছিল, সেইটা আবার আমার মনঃপূত হয়নি। তারা করেছিল কী, বইয়ের ভেতরে বানান সব পালটে দাও। আধুনিক করা হবে। কিন্তু লেখক যে বইয়ের নামটা লিখেছেন — *পথের পাঁচালী* — সেই নামটা থাকবে। অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির নিয়মে পাঁচালি হ্রস্ব ই-কার। কিন্তু বিভূতিভূষণের *পথের পাঁচালী* যখন আমি ছাপছি, তখন এটা দীর্ঘ ঈ দিচ্ছি। কিন্তু ভেতরে হ্রস্ব ই দিচ্ছি।

প্রশ্ন: *সোনার তরী* মনে করুন ...

উত্তর: একই তো ব্যাপার। কাজেই এটা একটা খুব অ্যানামোলাস ব্যাপার হয়ে যায়। ভেতরে একরকম — বাইরে একরকম। প্রচ্ছদে একরকম — ভেতরে একরকম হয় না। যে কোনো এক রকম হতে হবে। আমি মনে করি, বানানটা না পালটালেই ভাল হয়। নোট দাও। আমি একটা ভূমিকা লিখে দেব, লেখকের বানান

পালটানো (হয়নি)। তাতে হবে কী? এটার একটা এডুকেশন ভ্যালু আছে। যারা পড়বে, তারা জানবে যে ওই বানানটা কীরকম ছিল অ্যাকচুয়ালি। এটার একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। আমি একটা উদাহরণ দিই ইংরেজি থেকে। শেক্সপিয়রের বানান তো পালটানো হয়নি। শেক্সপিয়রের একটা বানানও পালটানো হয়নি। এই যে কথায় কথায় অ্যাপোস্ট্রফি দিয়ে সংক্ষেপ করা, এগুলো রয়েছে। আজও রয়েছে। সেদিনও ছিল। কাজেই ওইরকম বড়ো বড়ো লেখকদের বানান পালটে দেওয়া ... অনেকে বলছেন আমার অধিকার নেই। অধিকার বড়ো কথা নয় এখানে। এখানে হচ্ছে উচিত কি না। তাতে কাজ হবে কি না। আমার নিজের ধারণা, পুনর্মুদ্রণ করতে গিয়ে লেখকের বানান পালটে দিলে তার একটা ইতিহাসকে যেন ধাক্কা দেওয়া হয়। আমার সেটা খুব একটা পছন্দ নয়। ভূমিকা লিখব আমি। ভূমিকায় লিখে দেব, এই-এই বানান এইরকম হয়েছে। সবাই জানবে এইরকম হয়েছে। কিন্তু আমরা লেখকের বানাটা পালটাইনি। লোকে জানুক যে, এই বানানটা কীরকম ছিল।

প্রশ্ন: পুথির ক্ষেত্রে?

উত্তর: পুথির ক্ষেত্রে তো পালটাতেই হবে। কারণ, পুথি লেখক যারা, তারা সবসময় উচ্চশিক্ষিত ছিল না। এবং তাদেরই জন্যে বানানের অনেক গণ্ডগোলও হয়েছে। তারা অনেক বানানকে চাপিয়ে দিয়েছে। সম্পূর্ণ ভুল বানান। এই পুথি লেখকদের ওপর ততটা ভরসা করা যায় না।

প্রশ্ন: তাহলে আমরা যদি পূর্বতন লেখকদের বানান না পালটাই, একটা কোথাও সীমারেখা টানতে হবে আমাদের যে, এই সময় পর্যন্ত আমরা পালটাব না, তারপর পালটাব ...

উত্তর: না, দরকারটা কী?

প্রশ্ন: মানে, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুণপোকা' যদি পুনর্মুদ্রিত হয় — ১৯৬৭ সালে বইটা বেরিয়েছিল — আমি কি সেই ফার্স্ট এডিশনের বানান ছাপব? নাকি বাংলা আকাদেমির মতে ছাপব?

উত্তর: বাংলা আকাদেমি যদি পালটে দিয়ে থাকে, কিছুদিন পরে তো '৬৭-এরটা পাওয়াই যাবে না। আমার ধারণা, আমার নিজের বিশ্বাস, এই ধরনের লেখকদের বানান না পালটানোই ভালো। এর একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এটা অনেকে মানবেন না। কিন্তু আমার তো জানাও দরকার, তিনি কী বানান লিখতেন। এগুলো তো চর্চারও বিষয়। বুদ্ধদেব বসুর বানাননীতি — আমাকে একটা লিখতে বলা হয়েছিল — *জলার্ক* পত্রিকায়। আট দশ বছর আগে। আমি লিখেছিলাম। এখন একটা কথা আছে যে, আজ থেকে কুড়ি বছর বাদে যদি বুদ্ধদেব বসুর সমস্ত বইয়ের বানানগুলো পালটে দিতে থাকে, তাহলে আমি বাননীতিটা জানব কী করে? আমার জানার কোনো উপায় থাকবে না। আমি এই কারণে বলছি যে, এই ধরনের লেখক যাঁরা আমাদের সম্পদ — আমাদের ভাষার, তাঁদের লেখার না পালটানোই ভালো।

প্রশ্ন: সমতাবিধান করার পক্ষপাতী আপনারা। এবার যাঁরা এর বিরোধিতা করেন, যেমন ধরা যাক বাংলাদেশের লেখক ড. মনসুর মুসা, তাঁরা অনেকসময় এরকম একটা যুক্তি দিয়ে থাকেন যে, যদি সমতা স্থাপন করা হয়, তাহলে বোধহয় বাংলা ভাষার দীর্ঘদিনের যে ঐতিহ্য রয়েছে ... পুথির জগতে যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখি যে, একটা হরফকে নানারকমভাবে লেখার একটা স্টাইল রয়েছে, এই কৃষ্ণ শব্দটা লিপিকররা বহুরকমভাবে লিখেছেন, ত্রিপুরা বসু তাঁর গ্রন্থে সেগুলো আলোচনা করেছেন। এইবার ষ্ণ এটা যদি আমি একরকম রূপ করে

দিই, তাহলে একটা সময়ের পর হয়তো আর শিক্ষার্থীরা পুরোনো রূপটা আর জানবে না। আমরা ঐতিহ্যবিচ্যুত হয়ে পড়ব। এই অভিযোগের প্রত্যুত্তরে আপনি কী বলবেন?

উত্তর: কথাটা হচ্ছে, বানান আর লিপি কিন্তু একদম আলাদা। কেমন? আমরা কিন্তু লিপির সমতাবিধানের কথা বলিনি একবারও। আমরা বলেছি বানানের সমতাবিধানের কথা।

প্রশ্ন: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কিন্তু লিপিরও সমতাবিধানের কথা...

উত্তর: আমি বলছি এই কথাটা। আমরা যেটা বলতে চাই, এই যে কৃষ্ণ বানানটা যে-কোনো ছোটো ছেলেমেয়েকে যদি বলা যায়, তুমি কৃষ্ণ বানানটা বলো, সে কী বলবে? সে যা চোখে দেখছে তা-ই বলবে। অর্থাৎ, সে বলবে, ক-এ ঋ ষ-এ ঞ। কিন্তু ওই ঞ-এর আঁকড়িটা রয়েছে তো। ওটা যে ষ-এ ণ, এটা সে বুঝল কী করে? জানার কোনো উপায় নেই। এইরকম বহু আছে। আরেকটা কথা, অনেক বানান যেভাবে চলেছে সেগুলো কিছুটা কিন্তু লিপির অসুবিধের জন্যে। র-এ হ্রস্ব উ যে এইরকম দেওয়া হত, তার কারণটা কী? তলায় ফুটকির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। তলায় ফুটকি যেটা, তার সঙ্গে হ্রস্ব উ-কার দিলে ফুটকি আর হ্রস্ব উ মিশে যাচ্ছে। দীর্ঘ ঊ-এও তা-ই। দীর্ঘ ঊ টা এরকম দিল, হ্রস্ব উ টা এরকম দিল। এখন আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এটা একসময় ছিল সত্যি কথা। এখন কম্পিউটারের যুগে যেভাবে ছাপা হয়, তাতে ওই সমস্যা নেই। কাজেই এখন আমরা ট্রান্সপারেন্ট বানান কেন করব না? যেটা আমি বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে, যেটা যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি করেছিলেন। প্রত্যেকটা বানানকে তিনি স্বচ্ছ করে দেন। বুদ্ধি বানান লিখেছেন দ-এর নীচে ধ, হ্রস্ব ই। এটা এখন কেউ করছে না। বাংলা আকাদেমি করেছে। এবং এখন সাহিত্য সংসদও করছে। বুদ্ধি, বুদ্ধ এগুলো দ-এ ধ দিয়ে ... আনন্দবাজার করছে না। কিন্তু আমার মনে হয়, এগুলো করার দরকার। এইখানে এসে লিপি আর বানানটা মিশে যাচ্ছে। আমার ধারণা করা দরকার ছোটোদের স্বার্থে, শিক্ষার্থীদের স্বার্থে, এবং এইখানে আমার মনে হয় না ঐতিহ্য খুব একটা মার খাচ্ছে।

প্রশ্ন: লিপি সংক্রান্ত আরেকটা প্রশ্নও এখানে সেরে নিই। সেটা হল, বাংলা /æ/ স্বনিমের উচ্চারণ এটা কীভাবে প্রকাশ করা হবে এই নিয়ে নানারকমের মত আছে। বিশ্বভারতীর একটা নিজস্ব বিধি রয়েছে। পলাশ বরন পাল একরকম বলছেন। আবার পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কিংবা সাহিত্য সংসদ একরকম বলছে। এই বিষয়ে আপনার অভিমত কী?

উত্তর: উদাহরণ দিয়ে বলো।

প্রশ্ন: যেমন, পলাশ বরন পাল /æ/ এ-কারের পেট কেটে প্রকাশ করেন। বিশ্বভারতী যেটা করে, শব্দের শুরুতে থাকলে মাত্রাটাকে বর্ধিত করে দিয়ে প্রকাশ করে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, শব্দের মাঝখানে থাকলে আকাদেমি আর সংসদ বলে য-ফলা আ-কার দিতে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও বলেছে, য-ফলা আ-কার হিসাবে না ধরে এটা একটা স্বনিমের প্রকাশক চিহ্ন হিসাবে ধরতে হবে। মানে ওটা য-ফলা প্লাস আ-কার এরকম নয়, ওটা একটা প্রকাশক চিহ্ন। অ্যা-টা আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা খুব বিতর্কিত বিষয়। যেহেতু এটা বাংলা ভাষায় ছিল না, বাংলা উচ্চারণের ক্ষেত্রে। এই বিষয়ে আপনার অভিমত কী?

উত্তর: আমার মনে হয় আমি পলাশ বরনের ওই ইয়েটার পক্ষপাতী। কিন্তু ওটা সম্ভব হবে না। আমি জানি ওটা খুব ভালো। পলাশ নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র, গবেষক মানুষ, কম্পিউটারে ওস্তাদ এবং সে এই কারণে যেটা করতে পেরেছে... তার যে যত প্রবন্ধ লেখে, যত বই লেখে, প্রকাশকদের পরিষ্কার বলে দেয়, আমি যেভাবে করছি... পুরো দিয়ে দেয়। সে পুরোটা কম্পোজ় করে দিয়ে দেয়। কেমন? এটা তো সব লেখকের পক্ষে সম্ভব হবে না। এটি হয়তো সব প্রকাশকের পক্ষেও সম্ভব হবে না। নানারকম যে ফন্ট আছে, সেগুলো অধিকাংশ প্রকাশক জানেই না যে কী কী ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কী কী ফন্ট আমি ব্যবহার করব। অথচ আমি মনে করি, পলাশ যেটা করেছে সেটা করলে অনেক সুবিধে হত। আর বিশ্বভারতী যেটা করেছে, বিশ্বভারতী মেইনলি রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরবিতানে সেইভাবেই আছে। কিন্তু সেটা বাইরে কোথাও চলছে না। বিশ্বভারতীর বাইরে কোথাও চলছে না। সেইজন্য আমার এখনও পর্যন্ত মনে হয়, ওটা যেভাবে চলছে সেভাবে চলা ছাড়া কোনো উপায় নেই। ওটা আমাদের বুঝে নিতে হবে। কোন্‌টা অ্যা বলব আর কোন্‌টা এ বলব, তা আমাদের বুঝে নিতে হবে। এছাড়া কোনো উপায় নেই। বেলা আর ব্যালা — এই দুটোর মধ্যে তফাত আমাদের শব্দটা বুঝে এবং বাক্যটা দেখে বুঝে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। আপাতত। এই আপাতত কথাটা বলা ভালো।

প্রশ্ন: আপনার একটি নির্দিষ্ট বইয়ের দিকে দৃষ্টি ফেরাচ্ছি। *সংসদ বিদেশি শব্দের উচ্চারণ* নামক যে বইটা, এই বইটাতে একটা বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে বেশ অভিনব বলে মনে হয়েছে। বিভিন্ন রকম শব্দ যখন আপনি লিপ্যন্তরিত করছেন, তখন হস্‌-চিহ্নের আমরা বহুল ব্যবহার লক্ষ করেছি। একটা দুটো উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন, জ়িদ্‌ — আঁদ্রে জ়িদ্‌ যখন লিখছেন, দ-এ হস্‌-চিহ্ন রয়েছে। ভিল্‌ — ভ-এ হ্রস্ব ই ল-এ হস্‌-ভিহ্ন রয়েছে। লাফর্গ্‌ — গ-এ রেফ হস্‌ চিহ্ন রয়েছে। আবার আপনি যখন সংসদ বাংলা অভিধানের পঞ্চম সংস্করণের সংস্কার সাধন করছেন, সেখানে বিভিন্ন বিদেশি শব্দে আমরা কিন্তু হস্‌ চিহ্ন দেখছি না। যেমন, ফ্রিজ — হস্‌ চিহ্ন নেই। এমনকি, তখত — দু'খানা চাইলে হস্‌ চিহ্ন দেওয়া যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছেন। কিন্তু আপনি একটাও হস্‌ চিহ্ন ব্যবহার করেননি। ত খ ত — সহজ। তাহলে দু'জায়গায় আমরা দু'রকমের প্রবণতা লক্ষ করছি। কোন্‌টা আপনার কাছ গ্রহণযোগ্য?

উত্তর: এটা খুব সহজ উত্তর। এই প্রশ্নের উত্তর আমাকে অনেক দিতে হয়েছে। সেটা হচ্ছে, আমি যখন সংসদে অভিধান লিখি তখন কিন্তু পুরোপুরি আমার নিজের মতটা ওখানে রিফ্লেক্টেড হয় না। কারণ, ওটা একটা কমিটি ছিল। সেই কমিটির একটা সিদ্ধান্ত ছিল। সেই সিদ্ধান্তর অনেক কিছু আমি মেনেও নিয়েছি। কিছু কিছু আমার মতভেদ আছে। সেইজন্যে আমি সবাইকে বলি, আমার নিজস্ব যে বইগুলো — সংসদ থেকেই বেরিয়েছে — আমার বিদেশি উচ্চারণ অভিধান সংসদ থেকেই বেরিয়েছে — কিন্তু সেখানে আমি পুরোপুরি আমার নিজস্ব বানান (লিখেছি)। কাজেই, ওইসব জায়গায় আমি যে বানান ফলো করি, ওটাই আমার বানান।

প্রশ্ন: সংসদ বিদেশি নামে শুধু বানান নয়, একটা বিশেষ লিপিগত কৌশল অন্তত একটা শব্দে আমরা লক্ষ করেছি। সেটা বেশ অভিনব। একটি জর্মন শব্দ আপনি লিখেছেন। ডন্নঅর — সেটার দু'রকম বানান রয়েছে। ড ন্ন একটা ছোটো হরফের অ, আবার র-টা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের। অনেকসময় আমরা য-ফলা দিয়ে স্যর উচ্চারণ বোঝাই, সেটা ছোটো অ দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

উত্তর: ওটা কিন্তু উপরে।

প্রশ্ন: উপরে। এই লিপিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যদি আরেকটু বিস্তারিত বলেন।

উত্তর: যখন ছোটো অ-টা আসেনি ... ছোটো অ-টা অভিনব হলেও আমি প্রথম ব্যবহার করছি, তা নয় কিন্তু। এটা রাজশেখর বসু একটা পরিকল্পনা করেছিলেন। করে যেতে পারেননি। তাঁর একটা লেখায় বলেছিলেন, এটা দিয়ে করা যেতে পারে। আমি সংসদে এটা চালুও করেছি। কী ব্যাপার? বাংলায় অতটা হয়নি। কিন্তু ইংরেজি উচ্চারণে কিছু কিছু শর্ট অ আছে। শর্ট অ পুরো অ লিখলে আসে না। কাজেই সেখানে তখন কী করা যায়? তখন আমি বলেছিলাম, একটু উপরে একটা ছোটো অ দিলে ওটা (সংক্ষিপ্ত অ-এর উচ্চারণ) — এরকম একটা উচ্চারণ হবে। এটা করা যায়। ইট ওয়াজ় অ্যাক্সেপ্টেড। তারপর থেকে এটা খুবই গৃহীত হয়েছে এবং এখন অনেকে দিচ্ছেও। এটার উদ্দেশ্য একটাই। সেটা হচ্ছে যে, যখন উচ্চারণটা হবে ড-নর — দরকার নেই। কিন্তু ডন্যর (হ্রস্ব উচ্চারণ) — অর্থাৎ, যেন মাঝপথে স্বরধ্বনিটা থেমে যাচ্ছে। একটা শর্ট ভাওয়েল। তখন ওইটা দেওয়া হয়। হ্রস্ব ই-ও ব্যবহার করেছি। আমি অনেক জায়গায় হ্রস্ব ই ছোট্ট করে ব্যবহার করেছি। অ ছোট্ট করে উপরে ব্যবহার করেছি। উদ্দেশ্যটা হচ্ছে শর্ট ভাওয়েলটাকে দেখানো।

প্রশ্ন: সংসদের ওই অভিধানটা থেকে আরেকটা জিজ্ঞাস্য রয়েছে। আমরা তো বানান সমতাবিধানের কথা বলছিলাম। কিন্তু এই অভিধানের মধ্যেই আমরা একই শব্দের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের বানান দেখেছি। আমি যেমন একটা চেনা উদাহরণ দিচ্ছি। ধরা যাক, সিগমুন্ড ফ্রয়েড আমরা যাকে সহজ বাংলায় উচ্চারণ করি। আপনি যখন বইয়ের ভূমিকা লিখছেন, তার ৩১ পৃষ্ঠায় বানানটা রয়েছে এইরকম — ফ্রয়ড়্। আর মূল অভিধানের এন্ট্রি হিসাবে যখন রয়েছে, তখন রয়েছে ফ্র, নীচে একটা বিন্দুচিহ্ন, য় আর ড। হস্ চিহ্নটা মিটে গেল। দুটো বানান আলাদা হল। এর কি কোনো বিশেষ কারণ আছে?

উত্তর: না। এটা জাস্ট ভেরিয়েশন হয়ে গেছে। এটা হওয়ার কোনো কথা নয়।

প্রশ্ন: আপনার নিজস্ব লেখা *বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান*-এ — যেমন ধরা যাক, এটা একটা বেশ বিতর্কিত বানানের কথা আমি বলছি — ফরাসিরা যেভাবে জঁ উচ্চারণ করেন , হয়তো আমি উচ্চারণটা ঠিক করতে পারছি না — এটা আমি বিভিন্ন রকম বানান দেখেছি। আপনার লেখায় অন্তত দু'রকম বানান পেয়েছি। আপনি জাঁ লুক গদার যখন লিখছেন, অভিধানে জ-এর নীচে দ্বিবিন্দুচিহ্ন রয়েছে। আর লেখক ও সম্পাদকের অভিধানে ঝাঁ দিয়ে রয়েছে। আর পলাশ বরন পালের লেখায় — ঝাক প্রেভারের কবিতা উনি যখন অনুবাদ করছেন — ঝ-এর নীচে উনি একটা বিন্দু দিয়ে করছেন। এতরকম বৈচিত্র্যের মধ্যে ...

উত্তর: একটা অসুবিধের ব্যাপার। ঝ-টা দিয়ে অরুণ মিত্র পছন্দ করতেন। আমাকে উনি বলেছিলেন। আমি ফরাসি শিখেছি ওনার কাছে। উনি ঝ-টা পছন্দ করতেন। উনি যখন বলতেন, তখন ঝ-এর নীচে বিন্দুটা কোনো প্রেস আনতে পারত না। উনি আমায় বলেছিলেন, যখন লিখে দিচ্ছেন আমাকে, তখন ঝ-এর নীচে একটা বিন্দু রাখতেন। উনি বলতেন, উচ্চারণটা হচ্ছে ঝাক — এইরকম একটা উচ্চারণ। এখন যেহেতু ঝ -এর নীচে বিন্দুটা কোনো প্রেস আনতে পারত না, তাই শুধুই ঝ ছাপা হয়েছে। কিন্তু শুধু ঝ ছাপা হওয়াটা ... তাতে তো অ্যাকচুয়াল ধ্বনিটা আসছে না। তখন আমি চিন্ময় গুহকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী করা যেতে পারে? তখন চিন্ময়ের মতটা হচ্ছে ওই জ-এর নীচে বিন্দু দেওয়ার। অবশ্য সাধারণ লেখায় বিন্দু দেন না উনি। কিন্তু আমি যেটা করি এখন ... আমি ওটা আনব না, কারণ ছাপা হয়েছিল অনেক বছর আগে ... লেখক-সম্পাদক ইদানীং

রিভিশন হয়নি। কাজেই ওই বানানটা আমি ধরছি না। আমি এখন যেটা পছন্দ করি, সেটা হচ্ছে বর্গীয় জ-এর নীচে দুটো ডট। দুটো বিন্দু।

প্রশ্ন: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ করেছিলাম। পরবর্তীকালে পবিত্রবাবুর লেখাতেও দেখেছি , অল্প অল্প ব্যাকরণ উল্লঙ্ঘনকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। যেমন ধরা যাক, ছন্দোগুরু শব্দটাতে ছন্দ-কে অর্ধ-তৎসম শব্দ হিসাবে বিবেচনা করে ও-কার দেওয়া হচ্ছে না। শশীভূষণে দীর্ঘ ঈ দিয়ে... স্থায়ীভাব... এই বিষয়ে আপনার অভিমত কী?

উত্তর: আমার নিজস্ব অভিমত, আমি সংস্কৃত মতের পক্ষপাতী। অর্থাৎ, আমি এখনও পর্যন্ত ছন্দটাকে অর্ধ-তৎসম ভাবতে পারছি না। আমি ছন্দটাকে সংস্কৃত শব্দ ছন্দস্ থেকে এসেছে এটাই আমি ধরে নিই এবং আমি নিজে এখনও ছন্দোগুরু ও-কার দেওয়া পছন্দ করি। যদিও সব জায়গায় দিইনি। মানে অন্য হাউসের বইগুলোয় আমার সবসময় স্বাধীনতা থাকে না। কিন্তু আমি নিজে এখনও... আমি ঠিকই করেছি ওটা ন্দো হওয়া উচিত।

প্রশ্ন: আর হস্ চিহ্নের ক্ষেত্রে শব্দান্তে যে হস্ চিহ্ন — কিছু সংস্কৃত শব্দের — ওগুলো আর ব্যবহার করেন না?

উত্তর: হস্ চিহ্নও দরকার নেই, বিসর্গও দরকার নেই। শব্দের শেষে এগুলোর কোনো দরকার নেই। যেটা মণীন্দ্রকুমার ঘোষ ভয় পেয়েছিলেন যে, তাহলে সন্ধি-সমাসে গণ্ডগোল হবে। গণ্ডগোল তো হচ্ছে না খুব একটা। গোটা গোটা শব্দ হিসাবে লোকে জানছে। অসুবিধা হবে না। বিরাট সম্রাট হনুমান — এসব শব্দে হসন্ত কোনো দরকার নেই। আবার অন্তত — তাতেও বিসর্গ কোনো দরকার নেই। এগুলো লোকের অভ্যেসের মধ্যে এসে গেছে।

প্রশ্ন: বিভিন্ন সময়ে যে বানান সমিতিগুলো তৈরি হয়েছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হোক কি বাংলা আকাদেমি, আমরা একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছি। বানান সমিতির সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, পরবর্তীকালে অনেকেই হয়তো তাঁরা নিজস্ব বানান লিখছেন। চলন্তিকার বানান আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান হুবহু এক নয়। তাই নিয়ে সুবীর রায়চৌধুরীর প্রবন্ধ রয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘ ঈ লেখার বিশেষ প্রবণতা ছিল। আরও নিজস্ব কিছু প্রবণতা ছিল। তাই নিয়েও বিশেষ চর্চা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির ক্ষেত্রে ধরা যাক, পবিত্রবাবু বানান অভিধান প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে — গত দু-তিন বছরের মধ্যে স্যর আরও দু'খানা নতুন অভিধান লিখেছেন। আপনিও অন্যান্য হাউসে কাজ করেছেন। আমরা যারা সাধারণ বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী, অনেকসময় আমাদের এটা মনে হতে পারে যে, যাঁরা বানানটা তৈরি করছেন, তাঁদের যদি নিজস্ব বানান থাকে তাহলে কি সমিতির বিশ্বাসযোগ্যতা কিছুটা কমে বলে আপনার মনে হয়?

উত্তর: হ্যাঁ। নিশ্চয়ই কমবে। অসুবিধে তো হবেই। কারণ... এগুলো অনিবার্য। এছাড়া উপায়ও নেই। আমরা যখন একটা সমিতির মধ্যে কাজ করি, তখন একটা কনসেনশাসের ব্যাপার থাকে। প্রত্যেকেরই তো নিজস্ব মতামত আছে। কিন্তু একটা জায়গায় ইয়ে না হলে কাজটা তো এগোবে না। আবার সেই সদস্যরা যখন নিজের নিজের বই লিখছেন, তখন তাঁর নিজের মতটা লিখছেন। এতে সাধারণ পাঠকের একটা দ্বিধা, সংশয় তো আসবেই। এটা আসতে বাধ্য। আবার এই বানান যাঁরা লিখছেন, তাঁদের দিক থেকেও বলতে পারি, এটা

অনিবার্য। উপায় নেই তো। কাজেই আমাদের বাংলা বানান এখনও পর্যন্ত — যদিও অনেকটা এগিয়েছে, সমতাবিধানের দিকে আমরা খানিকটা এগিয়েছি, বিকল্প অনেকটা কমে এসেছে, মানুষের ভুল বানানের প্রবণতাও কিছুটা কমেছে, সবই ঠিক — কিন্তু এখনও পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়নি। এখনও অনেকদিন, আমার ধারণা আরও বহুদিন লাগবে। সবচাইতে বড়ো কথা বানান নিয়ে মানুষ ভাবছে, চর্চা করছে। লেখাপড়া জানা ছেলেপুলে, ছাত্রছাত্রীরা, এমনকি বয়স্করা। আমার মনে হয় এটা খুব সুলক্ষণ। এটা সুলক্ষণ। এবং বাংলা বানানের অসুবিধাগুলো এত সহজে যাবে না। বাংলার সঙ্গে অন্য অনেক ভাষার তফাত এই যে, বাংলা এত বেশি ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করেছে যে, তার একটা প্রভাব, তার একটা ইম্প্যাক্ট থাকবেই। এই যে জিনিশ বানান নিয়ে এত তর্কটা কীসের জন্য? দেবেশ রায়, বুদ্ধদেব বসু এঁরা সব শ দিয়েছেন। আমি স দিই। পুরোনো বানান ছিল ষ। ষ বাদ দিলাম। একসময় ষ লেখার একটা প্রবণতা ছিল। কিন্তু যিনি জিনিশ লেখেন শ, তিনি কোন্ যুক্তিতে লেখেন? তাঁর তো একটা যুক্তি আছে। এঁরা তো কেউ অশিক্ষিত লোক নয়। এঁরা তো রীতিমতো শিক্ষিত মানুষ। জিজ্ঞেস করলেই বলবেন, উচ্চারণটা আমরা কী করি? জিনিশ — শ উচ্চারণ করি। জিনিস বলি না। এই তো? এটা হচ্ছে ওঁদের যুক্তি। আমাদের যুক্তিটা কী –আমরা যারা স লিখি? আমাদের যুক্তি হচ্ছে, ওটা আরবি জিনস্ থেকে এসেছে। সেখানে ছিল মূলে ব্যুৎপত্তিগত বানান। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে? কিছু বানানে আমরা ব্যুৎপত্তি দেখছি, কিছু বানানে উচ্চারণ। মজলিস যখন লিখি, শ লিখি। কেন বলি? মজলিশ উচ্চারণ আমরা শ দিয়ে করি। এবং বাংলায় শ উচ্চারণের প্রবণতা অনেক বেশি। সেই কারণে আমরা শ দিচ্ছি।

প্রশ্ন: শ প্রধান ব্যঞ্জন স্বনিম।

উত্তর: ন্যাচারালি। তাহলে কি একটা অ্যানোমালি দাঁড়াচ্ছে না? কখনও আমি ব্যুৎপত্তি দেখছি, কখনও উচ্চারণ দেখছি। আমার মনে হয় এটা অনিবার্য বাংলার ক্ষেত্রে। হবেই।

প্রশ্ন: আমার শেষ প্রশ্ন — দুটো পরস্পর অন্বিত প্রশ্ন। আপনি তো দীর্ঘদিন ধরে এই বানান বিষয়টা নিয়ে চর্চা করেছেন। নিজে ৩৫ বছর সংসদের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। একটা যদি দীর্ঘমেয়াদি হিসেবে আমি বলি, বাংলা বানান কোন্ দিকে মোড় নিতে চলেছে বলে আপনার মনে হয়? আমরা কি ধ্বনিসংবাদী উচ্চারণভিত্তিক বানানের দিকে এগোচ্ছি?

উত্তর: মনে হয়। মানে, সব ক্ষেত্রে নয়। কিন্তু একটা প্রবণতা আসছে।

প্রশ্ন: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যেমন 'শোজা বাংলা' বলে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ছে ১৯৪৯ সালে। সেইদিকে কি আমরা এগোচ্ছি?

উত্তর: মনে হয়। কিছুটা। কারণ যে বানানগুলোর একটু নতুন শব্দ — আরবি ফারসি শব্দ এবং দেশি শব্দ, সংস্কৃত থেকে আসা নয়, এমনকি তৎসম তদ্ভবও নয় — একেবারে দেশি শব্দ, মুণ্ডা শব্দ বা অস্ট্রিক ধরনের শব্দ — সেগুলোতে কিন্তু শ ধ্বনি থাকলেই উচ্চারণের দিকে যাচ্ছি আমরা। যদি উচ্চারণটা স থাকে। কাজেই আমার মনে হয় ধ্বনিসংবাদী বানানের দিকে একটা ঝোঁক আসছে। আস্তে আস্তে। পুরোপুরি এখনও আসেনি। সময় হয়তো লাগবে। কিন্তু আছে। একটা প্রবণতা, ঝোঁক আছে। একটা ইনক্লিনেশন আছে।

গ্রন্থপঞ্জি এবং অন্যান্য সূত্রসমূহ

বাংলা গ্রন্থ

লেখক/সম্পাদক অনুল্লিখিত, *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম.* পরিমার্জিত সংস্করণের প্রথম মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৫.

— *পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গৃহীত বাংলা বানানবিধি.* সংশোধিত সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, আগস্ট, ২০০৩.

— *প্রথম আলো ভাষারীতি.* পঞ্চম সংস্করণ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭.

— *প্রসঙ্গ বাংলাভাষা. দ্বিতীয় সংস্করণ,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৩.

— *বানান ও বিন্যাস-বিধি.* প্রথম প্রকাশ, বিশ্বভারতী, ১৪২২ বঙ্গাব্দ (২০১৫ খ্রিস্টাব্দ).

আচার্য, পরমেশ. *বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা.* দ্বিতীয় সংস্করণ, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০০৯.

আজম, মোহাম্মদ. *বাংলা ও প্রমিত বাংলা সমাচার.* প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, অক্টোবর, ২০১৯.

— *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ.* দ্বিতীয় সংস্করণ, আদর্শ, ২০১৯.

আজাদ, হুমায়ুন. *বাঙলা ভাষা: বাঙলা ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধসংকলন (১৭৪৩-১৯৮৩).* সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড, আগামী প্রকাশনী, ২০১৫.

আমীন, মোহাম্মদ. *অফিস-আদালতে বাংলা লেখার নিয়ম.* প্রথম প্রকাশ, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৫.

আলম, শফিউল. *প্রসঙ্গ: ভাষা বানান শিক্ষা.* প্রথম প্রকাশ, কাকলী প্রকাশনী, ২০০২.

আলীম, আব্দুল. *বাংলা বানান ও উচ্চারণ শিক্ষা.* প্রথম প্রকাশ, গতিধারা, ২০১১.

ইসলাম, রফিকুল প্রমুখ, সম্পা. *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ.* প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ২০১৬.

ইসলাম, রফিকুল এবং সরকার, পবিত্র, সম্পা. *বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ.* প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০১২.

উমর, বদরুদ্দীন. *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি.* আনন্দধারা প্রকাশন, ১৯৭০.

কুণ্ডুচৌধুরী, কুমুদ. *কগবরক লিপি বিতর্ক বানান বিতর্ক.* অক্ষর, ১৯৯৯.

কুন্তক. *শব্দ নিয়ে খেলা.* চতুর্থ সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ.

কুমার, মদনমোহন. *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস (প্রথম পর্ব).* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ.

খান, হোসাইন রিদওয়ান আলী. *বাংলা শব্দ বর্ণ বানান.* নালন্দা, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০১২.

খাস্তগীর, আশিস, সম্পা. *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬- ১৮৫৫),* প্রথম প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৬.

গঙ্গোপাধ্যায়, মলয়া. *ভাষাচর্চার একাল সেকাল.* প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড.

গুহ রায়, গৌতম, সম্পা. *ভাষাচর্চা: তর্ক বিতর্ক.* প্রথম প্রকাশ, সোপান, ২০১৩.

গোস্বামী, জয়. "ওঃ স্বপ্ন!", *কবিতাসংগ্রহ ২,* তৃতীয় মুদ্রণ, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২.

গোস্বামী, শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ. *সপ্তপর্ণী.* তৃতীয় সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, বাংলা ও সংস্কৃত মিশ্রভাষায় লিখিত গ্রন্থ.

ঘোষ, দীপঙ্কর, সম্পা. *প্রসঙ্গ: বাংলা ব্যাকরণ.* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১০.

ঘোষ, দেবপ্রসাদ. *বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান.* মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ.

ঘোষ, মণীন্দ্রকুমার. *বাংলা বানান.* দে'জ ষষ্ঠ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, শ্রাবণ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ.

চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ. *বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন.* দ্বিতীয় সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০.

চক্রবর্তী, বরুণকুমার, সম্পা. *তোমার সৃষ্টির পথ: আচার্য সুকুমার সেন স্মারক গ্রন্থ.* প্রথম প্রকাশ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০০৯.

চক্রবর্তী, বামনদেব. *উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ.* অক্ষয় মালঞ্চ, ২০১৮.

চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ. *পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র.* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৬.

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার. *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ,* রূপা, ২০১৭.

— *সাংস্কৃতিকী (অখণ্ড সংস্করণ),* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৯.

— *নির্বাচিত রচনা সংকলন,* সম্পা. বারিদবরণ ঘোষ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ.

— *ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা,* রূপা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

চাকী, জ্যোতিভূষণ. *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ.* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭.

— *শুদ্ধ লেখো ভালো লেখো.* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ.

চাকী, জ্যোতিভূষণ এবং দাশ, নির্মল. *নতুন বানান.* ২০০৯, পারুল প্রকাশনী.

চৌধুরী, বিদ্যুৎবরণ. *ভাষা-প্রযুক্তির কয়েকটি.* প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২.

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. "বাংলাভাষা-পরিচয়." *রবীন্দ্র-রচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড),* ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, খণ্ড ১৩, বিশ্বভারতী, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ.

— *সাহিত্য.* তৃতীয় সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ.

দত্ত, বিজিতকুমার, সম্পা. *শতবর্ষ পরিক্রমা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ.* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৬.

দত্ত, সন্দীপ. *বাংলা গল্প-কবিতা আন্দোলনের তিন দশক.* প্রথম সংস্করণ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৩.

— *লিটল ম্যাগাজিন ভাবনা.* প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণাকেন্দ্র, ২০০০.

দাক্ষী, অলিভা. *চর্যা-গীতি ভাষা ও শব্দকোষ.* প্রথম সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১১.

দাশ, অসিতাভ, এবং বাগ্‌চী, প্রদোষকুমার. *বাংলা অভিধানের দুশো বছর ও তথ্যপঞ্জি (১৮১৭-২০১৭).* প্রথম প্রকাশ, পত্রলেখা, ২০১৮.

দাশ, উত্তম. *হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন.* দ্বিতীয় প্রকাশ, মহাদিগন্ত, ২০০২.

দাশ, জীবনানন্দ. *ধূসর পাণ্ডুলিপি.* প্রথম সিগনেট সংস্করণ, সিগনেট প্রেস, ফাল্গুন, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ.

দাশ, নির্মল (সম্পা.). *সুনীতিবাবুর কীর্ণাহার এবং.* দি সী বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫.

দাশ, শিশিরকুমার. *ভাষাজিজ্ঞাসা.* চতুর্থ সংস্করণ, প্যাপিরাস, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ.

— *মোদের গরব মোদের আশা.* প্রথম প্রকাশ, চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৯৯.

দাশগুপ্ত, পুষ্কর. *বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব.* সানন্দা কমলেসার, ২০০২.

দাশগুপ্ত, প্রবাল. *কথার ক্রিয়াকর্ম.* প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৭.

দাস, সজনীকান্ত. *বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস.* দে'জ পাবলিশিং, ২০২০

দেবনাথ, দিলীপ. *বাংলা বানান ও শব্দের জগৎ.* দ্বিতীয় মুদ্রণ, আলেয়া বুক ডিপো, ২০১৮.

নাথ, মৃণাল. *ভাষা ও সমাজ.* নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৯.

পাল, পলাশ বরন. *আ মরি বাংলা ভাষা.* প্রথম প্রকাশ, অনুষ্টুপ, ২০১১.

— *ধ্বনিমালা বর্ণমালা.* দ্বিতীয় সংস্করণ, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১৫.

— *হক কথা.* প্রথম প্রকাশ, পরম্পরা, মে ২০১৩.

— *কথার কথা,* প্রথম প্রকাশ, পরম্পরা, ২০২০

— *কাজের কথা,* প্রথম প্রকাশ, অনুষ্টুপ, ২০২২

পাল, রজত. *সিন্ধু সভ্যতায় বৈদিক উপাদান ও সিন্ধু লিপির পাঠ.* খড়ি প্রকাশনী, ২০১৯.

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার. *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত.* মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮-২০১৯.

বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যরঞ্জন. *সংস্কৃত বনাম বাঙলা ব্যাকরণ.* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৩.

বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, সম্পা. *বাঙালির ভাষাচিন্তা.* প্রথম প্রকাশ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০২.

বর্মন, ঝর্না. *বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাস.* প্রথম প্রকাশ, গাঙচিল, ২০২২.

বসু, অরুণকুমার, সম্পা. *সারস্বত: বাংলার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত.* প্রথম প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৮.

বসু, ত্রিপুরা. *বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠপরিক্রমা.* প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, ২০০০.

— *দুশো বছরের বাংলা নথিপত্র,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১

বসু, মৃদুল কান্তি. *নতুন বাংলা বানান.* প্রথম সংস্করণ, মাদার পাবলিশিং, ২০০২.

বসু, রাজশেখর. *প্রবন্ধাবলী.* পঞ্চম সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৪.

বাগচি, সুকুমার. *বাংলা উচ্চারণের নিয়মাবলি.* প্রথম প্রকাশ, নাট্যকথা প্রকাশন বিভাগ, ২০২২.

বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র. *সমগ্র ব্যাকরণ-কৌমুদী.* সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৫.

বিশ্বাস, অচিন্ত্য. *বাংলা পুথির কথা.* বিদ্যা, ২০১৩.

বিশ্বাস, রণজিৎ. *ব্যবহারিক বাংলা: যত ভুল তত ফুল.* কথাপ্রকাশ, ২০১৬.

ভট্টাচার্য, দিনেন. *বানানের রবীন্দ্রনাথ.* ডি.এম. লাইব্রেরি, ২০০৩.

ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী. *বাগর্থ.* পরিবর্ধিত ও সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৭.

ভট্টাচার্য, মিতালী. *বাংলা বানানচিন্তার বিবর্তন.* পারুল প্রকাশনী, ২০০৭.

ভট্টাচার্য, রমেন. *বাংলা বানানের নিয়ম ও অনিয়ম.* পঞ্চম মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, ২০১৬.

ভট্টাচার্য, রীতা. *প্রেক্ষাপট পাণ্ডুলিপি: গ্রন্থ সম্পাদনার নানা কথা.* প্রথম প্রকাশ, ভারততত্ত্ব কেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪.

ভট্টাচার্য, সুকুমারী. *সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়.* তৃতীয় মুদ্রণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৫.

ভট্টাচার্য, সুভাষ. *ভাষার অভিমুখ.* প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০.

— *তিষ্ঠ ক্ষণকাল: বিরামচিহ্ন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ.* পঞ্চম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩.

— *আধুনিক বাংলা প্রয়োগ অভিধান.* পঞ্চম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭.

— *ভাষাদিগন্তে নতুন আলো.* প্রথম প্রকাশ, প্রতিভাস, ২০১৬.

—*ভাষা ও সাহিত্যের তিন প্রসঙ্গ.* প্রথম সংস্করণ, সিগনেট প্রেস, ২০১৮.

ভৌমিক, তাপস, সম্পা. *হরিচরণ.* প্রথম প্রকাশ, কোরক, ২০১৬.

মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার. *সোজা বানান সরস লেখা.* দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫.

মজুমদার, পরেশচন্দ্র. *বাঙলা বানান বিধি.* দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪.

— *বাঙলা ভাষা পরিক্রমা,* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫

— *সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ.* দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭.

মণ্ডল, সুবীর. *বাংলা লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ.* দে'জ পাবলিশিং, ২০১০.

মন্ডল, দেলওয়ার হোসেন. *আধুনিক বাংলা বানান ও লেখার নিয়ম কানুন.* প্রথম প্রকাশ, আফসার ব্রাদার্স, ২০১৯.

মালিথা, নাছিমউদ্দিন. *বাংলা বানান ও টুকিটাকি.* দ্বিতীয় মুদ্রণ, অনন্যা, ২০১৫.

মিত্র, সৌরভ. *শব্দের ভিতর ও বাহিরে.* প্রথম প্রকাশ, দ্য কাফে টেবল, ২০১৯.

মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ. *বানানের হাতবই.* দ্বিতীয় সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড.

মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র. *চিহ্নতত্ত্ব বা সেমিওলজি: সস্যুর থেকে দেরিদা.* তবুও প্রয়াস, ২০২১.

মুসা, মনসুর. *বানান: বাংলা বর্ণমালা পরিচয় ও প্রতিবর্ণীকরণ.* প্রথম প্রকাশ, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৭.

মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর. *আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান.* নয়া উদ্যোগ, দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৯৯৭.

রহমান, মতিয়র. *ব্যাকরণের রস.* অবসর, প্রথম প্রকাশ: ২০১৫.

রহিম, আব্দুর. *বাংলাদেশের ভাষা-পরিকল্পনা.* প্রথম প্রকাশ, অবসর, ২০১৭.

রায়, অলোক. *সুকুমার সেন.* পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৬.

রায় বিদ্যানিধি, যোগেশচন্দ্র. *বাঙ্গালা ভাষা: প্রথম ভাগ (ব্যাকরণ).* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ.

রায়, সিতেস. *বাংলা বানান সমতা ও নয়া বরন পরিচয়.* প্রথম সংস্করণ, সংসক্রিতি প্রকাসন, ১৯৯৮

রায়গুপ্ত, প্রদীপ. *বাংলা বানান: রস ও রহস্য.* দ্বিতীয় সংস্করণ, ঋতাক্ষর, ২০২০.

রায়চৌধুরী, মাণিকলাল, সম্পা. *আ-মরি বাংলা ভাষা.* প্রথম সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ প্রধানশিক্ষক সমিতি, ফেব্রুয়ারি, ২০০৫.

রায়চৌধুরী, শিশির, এবং রায়চৌধুরী, সুশোভন, সম্পা. *ভাষাতত্ত্ব: উৎস, নির্মাণ ও প্রয়োগ.* প্রথম প্রকাশ, শ্রীময়ী প্রকাশনী, ২০১৯

রায়চৌধুরী, সুবীর. *সমাজ থেকে বানান,* প্রথম প্রকাশ, তালপাতা, ২০১০

লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন, প্রমুখ, সম্পা. *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ.* মাটিগন্ধা, ২০২০.

শ', রামেশ্বর. *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা.* পুস্তক বিপণি, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ.

শরীফ, আহমেদ. *বাঙলাভাষা-সংস্কার আন্দোলন.* আগামী প্রকাশনী, ২০১৮.

শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ. *বাঙ্গালা ব্যাকরণ.* মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮.

— *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত.* মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৯.

শ্রীপান্থ. *যখন ছাপাখানা এল.* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৬.

সরকার, পবিত্র. *বাংলা বানান সংস্কার: সমস্যা ও সম্ভাবনা.* দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪.

— *বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ,* দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬.

— *বাংলা লিখুন: নির্ভুল, নির্ভয়ে.* কথাপ্রকাশ, ২০১৯.

— *বানানের ক্লাস,* কথাপ্রকাশ, ২০১৯.

— *ভাষা, দেশ, কাল.* প্রথম সংস্করণ, জি.এ.ই. পাবলিশার্স, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ.

— *ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ.* দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮.

— *চম্‌স্কি ব্যাকরণ ও বাংলা বানান.* পুনশ্চ, ২০১৩.

সরকার, স্বরোচিষ. *অকারণ ব্যাকরণ: ভাষা নিয়ে সরস কথা.* কথাপ্রকাশ, ২০১৯.

— *সর্বস্তরে বাংলা ভাষা: আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতা.* দ্বিতীয় মুদ্রণ, কথাপ্রকাশ, ২০১৬.

সিকদার, সৌরভ. *বাংলাভাষা ও বাংলাদেশের ভাষা.* প্রথম প্রকাশ, অবসর, ২০১৪.

সিন্‌হা, কৃষ্ণকুমার. *হাজার বছরের বাংলাভাষা— লিপি ও সাহিত্য.* ভারতী লিপি রিসার্চ সেন্টার, ২০২০.

সেন, অরুণ. *দুই বাঙালি, এক বাঙালি.* প্রথম প্রকাশ, অবভাস, ২০০৬.

সেন, দীপঙ্কর. *মুদ্রণচর্চা.* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০০.

সেন, সুকুমার. *ভাষার ইতিবৃত্ত.* ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১.

— সেন, সুকুমার. *প্রবন্ধ সংকলন.* সম্পা. সেন, সুভদ্রকুমার এবং সেন, সুনন্দনকুমার, প্রথম সংস্করণ, প্রথম এবং তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৪ এবং ২০১৭ যথাক্রমে.

— *ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধার্থ বাংলা-কোষ.* দ্বিতীয় মুদ্রণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৬.

সেন, সুকুমার এবং সেন, সুভদ্রকুমার. *বাঙালীর ভাষা.* প্রথম প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯০.

সেন, সুনন্দনকুমার. *ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবিজ্ঞান.* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮.

— *ভাবনার ভুবন: ভাষা-সংস্কৃতি-ইতিহাস.* প্রথম সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৮.

— *মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্.* প্রথম প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৭.

সেনগুপ্ত, সমীর, এবং বসু, সমীর, সম্পা. *বাংলা বানান: বিতর্ক ও সমাধান,* প্রথম প্রকাশ, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৭.

হক, মাহবুবুল. *বাংলা বানানের নিয়ম.* দশম মুদ্রণ, সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৮.

হালদার, কল্পনা. *পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা.* প্রথম প্রকাশ, সাহিত্যলোক, ১৯৯৮.

হোসেন, শওকত, সম্পা. *বাংলাভাষার বানান সংস্কার: কলিম খান-মঈন চৌধুরী বিতর্ক.* প্রথম প্রকাশ, নালন্দা প্রকাশন, ২০০৭.

বাংলা প্রবন্ধ

আনোয়ার, শাকিল. "যে বৈষম্যের কারণে বাঙালিরা পাকিস্তান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়." *BBC News বাংলা,* ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২১. *www.bbc.com,* https://www.bbc.com/bengali/news-55803132

ঘোষ, বিশ্বজিৎ. "পূর্ববাংলা ভাষা কমিটির প্রতিবেদন ও বাস্তবতা." *Risingbd Online Bangla News Portal,* ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, https://www.risingbd.com/opinion/news/214750

চক্রবর্তী, জগন্নাথ. "বাংলা বানান সংস্কার প্রস্তাব", *ভাষা,* মৃণাল নাথ সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ, এবং মুশায়েরা, ২০১৮.

চট্টোপাধ্যায়, স্যমন্তক. "সত্যজিৎ চর্চা: নামলিপির নেপথ্যে." *কমিক্স ও গ্রাফিক্স,* বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, ২য় সংখ্যা, ২০১৬.

— "সত্যজিৎ রায়: শীর্ষচিত্র চর্চা." *কমিক্স ও গ্রাফিক্স,* বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা.

দত্ত, শশিভূষণ, সম্পা. "সাময়িক প্রসঙ্গ (বাঙ্গালা বানানের নূতন নিয়ম)." মাসিক বসুমতী, ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩, https://southasiacommons.net/artifacts/2341560/masik-basumati . South Asia Commons.

দাশ, নির্মল. "রামমোহন রায়ের বাংলা ব্যাকরণ: তখন ও এখন." *কোরক সাহিত্য পত্রিকা,* তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, রামমোহন রায় সংখ্যা, শারদ সংখ্যা ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, ২০১২.

মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ. "বাংলা বানান সংস্কারের রূপরেখা." *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* উৎপল ঝা সম্পাদিত,১২১ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ (মাঘ ১৪২২ বঙ্গাব্দ).

রায়, বিশ্বজিৎ. "বাংলা ভাষা সাহিত্যের চর্চা: কিছু পরিপ্রশ্ন." *যত বেশি জানে তত বেশি মানে: একান্তবাদী সাহিত্য সমালোচনা বিরোধী প্রস্তাব,* প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, ২০১০.

সরকার, পবিত্র "ভাষাদিবসের চর্চা: বাংলা ভাষার কিছু কাজকর্ম." *BanglaLive,* 21 Feb. 2022, https://banglalive.com/bengali-language/

বাংলা পত্রিকা

১৭৭৮ গ্রন্থচর্চা, অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৩.

অনুষ্টুপ (বিশেষ বাংলা পুঁথি সংখ্যা), অনিল আচার্য সম্পাদিত, ৪৯ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, ১৪২২ বঙ্গাব্দ.

আকাদেমি পত্রিকা, শাঁওলী মিত্র সম্পাদিত, ৪০ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৮.

উজাগর (ভাষা-সমাজভাষা সংখ্যা), উত্তম পুরকাইত সম্পাদিত, ষোড়শ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ.

উদ্বোধন, স্বামী কৃষ্ণনাথানন্দ সম্পাদিত, খণ্ড ১২৪, সংখ্যা ৭, ১০ জুলাই ২০২২.

এবং মুশায়েরা: বিশেষ ভাষা সংখ্যা, অতিথি সম্পাদক- মৃণাল নাথ, ২০১৮.

ঐতিহ্য The Heritage, ড. নন্দিতা ভট্টাচার্যি গোস্বামী সম্পাদিত, দ্বাদশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০২১.

সংবর্তক (ভাষা বিজ্ঞান-তত্ত্ব-দর্শন বিশেষ সংখ্যা- পর্ব ১), সৌরভ রঞ্জন ঘোষ সম্পাদিত, অষ্টাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০২২

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, উৎপল ঝা সম্পাদিত, ১২১ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ (মাঘ ১৪২২ বঙ্গাব্দ).

সাম্পান (ক্রোড়পত্র: রাজশেখর বসু), পল্লব সরকার সম্পাদিত, অষ্টম বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৮

মাসিক বসুমতী, শশিভূষণ দত্ত সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩, https://southasiacommons.net/artifacts/2341560/masik-basumati/. South Asia Commons.

ইংরেজি গ্রন্থ

Carey, William. *A Grammar of the Bengalee Language.* The Mission Press, Srerampore, 1818, https://archive.org/details/grammarofbengale00carerich/mode/2up.

Chatterji, Suniti Kumar. *The Origin And Development Of the Bengali Language.* Rupa, 2017.

Chaudhary, Shreesh. *Foreigners and Foreign Languages in India: A Sociolinguistic History.* 1st ed., Foundation Books, 2011. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1017/UPO9788175968493.

Dasgupta, Sashi Bhusan. *An Introduction to Tāntric Buddhism.* University of Calcutta, 1950.

De, S. K. *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century (1800-1825).* University of Calcutta, 1919

Diringer, David. *The Book Before Printing: Ancient, Medieval and Oriental*. eBook, Dover Publications Inc., 2013.

Downing, John. *Evaluating the Initial Teaching Alphabet.* Cassel, 1967.

Hannas, William C. *The Writing on the Wall: How Asian Orthography Curbs Creativity*. eBook, University of Pennsylvania Press, 2003. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.9783/9780812202168.

Henderson, Leslie, editor. *Orthographies and Reading: Perspectives from Cognitive Psychology, Neuropsychology, and Linguistics*. eBook, Routledge, 2019.

Hulme, Charles, and R. Malatesha Joshi, editors. *Reading and Spelling: Development and Disorders*. Routledge, 2016.

Jaffe, Alexandra, et al., editors. *Orthography as Social Action: Scripts, Spelling, Identity and Power*. DE GRUYTER, 2012. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1515/9781614511038.

Joshi, R. Malatesha, and P. G. Aaron, editors. *Handbook of Orthography and Literacy*. eBook, 1st ed, L. Erlbaum Associates, 2006.

Katre, S. M., and P. K. Gode. *Introduction to Indian Textual Criticism*. Karnatak Publishing House, 1941.

Kress, Gunther. *Early Spelling: Between Convention to Creativity*. eBook, Routledge, 2005. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.4324/9780203979327.

Mallik, Bhakti P (ed.). *Suniti Kumar Chatterji Commemoration Volume,* The University of Burdwan, First Published: 1981.

Napoli, Donna Jo. *Linguistics: An Introduction*. Oxford University Press, 1996.

Saussure, Ferdinand de. *Course in General Linguistics*. Translated by Wade Baskin, Philosophical Library, 1959.

Sebba, Mark. *Spelling and Society: The Culture and Politics of Orthography around the World*. 1st ed., Cambridge University Press, 2007. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1017/CBO9780511486739

Singh, Udaya Narayana, and Shivarama Padikkal, editors. *Suniti Kumar Chatterji: A Centenary Tribute*. Sahitya Akademi, 1997.

Thompson, Hanne-Ruth. *Bengali: A Comprehensive Grammar*. eBook, Routledge, 2010.

Trabasso, Thomas R., et al., editors. *From Orthography to Pedagogy Essays in Honor of Richard L*. eBook, Taylor and Francis, 2014.

Vasu, S. C. *The Aṣṭādhyāyī Of Pāṇini*. 8th Reprint, vol. 1 & 2, Motilal Banarsidass, 2017.

ইংরেজি প্রবন্ধ

Bird, Steven. "Strategies for Representing Tone in African Writing Systems." *Written Language & Literacy*, vol. 2, no. 1, July 1999. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1075/wll.2.1.02bir.

DeCapua, Andrea. "Overview of Verbs and Verb Phrases: The Heart of the Sentence." *Grammar for Teachers: A Guide to American English for Native and Non-Native Speakers*, edited by Andrea DeCapua, Springer International Publishing, 2017, https://doi.org/10.1007/978-3-319-33916-0_5

Feitelson, Dina. "Teaching Reading to Culturally Disadvantaged Children." *The Reading Teacher*, vol. 22, no. 1, 1968. http://www.jstor.org/stable/20196046. JSTOR.

Haugen, Einar. "The Implementation of Corpus Planning: Theory and Practice." *Progress in Language Planning*, edited by Juan Cobarrubias and Joshua A. Fishman, De Gruyter Mouton, 2012, https://doi.org/10.1515/9783110820584.269.

Hosten, H. "The Three First Type Printed Bengali Books." *Bengal: Past & Present — Journal of Calcutta Historical Society*, vol. ix, no. 1 (serial no 17), Sept. 1914, https://archive.org/details/bengalpastprese01socigoog/mode/2up.

JERNUDD, BJÖRN H., and JYOTIRINDRA DAS GUPTA. "TOWARDS A THEORY OF LANGUAGE PLANNING." *Can Language Be Planned?*, edited by BJÖRN H. JERNUDD and JOAN RUBIN, University of Hawai'i Press, 1971, https://doi.org/10.2307/j.ctv9zckn9.15. JSTOR

Kloss, Heinz. *Research Possibilities on Group Bilingualism: A Report.* International Centre for Research on Bilingualism, 1969, https://eric.ed.gov/?id=ED037728

Lyytinen, H., and M. Aro. "Children's Language Development and Reading Acquisition in a Highly Transparent Orthography." *Handbook of Orthography and Literacy*, edited by R.M. Joshi and P.G. Aaron, First Published, Routledge, 2016.

Venezky, Richard L. "Principles for the Design of Practical Writing Systems." *Anthropological Linguistics*, vol. 12, no. 7, 1970, http://www.jstor.org/stable/30029259. JSTOR.

Winner, Thomas G. "Problems of Alphabetic Reform among the Turkic Peoples of Soviet Central Asia, 1920-41." *The Slavonic and East European Review*, vol. 31, no. 76, 1952, http://www.jstor.org/stable/4204408. JSTOR.

অভিধান/ কোশগ্রন্থ

Dasgupta, Birendramohan, editor. *Samad English-Bengali Dictionary.* Fifth Edition (60th impression), Sahitya Samsad, 2002.

Wehmeiner, Sally, editor. *Oxford Advanced Learner's Dictionary.* 7th Edition, Oxford University Press, 2005, (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/)

আচার্য, পি. *শব্দসন্ধান শব্দাভিধান (১-৩ খণ্ড).* বিকাশ গ্রন্থ ভবন, ২০০৩, ২০০২, ২০০৩ (যথাক্রমে).

চক্রবর্তী, জগন্নাথ. *মণিমঞ্জুষা.* বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ (১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ).

দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন. *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান,* দ্বিতীয় সংস্করণ :১৯৩৭, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২০২০ (https://dsal.uchicago.edu/dictionaries/dasa/)

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ (সম্পা.) *বঙ্গীয় শব্দকোষ,* সাহিত্য অকাদেমী, ২০০৭.

বসু, রাজশেখর (সম্পা.). *চলন্তিকা,* এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪২১ বঙ্গাব্দ.

বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ (https://www.banglapedia.org/)

বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র (সম্পা.). *সংসদ বাংলা অভিধান,* ত্রয়োবিংশতিতম মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, জুলাই, ২০১৬, (https://dsal.uchicago.edu/dictionaries/biswas-bangala/)

ভট্টাচার্য, সুভাষ. *বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান.* চতুর্থ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩.

— *সংসদ বিদেশি নামের উচ্চারণ.* চতুর্থ মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, ২০১৭.

মুখোপাধ্যায়, অশোক. *সংসদ ব্যাকরণ অভিধান.* ষষ্ঠ মুদ্রণ, সাহিত্য সংসদ, ২০১৭.

মুরশিদ, গোলাম. *বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান.* প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমি, ২০১৩.

মিত্র, সুবলচন্দ্র. *আদর্শ বাঙ্গালা অভিধান.* তৃতীয় সংস্করণ, নিউ বেঙ্গল প্রেস লিঃ, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ.

সরকার, পবিত্র প্রমুখ (সম্পা). *আকাদেমি বানান অভিধান.* চতুর্থ সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, নভেম্বর, ২০০৩.

—*বানান-বিবেচনা: একটি অভিনব বানান অভিধান.* কারিগর, ২০১৬.

—*ব্যাবহারিক বাংলা বানান-অভিধান.* লতিকা প্রকাশনী, ২০১৮.

হক, কাজী রফিকুল. *বাংলা ভাষায় আরবী ফার্‌সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান.* প্রথম পুনর্মুদ্র, বাংলা একাডেমি, ২০০৭.

হক, মাহবুবুল (সম্পা.), *খটকা বানান অভিধান.* ষষ্ঠ মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ২০২০.

হক, মুহম্মদ এনামুল প্রমুখ (সম্পা.). *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান.* সপ্তদশ পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ২০১৪.

সামাজিক মাধ্যম/ ব্লগ

টুইটার – সূর্যকান্ত মিশ্র (https://twitter.com/mishra_surjya?lang=en)

ড. মোহাম্মদ আমীন: ব্লগ (https://draminbd.com/home/)

ফেসবুক পৃষ্ঠা- কলকাতা পুলিশ (https://www.facebook.com/kolkatapoliceforce/)

ফেসবুক পৃষ্ঠা- এগিয়ে বাংলা (https://www.facebook.com/wb.gov.in/)

ফেসবুক পৃষ্ঠা- পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ (https://www.facebook.com/WBPolice/)

সংবাদপত্র/ সংবাদ পোর্টাল

আনন্দবাজার পত্রিকা/ আনন্দবাজার অনলাইন (https://www.anandabazar.com/)

বাংলালাইভ ডট কম (https://banglalive.com/category/cover-story/)

BBC News বাংলা (https://www.bbc.com/bengali)

রাইজিংবিডি ডট কম (https://www.risingbd.com/)

সংবিধান, সরকারি ওয়েবসাইট, সরকারি মহাফেজখানা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (http://bdlaws.minlaw.gov.bd/)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি). http://www.nctb.gov.bd/ , Accessed 22 June 2022.

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ-শিক্ষা মন্ত্রণালয়. http://www.shed.gov.bd/ , Accessed 22 June 2022.

Bangladesh Education Commisssion Report (by Md. Qudrat-e-Khuda). May 1974.

Murdoch, John. *Letter to Babu Ishwar Chandra Bidyasagar on Bengali Typography.* 22 Feb. 1865, https://indianculture.gov.in/rarebooks/letter-babu-ishwar-chandra-bidyasagar-bengali-typography

The Constitution of India. (https://legislative.gov.in/constitution-of-india)

সমিতির প্রতিবেদন, সভার কার্যবিবরণী

Minutes of the Senate and the Faculties for the Year 1936. Minutes, Accession No. 104710, Calcutta University Press, 1936, https://www.caluniv.ac.in/digital-lib-dev/ebook/pdf_view.php?pdflink=https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/calcutta-university/minutes-of-the-senate-provisional-committee-syndicate-council/minutes_1936.pdf&cat_type=A

Minutes of the Syndicate: For the Year 1935, Part Iv. Minutes, Accession No.100890, Calcutta University Press, 1935, https://www.caluniv.ac.in/digital-lib-dev/ebook/pdf_view.php?pdflink=https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/calcutta-university/minutes-of-the-senate-provisional-committee-syndicate-council/minutes_1935_p4.pdf&cat_type=A.

Minutes of the Syndicate: For the Year 1935, Part v. Minutes, Accession No.103161, Calcutta University Press, 1935, https://www.caluniv.ac.in/digital-lib-dev/ebook/pdf_view.php?pdflink=https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/calcutta-university/minutes-of-the-senate-provisional-committee-syndicate-council/minutes_1935_p5.pdf&cat_type=A.

Minutes of the Syndicate: For the Year 1936, Part v. Minutes, Accession No. 109498, Calcutta University Press, 1936, https://www.caluniv.ac.in/digital-lib-dev/ebook/pdf_view.php?pdflink=https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/calcutta-university/minutes-of-the-senate-provisional-committee-syndicate-council/minutes_1936_p5.pdf&cat_type=A.

Report of the East Bengal Language Committee, 1949. Officer on Special Duty (Home Deptt.), East Pakistan Govt. Press, 1958.

গবেষণা-অভিসন্দর্ভ

ঘোষ, জয়দীপ. *গ্রন্থনির্মাণ, গ্রন্থপ্রকাশ ও রবীন্দ্রনাথ.* পিএইচ.ডি গবেষণা-অভিসন্দর্ভ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭, http://hdl.handle.net/10603/402108.

দাশ, নির্মলকুমার. *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ.* পিএইচ.ডি গবেষণা-অভিসন্দর্ভ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, http://hdl.handle.net/10603/151273.

বিশ্বাস, জয়ন্ত. *বাংলা বানান নির্মাণে পত্র-পত্রিকা ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা.* পিএইচ.ডি গবেষণা-অভিসন্দর্ভ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬, http://hdl.handle.net/10603/209692.

Bandyopadhyay, Lily. *Suniti Kumar Chatterji-- The Linguist.* PhD Thesis, Department of Linguistics, University of Calcutta, 2013, http://hdl.handle.net/10603/154786.

Khondkar, Muhammad Abdur Rahim. *The Portuguese Contribution to Bengali Prose, Grammar and Lexicography.* PhD thesis, School of Oriental and African Studies, University of London, 1971. *DOI.org (Datacite)*, https://doi.org/10.25501/SOAS.00028588.

Qayyum, Muhammad Abdul. *A Critical Study of the Bengali Grammars of Carey, Halhed and Haughton.* School of Oriental and African Studies, University of London, 1974. *eprints.soas.ac.uk*, https://doi.org/10.25501/SOAS.00029000.

সাক্ষাৎকার

অধ্যাপক সুভাষ ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার. শ্রোতা- শ্যামাশ্যাম কৃষ্ণপূজারি চট্টোপাধ্যায়, অডিয়ো, ১২ জানুয়ারি, ২০২০, https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=subhash.

অধ্যাপক পবিত্র সরকারের সাক্ষাৎকার. শ্রোতা- শ্যামাশ্যাম কৃষ্ণপূজারি চট্টোপাধ্যায়, অডিয়ো, ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৯, https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VAZtLKlS6tg5bkKwDlOshxB7Zx74V7jo.